বাংলাদেশের রাজনীতি

সংকট ও বিশ্লেষণ



তালুকদার মনিরুজ্জামান

বাংলাদেশের রাজনীতিঃ
সংকট ও বিশ্লেষণ

তালুকদার মনিরুজ্জামান

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা

www.pathagar.com

বাংলাদেশের রাজনীতি ঃ সংকট ও বিশ্লেষণ

তালুকদার মনিরুজ্জামান

প্রকাশক ঃ
মুহাম্মদ নূর উল্লাহ , পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

ঢাকা অফিস ঃ
১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। ফোন-৯৫৬৯২০১

চট্টগ্রাম অফিস ঃ
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম। ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব ও সর্বদায়িত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ ঃ
মার্চ ২০০১, চৈত্র ১৪০৭

মুদ্রাকর ঃ
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি (প্রিন্টিং প্রেস) লিঃ
ফোন- ৭১১০৫৬২

প্রচ্ছদ ঃ
আরিফুর রহমান

অক্ষর বিন্যাস ঃ
সাইদুর রহমান
ডটপ্লাস লিমিটেড/দি প্রিন্টমাস্টার
ফোন : ৯৫৫৭৪০১/৯৩৪৪২৩০

মূল্য ঃ অফসেট কাগজ ১৪০.০০ টাকা
সাদা কাগজ ১০০.০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান ঃ
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
১২৫ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।
১৫০-১৫১ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা।
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম।

Bangladesher Rajniti Sangkat O Bislation; Written by : Talukder Maniruzzaman, Published by : Muhammad Nur Ullah, Director (Publication) Bangladesh Co-operative Book Society Ltd., 125 Motijheel C/A, Dhaka-1000. Price : Tk. 140, US$ 4.
ISBN. 984-493-069-3

www.pathagar.com

পরম শ্রদ্ধেয় বড় ভাই

ড. আনোয়ার হোসেন তালুকদারকে

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকট দেশী বিদেশী রাষ্ট্র বিজ্ঞানীদের কাছে বরাবরই এক আকর্ষণীয় বিষয়। দেশের স্বাধীনতা লাভের উনত্রিশ বছরেও একটি স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। একদলীয় শাসন ব্যবস্থা, সামরিক শাসন ও বহুদলীয় গণতন্ত্রসহ নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। এটা ঠিক যে, তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশ হিসেবে বাংলাদেশের সমাজ উন্নয়নের প্রয়াস জটিল ও দুরূহ হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পরে বিশ্বের বহু দেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে এবং তুলনামূলক অনেক ভালভাবে তারা অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশ এই ক্ষেত্রে বারবার হোঁচট খাচ্ছে। নানা অসিলায় জাতি বিভক্ত হয়েই থাকছে। রাজনৈতিক অস্থিরতা, অসহিষ্ণুতা ও সহিংসতাই হয়ে পড়েছে বাংলাদেশ রাজনীতির অনিবার্য নিয়তি। গণতন্ত্র ও উন্নয়ন বিরোধী এই দুষ্ট চক্র থেকে মুক্তির উপায় উদ্ভাবনে গবেষণাকর্ম একেবারেই যে হয়নি তা নয়। তবে জাতির উন্নয়ন ভাবনার বিপরীতে যেসব সমস্যা ও সংকট বারংবার ঘুরে ফিরে একই বৃত্তে আবর্তিত হচ্ছে তার স্বরূপ উদঘাটনে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য কাজ সম্পন্ন হয়েছে বলে দেখা যায় না।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক তালুকদার মনিরুজ্জামান রাজনৈতিক সংকট সম্পর্কে সময়ে সময়ে অকপট ও সাহসী বক্তব্য রেখে এসেছেন। তিনি এমন একজন বিরল সমাজ বিজ্ঞানী, যাঁর প্রাত্যহিক চিন্তা-চেতনা, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, আবেগ-অনুভূতি ও আশাবাদ নিবিড়ভাবে অনুরণিত ও স্পন্দিত হয় রাজনীতির উত্তাপে। এ বইয়ে গ্রন্থিত ৩৭টি লেখায় সেই সত্যই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। জাতীয় রাজনীতিতে যেসব বিষয় সবচেয়ে বেশী জটিল ও স্পর্শকাতর বলে বিবেচ্য হয় তার প্রায় প্রতিটিরই যথার্থ সন্নিবেশ ঘটেছে এই গ্রন্থে। গ্রন্থটি বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে ১৯৯২ থেকে ২০০০ পর্যন্ত সময়ে প্রকাশিত তাঁর লেখা নিবন্ধ ও সাক্ষাৎকারের সংকলন। এর মাধ্যমে জাতীয় রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যায়ন চমৎকারভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে। জাতীয় রাজনৈতিক মুক্তি ও জাতি গঠনে এ বইটি 'লাইট হাউসের' মতোই দিক নির্দেশক ভূমিকা রাখবে বলে আমাদের বিশ্বাস। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক জনাব তালুকদার মনিরুজ্জামান বইটি প্রকাশের অনুমতি দিয়ে আমাকে ব্যক্তিগতভাবে এবং বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটির পরিচালকবৃন্দকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

এই লেখা পুস্তক আকারে প্রকাশ করতে পেরে বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি সত্যিই প্রীত ও গৌরবান্বিত। পাঠকবৃন্দের একজনের চিন্তার জগৎকেও যদি এই বই নাড়া দেয় তাহলেই আমাদের এই প্রয়াস সার্থক হতে পারে।

মুনাওয়ার আহমদ
সভাপতি
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.pathagar.com

আমার কথা

১৯৯৫ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন দৈনিক, সাপ্তাহিক এবং অন্যান্য সংবাদপত্রে লিখিত ছোট ছোট প্রবন্ধ এবং এতে প্রকাশিত আমার কিছু সাক্ষাৎকার এ বইটিতে সঙ্কলিত হয়েছে। আমি নিজেকে একজন নগণ্য সমাজ ও রাষ্ট্র গবেষক বলে মনি করি। তাই প্রথমেই প্রশ্ন উঠতে পারে কোনো রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বা সমাজবিজ্ঞানীর সংবাদপত্রে লেখা বাঞ্ছনীয় কিনা! Classical theory অনুযায়ী একজন গবেষকের কর্তব্য হলো সমাজ বা রাষ্ট্রের পরিবর্তন ও গতি প্রকৃতি গবেষণার ভিত্তিতে দীর্ঘমেয়াদি বিশ্লেষণ এবং এ বিশ্লেষণধর্মী ও গবেষণামূলক রচনা প্রকাশিত হওয়া উচিত রাষ্ট্র বা সমাজ বিজ্ঞানের পেশাদারী (professional) পত্রিকায়। এর জবাবে আমাকে বলতে হয়, আমি কেন সংবাদপত্রে কিছু কিছু লেখা শুরু করলাম।

এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে ১৯৬৯ সালে বাংলাদেশের অন্যতম সমাজবিজ্ঞানী বলে পরিচিত একজন বিদগ্ধ ব্যক্তির সঙ্গে আলাপচারিতার কথা। অতীব দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় তিনি আজ আমাদের মধ্যে নেই। সে ব্যক্তি হলেন প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও জাতীয় অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক। তখন আইয়ুব খানের শাসন চলছে। তার স্বৈর শাসনের বিরুদ্ধে সমগ্র দেশ তীব্র গণআন্দোলনের জোয়ারে উত্তাল ছিল। এ গণআন্দোলনের সময় থেকেই "পিন্ডি না ঢাকা? ঢাকা, ঢাকা" স্লোগান বিপুলভাবে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র-জনতার মুখে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। অর্থাৎ একটু গভীরে তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাচ্ছিল যে ছাত্র-জনতা পরোক্ষভাবে পিন্ডির শাসন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতাই চাচ্ছিল। এ প্রসঙ্গটা নিয়েই সেদিন প্রয়াত রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল। তিনি আমাকে রাওয়াল পিন্ডিবিরোধী আন্দোলনের একটা বিশ্লেষণ দিচ্ছিলেন।। এ বিশ্লেষণের মূল কথা ছিল এ যে, ১৯৪৭ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহে (Decisions of decisive consequences) তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানিদের কোনো অংশগ্রহণ না থাকায় বাঙালিদের মনে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি করেছে। তাঁর ভাষায়, "পাকিস্তানের রাজনীতিতে যে সব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া হয় তার একশ গজের মধ্যেও কোনো বাঙালির প্রবেশাধিকার নেই। সুতরাং বাঙালিরা তো ক্ষুব্ধ হবেই।" উত্তরে আমি বললাম, "আপনার বিশ্লেষণ তো বুঝলাম, কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের এ দ্বন্দ্বের মীমাংসা কি ভাবে হতে পারে?" তিনি ইংরেজিতে উত্তর দিলেন, "The function of a social scientist is to analyse, not to give prescription" পরবর্তী সময়ে সমাজবিজ্ঞানীদের ভূমিকা সম্পর্কে অনেক চিন্তা ভাবনা করলাম। তারা কি শুধু গবেষণা ও বিশ্লেষণই করবে, নাকি তাদের বিশ্লেষণ ও গবেষণালব্ধ জ্ঞান দ্বারা সমাজের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে পরামর্শ ও সাহায্য সহযোগিতা করবে? এ পর্যায়ে আমার মনে হচ্ছে কার্ল মার্কসের বিখ্যাত উক্তি, "The philosophers have only interpreted the world, in various ways; the point, however, is how to change it." দেশে যখন কোনো কঠিন সমস্যার উদ্ভব হয় তখন কি একজন সমাজবিজ্ঞানী জনপ্রিয় মাধ্যমগুলোতে লিখে বা বক্তৃতা করে সমাজকে দিক নির্দেশনা দিতে চেষ্টা করবে না? এ বিষয়ে অনেক সমাজবিজ্ঞানীই কার্ল মার্কসের সঙ্গে একমত পোষণ করেন।

এ বিষয়ে বর্তমান যুগের পাশ্চাত্যের বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানীরাও যেমন Almond, Coleman, Lipset, Huntington এবং তাদের মতো অন্য পন্ডিত ব্যক্তিগণ "heuristic as well as problem solving approach" এর কথা বলেছেন। সত্যি কথা বলতে কি পঞ্চাশ দশকের পর থেকে পাশ্চাত্যে, বিশেষ করে আমেরিকার রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সমাজ বিজ্ঞানীদের গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু সাধারণত: এভাবে লেখা হয় "Implications of the study for policy making." উন্নয়নশীল দেশের সামাজিক পরিবর্তনে ঘন ঘন গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটতে থাকে। এ সব "unique historical events" এর তাৎক্ষণিক বিশ্লেষণ দেশের সমাজ ও রাষ্ট্র নেতৃবৃন্দকে তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছতে সাহায্য করে। তাই আমার মনে হয় যে কোনো সংবেদনশীল সচেতন সমাজবিজ্ঞানী, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশে, এ সব যুগান্তকারী ঘটনাবলীতে আন্দোলিত না হয়ে পারেন না। তাই তিনি তাঁর লেখনির মাধ্যমে তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। হয়ত তাই সমাজ সচেতনতা বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে

www.pathagar.com

বাংলাদেশের কোনো কোনো বিশেষ বিশেষ সমস্যা বিশ্লেষণের প্রয়াস পেয়েছি এবং আশা করেছি যে আমার এ বিশ্লেষণ দেশের রাজনৈতিক অগ্রগতিতে অতি সামান্য হলেও সহায়ক হবে।

যে কোন উন্নয়নশীল দেশে নিরপেক্ষ নির্বাচন করা খুবই কঠিন। বাংলাদেশে এ পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। অস্থায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকার তত্ত্ব নিয়ে বিতর্ক হয়েছে, বিতর্ক আছে গঙ্গা চুক্তি নিয়ে, পার্বত্য চুক্তি দেশের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তার সঙ্গে কতটা সঙ্গতিপূর্ণ সে বিষয়েও প্রচুর বাক-বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছে, ঝড় উঠেছে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে ভারতকে ট্রানজিট বা ট্রান্সশিপমেন্ট দেয়ার
ইস্যুটি নিয়ে। প্রশ্ন উঠেছে গ্যাস সম্পদ উত্তোলন ও বিদেশে রপ্তানির বিষয়টি নিয়ে। সুপ্রিম কোর্টের উপর ঝুলছে ডেমোক্লিসির তরবারী। ভারত ও পাকিস্তানের পারমাণবিক শক্তিতে পরিণত হওয়ায় বাংলাদেশের নিরাপত্তা কৌশল নিয়ে নতুন ভাবনার জন্ম দিয়েছে।

একজন ক্ষুদ্র রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর দৃষ্টি দিয়ে আমি এ সব বিতর্কিত অথচ দেশের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার বিশ্লেষণ করে কিছু লেখা বাংলাদেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশ করেছি। দেশের অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি এবং সুধীজন আমার মতের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ নাও করতে পারেন। তবে আমার এ সামান্য রচনাবলী যদি দেশের জনগণের সচেতনতাকে আরো বেশি অসংকোচ, সচেষ্ট, দীপ্তমান এবং গঠনমূলক রূপ দিতে সাহায্য করে তাহলেই আমার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে সার্থক মনে করবো।

কয়েকজন সুধী ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ আলোচনা আমার প্রবন্ধগুলোকে স্বাভাবিকভাবেই প্রভাবিত করেছে। আমাদের দেশের প্রখ্যাত কলামিস্টদের লেখা আমার চিন্তার স্ফুরণে সহায়ক হয়েছে। দুই জন সুধী ব্যক্তির কাছে আমি যথার্থই ঋণী। তাঁদের একজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক ড. ইউ. এ. বি. রাজিয়া আক্তার বানু এবং অপরজন হলেন তরুণ সাংবাদিক বন্ধু মিজানুর রহমান খান। আমার অতি সাদামাটা বৈঠকখানায় বসে আমরা তিনজন বাংলাদেশের সমকালীন রাজনৈতিক সংকট নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা আলাপ আলোচনা করেছি। এ আলাপচারিতা আমার লেখাকে প্রভাবিত করেছে সন্দেহ নেই। যে সব তরুণ সাংবাদিক বন্ধু অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে ছাপানোর ব্যবস্থা করেছেন তাদের কাছে আমি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত লেখা ও সাক্ষাৎকার সুবিন্যস্ত ও সম্পাদনার দুরুহ কাজটি সম্পন্ন করেছেন মিজানুর রহমান খান। আমি সেজন্য তার কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। এ বইয়ের পৃষ্ঠা বিন্যাস হয়েছে প্রয়াত শ্রদ্ধাভাজন শিল্পী কালাম মাহমুদের পরিকল্পনায়। তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি। এ বইটি দ্রুত প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আমি বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেডের সভাপতি জনাব মুনাওয়ার আহমদকে ধন্যবাদ জানাই। বইটি প্রকাশে আন্তরিক সহযোগিতা দানের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই দি প্রিন্টমাস্টারের নির্বাহী পরিচালক আহমদ হোসেন মানিক এবং কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটির ব্যবস্থাপক মোঃ তোফাজ্জল হোসেনকে।

সবশেষে আমি যাঁর কথা উল্লেখ করতে চাই, তিনি হলেন আমার বড় ভাই ড. আনোয়ার হোসেন তালুকদার। তিনি রাজশাহী, ঢাকা ও কিছুকাল লিবিয়ার বেনগাজীতে গারিওনিস বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিসংখ্যানের অধ্যাপক হিসেবে কাজ করে বর্তমানে অবসর জীবন যাপন করছেন। সমাজ বিজ্ঞান গবেষণায় আমার যে সামান্য জ্ঞান তা আমি তাঁর কাছেই শিখেছি এবং সত্যিকার শিক্ষক হবার প্রেরণা তাঁর উদাহরণ থেকেই পেয়েছি। এ বিজ্ঞ এবং মহান ব্যক্তির নামে আমার এ ক্ষুদ্র বইটি উৎসর্গ করতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি।

তালুকদার মনিরুজ্জামান
১৬/জি ফুলার রোড
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকা
ঢাকা-১০০০

www.pathagar.com

সূচিপত্র

১। রাজনীতিকরাই কেয়ারটেকার গঠন করুন ০৯
২। সেনাবাহিনী ও বিরোধী দলের পরামর্শে নতুন শান্তিচুক্তি করুন ১৪
৩। বিদেশী সাহায্যপুষ্ট বিচ্ছিন্নতাবাদ সহজেই লয়প্রাপ্ত হয় না ১৬
৪। উপজেলা পদ্ধতি প্রবর্তন এরশাদের একমাত্র ভালো কাজ ১৯
৫। রাষ্ট্রপতির প্রাইভেটলি বক্তব্য দেওয়া উচিত ২৩
৬। প্রধান প্রধান জাতীয় ইস্যুতে হাসিনা ও খালেদার ঐকমত্যে আসা উচিত ২৪
৭। আওয়ামী লীগের মাথায় এখনো বাকশালী চিন্তা ৪০
৮। টিকে থাকবে বাংলাদেশ ৪৭
৯। ট্রানজিট দিলে বাংলাদেশ সার্বভৌমত্ব হারাবে ৪৯
১০। সংসদে অশোভন উক্তি রাজনীতিকদের নিম্ন সংস্কৃতির পরিচায়ক ৫৬
১১। আমি খুবই আশাবাদী বাংলাদেশ একদিন অনেক বড় হবে ৬০
১২। নূরুল কাদের ইকোনমিক্স ৬৯
১৩। আমি আমেরিকার সঙ্গে পুরো সামরিক চুক্তির পক্ষে ৭৩
১৪। জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে মধ্যবর্তী নির্বাচন অপরিহার্য ৭৮
১৫। আওয়ামীলীগ গণতান্ত্রিক ভাবে শাসনকার্য পরিচালনায় চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে ৮১
১৬। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ ৮৪
১৭। একবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কৌশল ৮৭
১৮। ভারতের নবোত্থিত হিন্দু জাতীয়তাবাদের পরমাণু সজ্জা সকল প্রতিবেশীর স্বাধীনতা বিপন্ন করতে পারে ৯১
১৯। সেদিনই মনে হয় পাকিস্তান ধ্বংস হয়ে গেছে ৯৬
২০। চিন্তার স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র : বাংলাদেশ পরিস্থিতি ৯৮
২১। সরকারি সন্ত্রাস ও মানবাধিকার লংঘন ১০০
২২। চারদলীয় জোট ভারতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ ১০৪
২৩। শেখ হাসিনা তাঁর বাবার মতো একজন খাঁটি ন্যাশনালিস্ট ১০৬
২৪। গ্যাস রফতানির সিদ্ধান্ত হবে দেশদ্রোহিতার শামিল ১১৪
২৫। সে যুদ্ধ বার বার গণতন্ত্রকে হত্যা করে ১১৯
২৬। কাঁচি দিয়ে কেটে কেটে কিছু ভূখণ্ড নেবার প্রবণতা ভারতের সব সময়ই আছে ১২৩
২৭। সুপ্রিমকোর্টের উপর কি ডেমোক্লিসির তরবারি? ১২৫
২৮। সাংস্কৃতিক আগ্রাসন সামরিক আক্রমণের চেয়ে ভয়াবহ ১২৭
২৯। ট্রানজিট : ধীরে ধীরে ভারত কর্তৃক বাংলাদেশ গিলে খাওয়ার নীতি ১৩২
৩০। ট্রানজিট : দিল্লির চমকে বিভ্রান্ত হলে চলবে না ১৩৬
৩১। দুই নেত্রীকে অতীত রাজনীতির চর্চা পরিহার করতে হবে ১৪০
৩২। ভারতের বিরুদ্ধে লেগে থাকা নয় থাকতে হবে সতর্ক ১৪৫
৩৩। বাংলাদেশ রাজনীতির ভবিষ্যৎ ১৫০
৩৪। জননিরাপত্তা আইন : বিরোধী দল দমনের হাতিয়ার ১৫৩
৩৫। তৃতীয় বিশ্বের গ্যাস আহরণে বহুজাতিক কোম্পানির ভূমিকা ১৫৫
৩৬। বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক : কিছু ভাবনা ১৫১
৩৭। স্মৃতিসৌধে না গিয়ে ক্লিনটন কোনো ভুল করেন নি ১৬৬

www.pathagar.com

তালুকদার মনিরুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক। তিনি ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৮ পর্যন্ত বিভাগীয় চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক ফেলোশিপ লাভ করেন। এগুলোর মধ্যে Nuffield Foundation Fellowship, University of London (1978-79), Fellowship at the Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington, D.C. (1983-1984), Swedish Institute, Guest Scholar at Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) (1988-89) উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক জার্নালে এবং সম্পাদিত গ্রন্থে ড. তালুকদার মনিরুজ্জামানের অনেক লেখা প্রকাশিত হয়। তাছাড়া The Cambridge Encyclopedia of India, Pakistan, Bangladesh, Srilanka, 1999 এবং Encyclopedia of Government and Politics – London and New York, Routledge, 1992তেও তাঁর লেখা ছাপা হয়।

ড. তালুকদার মনিরুজ্জামান রচিত অন্যান্য বই

- The Politics of Development : The Case of Pakistan (1947-1958) (Dhaka, Green Book House Limited, 1971)
- Radical Politics and the Emergence of Bangladesh (Dhaka, Bangladesh Books International, 1975)
- The Bangladesh Revolution and Its Aftermath (Dhaka, Bangladesh Bangladesh Books International Limited, 1980)
- The Security of Small States in the Third World (Canberra, The Strategic and Defence Studies Centre, The Australian National University, 1982
- Group Interests and Political Changes : Studies of Pakistan and Bangladesh (New Delhi, South Asian Publishers, 1982.
- Military Withdrawal From Politics : A Comparative Study (Cambridge, Massachusetts, Ballinger Publishing Company, A Subsidiary of Harper & Row, Publishers, Inc. 1987)
- Politics and Security of Bangladesh (Dhaka, University Press Limited, 1994)
- Japan's Security Policy for the Twenty-First Century (Dhaka, University Press Limited, 2000)

www.pathagar.com

১ রাজনীতিকরাই কেয়ারটেকার সরকার গঠন করুন

অভাবিত প্রতিপত্তির অধিকারী এবং মহাযুদ্ধবিজয়ী রাষ্ট্রনায়ক চার্চিল ক্ষমতায় থাকলে নির্বাচন অবাধ হবে না, এ যুক্তিতে ব্রিটেনেও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি উঠেছিল। সে দেশের রানী তখন কিন্তু রাজনীতিক চার্চিলকেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন ও পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে সমস্যা সমাধান করেছিলেন এবং নির্বাচনে অপজিশন পার্টির এটলি বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছিলেন। ভারতেও সাম্প্রতিককালে বিপন্ন প্রায় সংসদে খুব সামান্য সংখ্যক সংসদ সদস্যদের সমর্থনপুষ্ট নেতা চন্দ্র শেখরের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীনে নির্বাচন হয়েছিল। বাংলাদেশে যদি খালেদা জিয়ার অধীনে নির্বাচন করা না যায়, তাহলেও, রাজনীতিকদের নিয়েই কেয়ারটেকার সরকার হতে পারে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারে কর্তৃত্ব করার জন্য বিচারপতি, এনজিও প্রধান, ধনবান শেঠ, বা অন্য কাউকে হাজির করার প্রয়োজনটা কি? তাদের হাজির করলে, গণতন্ত্র এবং রাজনীতিকদের সর্বোচ্চ-কর্তৃত্ব আসলেই থাকে না। তাতে নানাদিক থেকে চূড়ান্ত বিপর্যয় দেখা দিতে বাধ্য। রাজনীতিকদের সৃষ্ট সমস্যা রাজনীতিকরাই সমাধান করুন। নিজেদের মধ্যে হাবিল-কাবিলের মতো মারামারি করলেও, তাদের এ সমস্যা তাদের নিরসন করতে দিন, সমগ্রজাতি আজ সে অবস্থানই নিয়েছে এবং রাষ্ট্রের উপর অর্জিত কর্তৃত্ব রাজনীতিকরা হারাবেন না, এ সনির্বন্ধ অনুরোধ আমি জনগণের মাধ্যমে রাজনীতিকদের জানাতে চাই। কারণ, রাজনীতি তার সুউচ্চ অবস্থান হারালে তাঁরা এর কঠিন মূল্য দিতে বাধ্য হবেন। তাতে দেশও ভয়াবহ সংকটে পতিত হবে।

প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া আর বিরোধীদলের নেত্রী শেখ হাসিনা, দু'জনই সংকল্পবদ্ধ প্রতিপত্তির মানুষ। তারা ক্ষমতাশূন্য হয়ে নির্বাচনের মাঠে নামুন। উপনেতা বদরুদ্দোজা চৌধুরী, উপনেতা আবদুস সামাদ আজাদ, প্রজ্ঞাবান এল কে সিদ্দিকি, গ্রহণযোগ্য খন্দকার দেলোয়ার, ধারাবাহিকতার জন্য অর্থমন্ত্রী পদে সাইফুর রহমান, মোহাম্মদ নাসিম, তোফায়েল আহমেদ, মতিয়া চৌধুরী, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, জামায়াতের এডভোকেট শেখ আনসার আলী আর বামফ্রন্টের রাশেদ খান মেনন-এমন ১১ জনকে নিয়ে একটা রাজনৈতিক কেয়ারটেকার সরকার গঠন করতে বাধা কোথায়? তাতে সংবিধানও বাঁচে। রাজনীতিও বাঁচে। দেশও বেঁচে যায়। এঁরা দায়িত্বশীল হবেন। জাতির

www.pathagar.com

জন্য বড় কাজ করার একটা সুযোগ পাবেন এর মাধ্যমে নেতৃত্বের পরীক্ষাও দিতে পারবেন তাঁরা। ভবিষ্যতের জন্য তৈরি হতে পারবেন। নানাদল মিলে একসঙ্গে কাজ করার একটা প্রক্রিয়া যে দেশে গড়ে উঠেছে, তা দেখে জনগণ ভোটদানের চাইতে বড় তৃপ্তি পাবেন। এদের কেউই নির্বাচনে অংশ নেবেন না। তাঁদের নিশ্চিত আসনগুলো থেকে, নেত্রীরা নিজেরা পাস করে আসতে পারেন এবং পরে উপনির্বাচনে সে আসনগুলো তাঁদের ফিরিয়ে দিতে পারেন। যদি এমনভাবে না হয়, তাহলেও টেকনোক্রেট মন্ত্রী হিসেবে তাঁদের ক্ষমতাদান করা সম্ভব হবে।

সঙ্গে শূন্য আসনে নির্বাচন হওয়া নৈতিক (moral) বাধ্যবাধকতা। কিন্তু শূন্যতা এড়ানোর জন্য যদি সংসদ এখনো টিকে থেকে থাকে, তাহলে আইনগত এই বৈধতাটুকু রাষ্ট্র বিপ্লব এড়ানোর মতো কোনো কাজে আসে কি না, দেখা দরকার। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও নাগরিকদের নিরাপত্তা যেমন সর্বোচ্চ তাগিদ, তেমনি পরবর্তী সরকার বা নতুন সংসদ গঠন পর্যন্ত আগেরটি টিকে থাকাও একটা বড় তাগিদ। পরবর্তী প্রধানমন্ত্রীর হাতে ক্ষমতা তুলে না-দেওয়া পর্যন্ত, আগের প্রধানমন্ত্রী কাজ করে যাবেন- "কোন কিছুই তাকে নিবৃত্ত করতে পারবে না"-সংবিধান রচয়িতারা শূন্যতা এড়ানোর জন্যই এ বাক্য সংযোজন করেছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী ৩০ দিন আগে পদত্যাগের কথা বলেছেন। সাবেক ব্রিটিশ স্পিকার ৬ সপ্তাহের কথা বলেছেন। প্রধানমন্ত্রীর বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার হলে তিনি আরো কয়'টি দিন বাড়াতে পারেন। প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্র বিপ্লব এড়াতে চাইছেন। নিঃসন্দেহে, যে কোনো শাসক তা চাইবেন। বিরোধীদলও স্বাধীনতা যুদ্ধ করেছেন। একটা পদ্ধতিগত সংস্কার চাইছেন। বিপ্লবে সবকিছু বৈধতা এক্ষেত্রে সর্বাংশে প্রযোজ্য হবে না। তুরস্কে এর চাইতে হাজার গুণ কঠিন রাজনৈতিক সংস্কার হয়ে গেছে গতমাসে- সমঝোতার মধ্যে। আমাদের দেশে সংসদ যাঁরা ছেড়েছেন, তাঁরাও রাজনীতিক। ক্ষমতায় যাঁরা আছেন, তাঁরাও রাজনীতিক। যাঁদের হাতে সর্বোচ্চ ক্ষমতা ন্যস্ত করে জনগণ, তাঁরা তুরস্কের সমঝোতা দেখেও শিখতে পারেন।

সেনাবাহিনীর সহায়তা তাদের নিতেই হবে

বিচারপতি বা এনজিও-র কাউকে কেয়ারটেকার সরকার প্রধান করা হলেও, তারা নিজ ক্ষমতায় নির্বাচন করাতে পারবেন না। সেনাবাহিনীর সহায়তা তাদের নিতে হবে। কারণ, কোনো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষেই আমাদের সশস্ত্রবাহিনী, বিশেষ করে পদাতিক বাহিনী ও বিমান বাহিনীর ভূমিকা ছাড়া সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করা যাবে না। সশস্ত্র বাহিনীকে যদি নির্বাচনী দায়িত্ব পালনের জন্য ডাকতেই হয়, তাহলে এই রাজনৈতিক কেয়ারটেকার সরকারের পক্ষে ডাকাই সবচেয়ে সমীচীন হবে। কারণ, এই রাজনীতিকরা সংবিধান প্রণেতা, জাতীয় সংকটে ভূমিকা পালনকারী, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাতা

www.pathagar.com

এবং সংস্কারকের ভূমিকা পালন করেছেন এদেরকে দলীয় ব্যক্তি হিসাবে মনে করার কারণে, তাঁদের উচ্চতর জাতীয় দায়িত্ব প্রদানের সুযোগ আমরা দিইনি। ছোট গণ্ডি থেকে বৃহত্তর গণ্ডিতে নিয়ে যাবার জন্য রাজনীতিকদের এ ধরনের প্রক্রিয়ায় ফেলা দরকার।

বাংলাদেশীদের প্রজ্ঞার পরিচয় কঠিন সংকটে

রাষ্ট্রটা আমাদের সবার। এই একটা রাষ্ট্রকে রক্ষা করে এর ক্ষমতা, এর জনতা, এর প্রতিরক্ষা, এর চিন্তা আমাদের সবাইকে মিলে করতে হবে। আর কঠিন সংকটের মধ্যেই আমরা সবচেয়ে বেশি প্রজ্ঞার ও ত্যাগের পরিচয় দিয়ে থাকি। এবারও সেভাবে দিই না কেন? এ প্রজ্ঞাবোধ নিয়ে আমরা সবাই গণতন্ত্র ও রাষ্ট্রের একটা উত্তরণে শামিল হতে পারি। তাতে সবাই খানিকটা ক্ষোভ, জেদ, প্রাপ্তিতে বঞ্চিত হবেন- কিন্তু তার সুফলটা দীর্ঘমেয়াদে স্থিতিশীল রাষ্ট্রটা সবাইকে দিতে পারবে। আমি জীবনের দীর্ঘ সময়টা ব্যয় করেছি, রাষ্ট্র আর সামরিক বাহিনী, রাজনীতি ও নিরাপত্তার সকল দিগন্ত অনুসন্ধান করে। আমি আশংকা করছি, রাজনীতিকরা অন্য যে কোনো দিকেই পা বাড়াক, তা আমাদের পরম ও শেষ নিরাপত্তার শক্তিকেও ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। এমনকি আমরা শাসনহীনতায় সোমালিয়ার মতো অবস্থায় রক্তগঙ্গায় আমাদের স্বাধীনতা ও অস্তিত্ব হারাতে পারি। কোনো একজন নয়, সবাইকে সব পক্ষকে, এমনকি আমাদের সেনাবাহিনীকে এ পর্বে ত্যাগী দূরদৃষ্টিবান ঋষির মতো রাগ-ক্ষোভকে সর্বনিম্নে, প্রজ্ঞাকে সর্বোচ্চ স্থান দিতে হবে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার কিভাবে চলবে, সে ব্যাপারে দুশ্চিন্তা না-করা ভালো। আমাদের সংবিধানে প্রচ্ছন্নভাবে ৫৬ (২) অনুচ্ছেদে একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা ও দায়িত্ব নির্দিষ্ট আছে। তাহলো তারা কোনো নীতি নির্ধারণে যাবেন না। রুটিন বা দেশটা চালিয়ে যাবার নিয়মিত দায়িত্ব পালন করবেন। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করবেন। অর্থব্যয়ের বিল অনুমোদন করবেন। আর নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব খুব দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে ২৪ ঘণ্টা কাজ করানো, প্রয়োজনে অতিরিক্ত লোক ও মেধা দিয়ে তাদের কাজ এগিয়ে দেওয়াটা হবে সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। ধরে নেওয়া ভালো, গত দু'বছরের ঘটনাবলী আজ আমাদের প্রায় একটা রাষ্ট্র-বিপ্লবের সম্মুখীন করেছে। ভালোমন্দ যেভাবেই হোক, অতিকষ্টে জনগণের অর্থে গড়ে তোলা এ রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে ছত্রখান করলে আমরা লাভবান হবো না। সংসদ, সরকার, রাজনীতির হাতে যা অবশিষ্ট আছে, সেখান থেকে সবকিছু আবার গড়ে তোলার কাজটা শুরু করার জন্য যা দরকার তা একে একে-ধাপে ধাপে চিন্তা করুন।

সংসদে আসন শূন্য হয়েছে। সঙ্গে আমাদের সশস্ত্র বাহিনী আমাদের রাষ্ট্রপত্তন, রাষ্ট্রবহন, নির্মাণে অংশ নিয়েছিল। এখন সশস্ত্র বাহিনী এক পেশাগত উত্তরণ ও আধুনিকায়নের মধ্যে আছে। জাতির সকল অংশের কাছে, তাদের নীরব ভূমিকা

www.pathagar.com

প্রবলভাবে অনুভূত হয়। তারা নিরাপত্তার শেষ গ্যারান্টি হয়ে থাকুন ও গড়ে উঠুন। আর কলহে লিপ্ত ও বিভক্ত রাজনৈতিক শক্তি, এমন অবস্থার মধ্যে দিয়েই যখন বুঝতে পারবে, নেতৃত্ব কেবল উত্তেজনা আর বক্তৃতা নয়–খুবই কঠিন কাজ, তখন জাতির ইতিহাস থেকে এসব দুর্দৈব মুছে যাবে। রাজনীতি বদমায়েশী বা ষণ্ডামীর বৃত্তি নয় (Politics is not the Business of the Scoundrel), এ সত্যটা খুব দ্রুত আমাদের রাজনীতির আপাদমস্তকে অনুশীলনে না এলে তারাও ভয়াবহ বিপদ ও পরাজয়ের সম্মুখীন হবেন–এটা আজ আরো পরিষ্কার। কিন্তু এই ক্ষমতা ও রাজনীতি, সংবিধান ও গণতন্ত্র, অস্থিরতা ও জেদের মধ্যে কোনো কারণে যদি রাজনীতির কোনো অংশ কিংবা কেউ যদি সলিউশন হিসেবে মিলিটারি ইন্টারভেনশনের কথা ভেবে বসেন, বা মেনে বসেন, তা দুঃখ বয়ে আনবে সবার জন্য। এ ধরনের প্রক্রিয়ায় প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তার শেষ শক্তি বিভক্ত হলে, বিভক্ত হয়ে পড়লে সোমালিয়ার মর্মন্তুদ অবস্থা আমাদের বরণ করতে হবে। তখন আর ফেরবার পথ থাকবে না। তার চেয়ে অনেক নিরাপদ বিষয় হচ্ছে, পলিটিশিয়ানদের ফাইট করতে দেওয়া এবং তার মধ্য দিয়ে তাদের আচরণের উত্তরণ ঘটানো। সবকিছু ধ্বংস করে রাজনীতিকরা কিছু পাবেন না, এটা রাজনীতিকদের সামনে একটা শিক্ষা হয়ে উঠছে।

ষাট ও সত্তরের দশকে লুইসিয়ান পাই ও এস.পি. হান্টিংটনের মতো রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা নৈরাজ্যরোধ ও উন্নয়ন দাতা হিসেবে সশস্ত্র বাহিনীর আবির্ভাবকে একটা রাষ্ট্রচালন পদ্ধতি হিসেবে লক্ষ্য করতেন। তাঁরাও এখন আর তা মনে করেন না।

আমার স্বপ্ন ছিল, রাষ্ট্র রাজনীতিকরাই শাসন করবেন। সুন্দর একটা নির্বাচনে খালেদা জিয়া রাজনীতিকদের মধ্য থেকে উঠে এসে যখন রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হন, তখন মনে হয়েছিল, একজন রাষ্ট্রদেবীর আবির্ভাব ঘটেছে, গ্রীক পৌরাণিকের মতো। তিনি সুন্দরভাবে রাষ্ট্রটিকে চালিয়ে একটা পরম সৌন্দর্যের স্পর্শ দেবেন। আর যেহেতু উন্নয়নশীল দেশে ক্ষমতা সর্বদাই আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থ হয়, রাষ্ট্রকে আরও সুন্দর করার স্বপ্ন নিয়ে বিরোধী দল গড়ে উঠবে। এবং পরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যাবে। দায়িত্বশীল, আস্থাশীল দুটো দল গড়ে উঠলে অন্যান্য দল থাকা সত্ত্বেও একটা দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা (Bi-partisan system) বিকাশ লাভ করবে বাংলাদেশে।

এখন আমি এই কথা ভেবে নিশ্চুপ যে, আসলে আমি কত বোকা। সুন্দর স্বপ্ন তো তিরোহিত প্রায়। আর প্রতিদিন দেশের যে দুরবস্থা দাঁড়াচ্ছে, তাতে হতাশ হচ্ছি। ভয়ানক

www.pathagar.com

কষ্ট হয়, যখন দেখি, যা সম্ভব ছিল, তা না করে আমাদের রাজনীতিকরা অন্য কিছু করতে যাচ্ছেন। আমি শেষবারের মতোও বলছি, রাজনীতি হচ্ছে সর্বোচ্চ অধিনায়কত্ব। রাজনীতি খুবই কঠিন ও দুঃসহ কাজ। সমাজ, উন্নয়ন ও রাষ্ট্রের বিকাশ ঘটিয়ে জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্যই রাষ্ট্রের পত্তন, বিকাশ ও স্থায়িত্ব। এ জীবন যাঁরা বেছে নিয়েছেন, তারা জনগণের সামনে নিজেদের উচ্চ অবস্থান বিপর্যস্ত করবেন না। রাষ্ট্রনায়কের মতো না-হোক, যে সমস্যা এসেছে বা আসবে তা সম্মিলিতভাবে সমাধান করুন।

সাপ্তাহিক রাষ্ট্র ৯-১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫

www.pathagar.com

২ সেনাবাহিনী ও বিরোধী দলের পরামর্শে নতুন শান্তিচুক্তি করুন

পার্বত্য শান্তিচুক্তি সংবিধান বিরোধী। সার্বভৌমত্ব আইন ও এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থার পরিপন্থী। সরকার দেশের সার্বভৌমত্ব নিয়ে মানুষের সঙ্গে বেঈমানি করেছে। অবিলম্বে চুক্তির খসড়া বাতিল করে এ সম্পর্কে বিরোধী দলের সম্মতি ও সেনাবাহিনীর পরামর্শ নিয়ে নতুন করে চুক্তির উদ্যোগ নিতে হবে। তবেই পাহাড়ে শান্তি ফিরে আসবে।

সংবিধানের প্রথম ধারাতেই উল্লেখ আছে 'বাংলাদেশ একটি এককেন্দ্রিক, স্বাধীন, সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্র।' এ চুক্তির ফলে ফেডারেল সরকারকে সংবিধানের ভেতরে আঞ্চলিক অধিকারের প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়েছে।

১৯৭২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার সঙ্গে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা নিয়ে যথেষ্ট বাকবিতণ্ডা হয়েছে। তথাকথিত শান্তি চুক্তি সংবিধান বিরোধী, আইন ও এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থার পরিপন্থী।

পার্বত্য চট্টগ্রামে যেভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়েছে তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের সার্বভৌম ক্ষমতা ক্ষুন্ন করা হয়েছে। ভূমি বিষয়ক ক্ষমতা, ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য আঞ্চলিক পর্ষদের অনুমতি গ্রহণ, খনিজ সম্পদের রাজস্ব আঞ্চলিক পর্ষদের হাতে, কর্মকর্তা নিয়োগ প্রশ্নে কেবল উপজাতিদের অগ্রাধিকার–এসবই আঞ্চলিক পর্ষদের হাতে। এমনকি সেনাবাহিনী ব্যবহারের জন্য আঞ্চলিক পরিষদের অনুমোদন অর্থাৎ সরকারের সার্বভৌম ক্ষমতা আঞ্চলিক পরিষদকেই দেওয়া হয়েছে। এসবই সংবিধানের চরম বিরোধী।

শান্তি সবাই চায়। দু'দশকের বিরাজমান পরিস্থিতির অবশ্যই সমাধান হওয়া উচিত। চুক্তি হওয়া উচিত ছিল, দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল উপজাতি ও বসবাসরত

www.pathagar.com

বাঙালিদের প্রতিনিধি নিয়ে। সেই চুক্তি জাতীয় সংসদে পাস করে Act এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করলেই তিন জেলায় শান্তি আসতো।

রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ, সামরিক কৌশল সম্বন্ধে অজ্ঞ লোকরা একটা ক্ষুদ্র, বিদ্রোহী গ্রুপের কাছে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমগ্র অংশ ছেড়ে দিয়েছে। চাকমা বিদ্রোহী গ্রুপের হাতে চট্টগ্রামের এক ইঞ্চি জমিও ছিল না। এরা বর্গিদের মতো হামলা চালিয়ে আবার দ্রুত পার্শ্ববর্তী দেশে পালিয়ে যেত। শান্তিবাহিনীর প্রভাব এল টি টি বা চেচনিয়ার বিদ্রোহীদের চেয়ে অনেক কম। আইন-শৃঙ্খলার ব্যবস্থা জোরদার হলে সহজেই তাদের দমন করা যায়। যেহেতু চাকমারা কোনো জমি দখল করে রাখতে পারে না সেহেতু তাদের সঙ্গে চুক্তির প্রশ্নই আসে না।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পর্কে সরকার যে প্রচারণা চালাচ্ছে তা সত্যিই বিভ্রান্তিমূলক। দেশের সার্বভৌমত্ব নিয়ে তারা মানুষের সঙ্গে বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে। কারণ চুক্তির ভূমিকায় বলা হয়েছে, 'বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায়, বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আনুগত্য রাখিয়া' পার্বত্য অঞ্চলের নাগরিকের সঙ্গে চুক্তি সম্পন্ন হলো। অথচ শর্তাদি ঠিক তার উল্টো।

(বাংলাবাজার পত্রিকা, সাক্ষাৎকার, ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৭)

www.pathagar.com

৩ বিদেশী সাহায্যপুষ্ট বিচ্ছিন্নতাবাদ সহজেই লয়প্রাপ্ত হয় না

সুইডেনের বিশিষ্ট নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ আর্লিং বিজল, ক্ষুদ্রতর রাষ্ট্রের নিরাপত্তা সমস্যার ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে বিষয়টিকে হাঙ্গরের হিংস্রতা-সঞ্জাত আক্রমণ এবং তা থেকে ক্ষুদ্রাকৃতির সামুদ্রিক মৎস্য 'পাইলট ফিস' এর আত্মরক্ষার কৌশলের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁর মতে ঃ

"The Rim State's" problem is like the problem of" Pilot Fish: how to keep close to the shark without being eaten". (ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর সমস্যা 'পাইলট' মাছ এর মতোই, হাঙ্গরের কাছাকাছি থেকেও কিভাবে নিজেকে খাদ্য হতে না দেওয়া যায়।)

বাংলাদেশের অবস্থা, সে নিরীহ ও ক্ষুদ্র অথচ কৌশলী পাইলট মাছের-মতো। সে হাঙ্গর-সদৃশ ভারতের নাগালের মধ্যে থেকেও আত্মরক্ষা করে চলেছে।

আসলে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলো, ইতিহাসের অধিকাংশ সময় জুড়েই উঠতি শক্তির অধিকারী বৃহত্তর প্রতিবেশীর আগ্রাসী কোপানলে পতিত হয়েছে। আঠার, উনিশ এবং বিশ শতকে ইউরোপের ছোট ছোট রাজ্যের স্বাধীনতা ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা, তাদের বৃহত্তর প্রতিবেশীদের আগ্রাসী আক্রমণে বার বার বিপর্যস্ত হয়েছিল।

পোল্যান্ডের দুর্ভাগ্যই যে, সে তৎকালীন ইউরোপের তিন তিনটি বৃহৎ শক্তি-রাশিয়া, পার্শিয়া এবং অস্ট্রিয়ার প্রতিবেশী ছিল। এ কারণেই এক শতাব্দীর মধ্যে, তিন বার বিভক্তির ভাগ্যলিপি বরণ করে পোল্যান্ড বৃহত্তর দেশের প্রতিবেশী হওয়ার চড়ামূল্য পরিশোধ করে। বেলজিয়াম, দুই বৃহৎ দেশ জার্মানি ও ফ্রান্সের প্রতিবেশী হওয়ায়, বার বার আক্রমণ ও দখলদারিত্বের সম্মুখীন হয়। মেক্সিকোর ভূখণ্ডের বিরাট অংশ, তার উত্তর সীমান্তে দৈত্য-সদৃশ প্রতিবেশী গিলে ফেলে। রাশিয়ার জার সম্রাটরা, মুসলিম অধ্যুষিত পুরো মধ্য এশিয়া দখল করে নেয়।

কম্যুনিস্ট সোভিয়েত ইউনিয়ন তার ক্ষুদ্রতর প্রতিবেশী এস্তোনিয়া, লিথুনিয়া ও লাটভিয়াকে গলধঃকরণ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ব ফিনল্যান্ডের ১২% পোল্যান্ডের অংশ বিশেষ, বেসারাবিয়া (রোমানিয়া থেকে) এবং রুথনিয়া (চেকেস্লোভাকিয়া থেকে) সোভিয়েত ইউনিয়নের উদরে চলে যায়। বলা বাহুল্য, এ ধরনের বলপূর্বক সংযুক্তি ও

www.pathagar.com

দখলদারিত্ব যুদ্ধোত্তর শান্তি প্রক্রিয়ায় স্বীকৃতি পায়। সোভিয়েত একনায়ক স্ট্যালিন লজ্জার মাথা খেয়ে তো বলেই ফেললেন, তাঁর দেশের প্রতিরক্ষা মজবুত ও নিশ্চিত করতে, ক্ষুদ্র প্রতিবেশীর ভূখণ্ড তাঁর চাই-ই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর (১৯৪৫) কাল থেকে আজ পর্যন্ত, তৃতীয় বিশ্বের বৃহৎ দেশগুলো, তাদের ক্ষুদ্রতর প্রতিবেশীদের গিলে ফেলার কিংবা গিলতে চেষ্টা করার অসংখ্য নজির স্থাপন করেছে। ১৯৫০-৫১ সালে চীনের তিব্বত আক্রমণ; ১৯৪৭ সালে ভারতের কাশ্মীর এবং প্রায় একই সময়ে জুনাগড় ও হায়দারাবাদ দখল; ১৯৬১ সালে গোয়া গ্রাসকরণ এবং ১৯৪৭ সালে ভারতের সঙ্গে সিকিমের মিশে যাবার পরিস্থিতি সৃষ্টি; ১৯৭৫-৭৬ সালে ইন্দোনেশিয়া কর্তৃক পূর্ব তিমুর দখল; ১৯৭৮-৭৯ সালে ভিয়েতনামের কম্বোডিয়া অভিযান; ১৯৭৯ সালে ভিয়েতনামকে চীনের 'শিক্ষাদান' প্রভৃতি প্রমাণ করে যে, তৃতীয় বিশ্বের বৃহত্তর দেশ এবং তৃতীয় বিশ্ব-বহির্ভূত শক্তিধর দেশগুলো মূলত একই গুরুর শিষ্য, তারা যেন একই আগ্রাসী মানসিকতা থেকে উত্থিত।

ইউরোপের অতীত ইতিহাসের অনুকরণে, ভারত তার ক্ষুদ্রতর প্রতিবেশীদের গ্রাস করার প্রক্রিয়া হিসেবে, ইতিমধ্যেই সিকিমের পৃথক সত্তা ও অস্তিত্বের বিলোপ ঘটিয়েছে। ভুটান-নেপাল অনেকটা ভারত-নির্ভর নামমাত্র স্বাধীনতা নিয়ে টিকে আছে। শ্রীলংকা ভারতীয় কূটনীতির থাবায় ক্ষত-বিক্ষত।

একই প্রক্রিয়ায় ভারত বাংলাদেশকেও অতি দ্রুত পঙ্গু ও দুর্বল করে গ্রাস করতে চায় বলে মনে হয়। বেরুবাড়ির বিনিময়ে চুক্তি অনুযায়ী তিন বিঘা করিডরের সার্বভৌমত্ব হস্তান্তরে অস্বীকৃতি, তালপট্টি দখল, গঙ্গাসহ অনেকগুলো নদীপ্রবাহ বন্ধ করে বাংলাদেশকে পানি-বঞ্চিত করার কৌশলের মাধ্যমে বাংলাদেশকে ঘায়েল করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ভারত। ভারতীয় চক্রান্তের সর্বাধিক প্রকট ফসল হলো, পার্বত্য চট্টগ্রামের চলমান সংকট।

নিজ দেশের উপজাতীয় জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত ৭টি রাজ্যের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে নির্মমভাবে দমনকারী ভারত, পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিবাহিনী নামের সন্ত্রাসীদের পৃষ্ঠপোষকতা দিচ্ছে, এ কথা সর্বজনবিদিত। আজ আর কারো সন্দেহ নেই যে, দরিদ্র বাংলাদেশের সর্বাধিক সুবিধাপ্রাপ্ত দেশদ্রোহী উপজাতীয়দের নেপথ্য শক্তি ভারত।

সর্বোপরি, বিদেশী সাহায্যপুষ্ট বিচ্ছিন্নতাবাদ যে সহজে লয়প্রাপ্ত হয় না—এ সত্য মনে রেখে আমার এ প্রতীতি জন্মেছে যে, বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আর কোনো ধরনের 'ছাড়' দেওয়া হলে দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা সুনিশ্চিত সংকটের সম্মুখীন হবে।

www.pathagar.com

সুপরিকল্পিত উপায়ে, এ সমস্যাটিকে দীর্ঘদিন ধরে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। বর্তমান সরকার সম্মানজনক সমাধানের যে উদ্যোগ নিয়েছেন, তার সাফল্য কামনা করেও বলতে চাই, আলোচনার পাশাপাশি অবিলম্বে উপজাতীয়দের স্বার্থ অক্ষুণ্ন রেখে বাঙালি বসতি পুনরারম্ভের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। জনসংহতি সমিতির সঙ্গে আলোচনার কারণে সরকার অনির্দিষ্টকাল ধরে নিজ দেশের মাটিতে বাংলাদেশীদের বসতি স্থাপন বন্ধ রাখার অর্থাৎ তাদের শাসনতান্ত্রিক অধিকার স্থগিত রাখার যে যুক্তি দেখাচ্ছেন কোনোক্রমেই তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

অতন্দ্র জনতা, নিবন্ধ, ২৩ অক্টোবর, ১৯৯৭

www.pathagar.com

৪ উপজেলা পদ্ধতি প্রবর্তন এরশাদের একমাত্র ভালো কাজ

প্রশ্ন ॥ বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা কি একটি শক্তিশালী ও স্থিতিশীল ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে পেরেছে? না পারলে কেন পারেনি?

উত্তর ॥ না, এখনো পর্যন্ত পারেনি। সব সরকারের আমলেই মোটামুটি চেষ্টা হয়েছে, গ্রাম পর্যায়ে সমর্থন জোগাড় করার জন্য স্থানীয় সরকার কাঠামো গড়ে তুলতে। একেক সরকার একেক ধরনের নীতি গ্রহণ করেছে এ ব্যাপারে। তাত্ত্বিক দিক থেকে দেশের বুদ্ধিজীবীরা ও রাজনীতিবিদগণ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য কোনো সর্বসম্মত গ্রহণযোগ্য দীর্ঘস্থায়ী নীতি গ্রহণ করতে পারেনি। ফলে যে সরকার এসেছে সে নিজের সুবিধা মতো নীতি গ্রহণ করেছে। সরকারের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, স্থানীয় সরকারের ব্যাপারে পরিবর্তিত নীতিমালা গ্রহণ করা হয়েছে। এসব কারণে স্থানীয় সরকার পদ্ধতি সুষ্ঠুভাবে গড়ে উঠতে পারেনি। তবে বৃটিশ আমল থেকে ইউনিয়ন বোর্ড/ কাউন্সিল থাকার কারণে, গ্রামীণ জনগণের মধ্যে স্থানীয় সরকার সম্পর্কে কিছুটা ধারণা আছে, যা ভবিষ্যতে রাজনীতিবিদগণ ইচ্ছা করলে সঠিক পথে চালনা করতে পারবেন।

প্র ॥ দেশে যে গ্রাম পরিষদ গঠিত হতে যাচ্ছে, তাতে অসঙ্গতি আছে বলে মনে করেন কি না?

উ ॥ গ্রাম পরিষদের সদস্য হওয়ার জন্য মনোনয়ন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। এই মনোনয়ন দেওয়ার কর্তৃত্ব কার হাতে থাকবে তা স্পষ্ট করে না বললেও, আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে আশংকা করতে পারি যে, আওয়ামী লীগ সরকার বাকশাল পদ্ধতিতে গ্রামগুলোকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালাবে। বাস্তবিক পক্ষে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য জনগণকে জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করানো। বাংলাদেশের একটি গ্রাম প্রকৃতপক্ষে টেকসই ইউনিট (viable unit) হয় না। এটি বেশি ছোট হয়ে যায়। আমার মতে, জিয়াউর রহমান যেটা চালু করতে চেয়েছিলেন উপজেলা পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সেই কাজটিই করেন। অধিকাংশ পল্লী বিশেষজ্ঞগণের মতে, উপজেলা/থানা পরিষদ উন্নয়নের মূল কেন্দ্রবিন্দু হওয়া উচিত। যে কারণে, যদিও আমি এরশাদ সাহেবকে খুব অপছন্দ করি তবুও উপজেলা পদ্ধতি এরশাদ আমলের একমাত্র ভালো কাজ বলে মনে করি। সাবেক থানা পরিষদের মতো

www.pathagar.com

আয়তনবিশিষ্ট স্থানীয় সরকারের ইউনিট, উন্নয়ন কাজের Basic Geographical Unit হতে পারে। জিয়া যে কারণে 'গ্রাম সরকার' চালু করেন, বর্তমান সরকারের ঠিক একই উদ্দেশ্য- নিজের দলকে গ্রাম পর্যায়ে সম্প্রসারিত, সংগঠিত ও শক্তিশালী করা। আমার মতে, স্থানীয় সরকার পদ্ধতির সর্বনিম্ন স্তর ইউনিয়ন পরিষদ (কয়েকটি গ্রাম নিয়ে) হওয়া উচিত। তবে পল্লী উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যবিন্দু হবে উপজেলা বা থানা পরিষদ। যাই বলা হোক না কেন, স্বয়ংসম্পূর্ণ স্থানীয় সরকার পরিচালনার জন্য এটাই হবে আদর্শ অঞ্চল বা ইউনিট। কারণ Thana or upazilla is neither big nor too small unit for proper planning of rural development.

প্র ॥ কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে নির্বাচনে কি কি অসুবিধা হতে পারে?

উ ॥ যে পদ্ধতিতে মেম্বারদের নির্বাচনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তাতে সরকার কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তিই মূলত গ্রাম পরিষদের সদস্যদের মনোনয়ন দেবেন। সরকার মনোনীত ব্যক্তি থানা নির্বাহী অফিসার (টিএনও) হওয়াই স্বাভাবিক; ফলে টিএনওর মতো সরকারি কর্মকর্তাকে দলীয় রাজনীতিতে জড়ানো হবে। সরকারি কর্মকর্তাদের রাজনীতিকে প্রভাবিত করার সুবিধা দেওয়া হবে। এটা গণতন্ত্রের ঘোরতর পরিপন্থী। সরকারি কর্মকর্তা স্থানীয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়লে তার প্রশাসনিক ক্ষমতা কমে যাবে। আমি আগেই বলেছি, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা ইউনিয়ন থেকে শুরু হওয়া উচিত। তাই নতুন প্রবর্তিত গ্রাম পরিষদ বাতিল করে দেওয়া উচিত।

প্র ॥ সরকার বলছে, ক্ষমতাপ্রাপ্ত পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানও হতে পারে।

উ ॥ সরকার যাই বলুক না কেন, গ্রাম পরিষদের সম্পূর্ণ নিয়োগ পদ্ধতিটি অস্পষ্ট রয়েছে। গণতন্ত্রের আবরণে এক রকম মনোনয়ন ব্যবস্থা পাকা করা হয়েছে বলে মনে হয়।

প্র ॥ এ ক্ষেত্রে পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে দলীয় লোক নিয়োগের সম্ভাবনা আছে কি না?

উ ॥ নিশ্চয়ই আছে। তবে আমার মনে হয়, সরকার সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাধ্যমেই তাদের উদ্দেশ্য সাধন করতে চায়।

প্র ॥ নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে, সরকারি কর্মচারীদের নিয়োগ করলে কোন প্রকৃতির সমস্যা হতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

উ ॥ আগেই বলেছি, সরকারি কর্মকর্তাদের মনোনয়নের কর্তৃত্ব প্রদান করা হলে উপরওয়ালাদের চাপে তারা নিরপেক্ষতা হারিয়ে ফেলতে পারে। অর্থাৎ এর ফলে নিম্ন সরকারি কর্মচারীদের রাজনীতিকীকরণ প্রক্রিয়া আরও প্রকট আকার ধারণ করবে– যা সাধারণ জনগণের জন্য কল্যাণকর হবে না।

www.pathagar.com

প্র ॥ গ্রাম পরিষদ কার্যালয়ের স্থান নির্ধারণ, কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ, অর্থায়ন ইত্যাদি ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের হাতে দেওয়া হয়েছে। বিষয়গুলোকে আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

উ ॥ এটা একটা নব্য বাকশালী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা।

প্র ॥ গ্রাম পরিষদের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে, পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অর্থ ইউনিয়ন পরিষদ দেবে গ্রাম পরিষদকে। এর দ্বারা গ্রাম পরিষদের সঙ্গে ইউনিয়ন পরিষদের কর্তৃত্বও ওই নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের হাতে চলে যাবে বলে মনে করেন কি না?

উ ॥ এর ফলে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ সরকারি কর্মকর্তা (টিএনও বা নতুন সৃষ্ট পদ) পদের আরো বেশি রাজনীতিকীকরণ করা হবে। সরকারি কর্মকর্তার ওপর চাপ পড়বে ক্ষমতাসীনদের বাছাইকৃত লোক নিয়োগের জন্য।

প্র ॥ পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষকে সদস্য অপসারণের ক্ষমতা দেওয়াকে আপনি কিভাবে বিচার করবেন?

উ ॥ এ প্রক্রিয়াকে আমি সরকারি কর্মকর্তাদের দলীয় স্বার্থে ব্যবহারের অপচেষ্টা বলে মনে করি।

প্র ॥ বিধি-বিধান সাপেক্ষে গ্রাম পরিষদ স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন করতে পারবে এবং হস্তান্তর করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে গ্রাম পর্যায়ে সম্পত্তি অর্জন ও বিলি-বণ্টনের ক্ষেত্রে কি ধরনের প্রভাব পড়তে পারে?

উ ॥ গ্রামের মতো এতোটুকু ছোট্ট এলাকার মধ্যে, কোনো কর্তৃপক্ষকে সম্পত্তি অর্জন ও হস্তান্তরের ক্ষমতা দেওয়া ঠিক নয় বলে আমি মনে করি। দু'পক্ষের মধ্যে মারামারি, হানাহানি সৃষ্টি হবে। গ্রামের টাউট শ্রেণীর লোকদের প্রতিপত্তি বেড়ে যাবে, ফলে গ্রামীণ জনপদে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটবে।

প্র ॥ গ্রাম পরিষদ এলাকায়, পুরুষ ও মহিলা ভোটারদের সাধারণ সভায় 'ধ্বনি ভোট' বা 'হাত তুলে' সমর্থনের মাধ্যমে পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হবে। এ পদ্ধতিকে প্রকৃত অর্থে নির্বাচন বলা যায় কি না?

উ ॥ এটাও নির্বাচন হতে পারে, যদি নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ নিরপেক্ষ হন। তবে এরূপ প্রত্যক্ষ ভোটে সভ্য নির্বাচন করতে গ্রামবাসীরা প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে না যাওয়ার চেষ্টা করবে। যতোক্ষণ পর্যন্ত সার্বজনীন শিক্ষার বিস্তার না হবে ততোক্ষণ পর্যন্ত তথাকথিত জোতদার ও ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে জড়িত টাউটরা প্রকাশ্যে ভোটারদের প্রভাবিত করবে। সুতরাং যদি গ্রাম পরিষদ রাখতেই হয় তাহলে মেম্বারদের গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা উচিত। নির্বাচনের যে পদ্ধতি রাখা হয়েছে সে পদ্ধতিতে বেশি ভোটার উপস্থিত হবে না লাঞ্ছিত হবার ভয়ে। এ পদ্ধতিতে গ্রামে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে এবং গ্রামীণ জনপদে যতোটুকু শান্তি ছিল তাও বিনষ্ট হবে।

প্র ॥ গ্রাম পরিষদের নির্বাচন ও অর্থায়নের যে পদ্ধতি রাখা হয়েছে অনেকে একে সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক মনে করছেন। আপনার বক্তব্য জানতে চাই।

www.pathagar.com

উ ॥ এটা সংবিধানের ৫৯(১) এবং ৬০ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী বলে প্রতীয়মান হয়।

প্র ॥ সরকার পক্ষ বলছে, গ্রাম পরিষদ 'জিয়াউর রহমান প্রবর্তিত গ্রাম সরকার'-এর আদলে গঠন করা হয়েছে, এটা কি ঠিক? দু'ব্যবস্থার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কি?

উ ॥ এটা ঠিক। জিয়াউর রহমান ও বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের মূল উদ্দেশ্য এক। এ দু'পদ্ধতির মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই বরং দু'পদ্ধতির একই উদ্দেশ্য–এর মাধ্যমে গ্রামকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং গ্রামের প্রভাবশালীদের নিজ দলে অন্তর্ভুক্ত করা। মনোনয়ন পদ্ধতি থাকার কারণে সকল দলের পক্ষ থেকে গ্রাম পরিষদের বিরোধিতা করা হচ্ছে এবং সরকারের স্বচ্ছতার প্রতি অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে। এই অবিশ্বাস সৃষ্টির কি প্রয়োজন ছিল? স্থানীয় সরকার পদ্ধতি আসলে যতো সহজ ও সরল করা যায় ততোই ভালো। বর্তমান গ্রাম পরিষদ আইনে দ্বৈত ভূমিকা সৃষ্টি করা হয়েছে। তা না করলেই ভালো হতো। যেহেতু গ্রাম পরিষদ ব্যবস্থা ভূমিহীন ক্ষুদ্র ব্যবসায় বা বিভিন্ন পেশার লোকজনের আনুপাতিক হারে আসন দেয়া হয়নি, সেহেতু গ্রাম পরিষদ গ্রামের বর্তমান ক্ষমতার কাঠামোকে ধারণ করেই গড়ে উঠেছে। এতে কোনো পরিবর্তন আসবে না। প্রভাবশালীরা সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করবে। বড় জোতদার ও সরকার কর্তৃক সমর্থিত টাউটদের কর্তৃত্ব বহাল থাকবে।

দৈনিক সংগ্রাম, সাক্ষাৎকার, ১০ অক্টোবর, ১৯৯৭

www.pathagar.com

৫ রাষ্ট্রপতির প্রাইভেটলি বক্তব্য দেওয়া উচিত

রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন বিষয়ে যেসব বক্তব্য রেখেছেন, তা সাংবিধানিকভাবে সঠিক। তবে তার এসব বক্তব্য বা মতামত প্রকাশ্যে না দিয়ে, প্রাইভেটলি দেওয়া উচিত। সংসদীয় পদ্ধতির সরকার হিসাবে বাংলাদেশেও ব্রিটিশ ধারার চর্চা হওয়া উচিত। ব্রিটিশ রাজতন্ত্রে রাজা বা রানীর উপদেশ ও সতর্ক করার অধিকার রয়েছে। রানী এই ধারাকে ঠিকভাবে ব্যবহার করছেন। বিখ্যাত ব্রিটিশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ওয়াল্টার বেঘটও এই ধারা চর্চার পক্ষপাতী। আরেক ব্রিটিশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হেরাল্ড লাস্কিও এই ধারণাকে সমর্থন করেন। তবে কথা হচ্ছে, ব্রিটিশ রাজতন্ত্রে এটা করা হয় গোপনে, বাইরে প্রচারে করা হয় না।

রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীনও ইচ্ছে করলে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বা বিরোধীদলীয় নেত্রীকে কোনো বিষয়ে উপদেশ বা সতর্ক করে দিতে পারেন। তবে প্রকাশ্যে বক্তব্য দেওয়াটা তার ঠিক নয়। যেহেতু আমাদের দেশে বড় দলগুলো কোনো ব্যাপারে ঐকমত্যে আসে না, তাই মিডিয়েটর হিসেবে তিনি ভূমিকা রাখতে পারেন। 'উপদেশ' এবং 'সতর্ক' করা এই দুটি অধিকার ইংল্যান্ডের রানীর কনভেনশনালি স্বীকৃত। শি ক্যান প্লে দিজ রোল উইদাউট প্রেস কভারেজ।

সরকারি ও বিরোধী উভয় দলই রাষ্ট্রপতির কাছে যেতে পারে। কিন্তু সে যাওয়া বা বৈঠকের খবর প্রেসে দেওয়া উচিত নয়। যে কোনো বিষয় আলোচনা করার এখতিয়ার রাষ্ট্রপতির রয়েছে। তবে বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রপতির উচিত সবাইকে বোঝানো, কিন্তু প্রেসে ছবি দেওয়ার দরকার কি? বড়জোর বৈঠকের একটা ছোট্ট খবর যেতে পারে। রাষ্ট্রপতি যেসব বক্তব্য বা মতামত দিচ্ছেন, তাতে তার উদ্যোগ বা উদ্দেশ্য সৎ হলেও, ক্ষমতাসীন দলের ভেতর থেকে তিনি সমালোচিত হতে পারেন। তাই রাজনৈতিক বিতর্কের মধ্যে তার না যাওয়াই ভালো।

সাপ্তাহিক অন্বেষা, সাক্ষাৎকার, ৯ অক্টোবর, ১৯৯৭

www.pathagar.com

৬ প্রধান প্রধান জাতীয় ইস্যুতে হাসিনা ও খালেদার ঐকমত্যে আসা উচিত

প্রশ্ন ॥ আমাদের দেশে যখনই যারা ক্ষমতাসীন হচ্ছেন, তারাই বলছেন–তারা যা করছেন তা গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্যে করছেন। আর যারাই বিরোধী দলে থাকছেন, তারাই বলছেন- সরকার গণতান্ত্রিক আচরণ করছে না, গণতন্ত্র মানছে না। আসলে বিষয়টা কি?

উত্তর ॥ এটা হলো যে, গণতন্ত্র অ্যাজ এ ফর্ম অব গভর্নমেন্ট, 'অ্যাজ এ ওয়ে অব লাইফ।' 'অ্যাজ এ ফর্ম অব গভর্ণমেন্ট' এখন আছে। কিন্তু 'অ্যাজ এ ওয়ে অব লাইফ', টলারেশন অব আদারস ভিউজ, টলারেশন অব অপজিশন' অথবা 'ফ্রিডম অব এক্সপ্রেশন' 'এগুলো হলো গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ। সেই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বা গণতান্ত্রিক ওয়ে অব লাইফ সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। তবে গণতান্ত্রিক স্ট্রাকচারটা আছে। সো দেয়ার ইজ এ গ্যাপ বিটুইন আইডিয়াল অ্যান্ড দ্যা রিয়ালিটি।

ইসলাম প্রশ্নে আওয়ামী লীগ
বিএনপিতে ফারাক নেই

প্র ॥ একটু বিস্তারিত আর নির্দিষ্ট করে যদি বলেন।

উ ॥ একটা জিনিস আমার খুব ভালো লাগছে, সেটা অবশ্য আমার ব্যক্তিগত অভিমত, সেটা হলো যে, যখন বাংলাদেশ সৃষ্টি হয় তখন বলা হচ্ছিল রেইস, ল্যাংগুয়েজ ও ভৌগোলিক পারসপেকটিভ-এর কথা। ইসলামের ওপর জোর দেওয়া হয়নি। কিন্তু পরে যে কারণেই হোক, যেহেতু ৯০ ভাগ মুসলমান সুতরাং এখন আওয়ামী লীগও ইসলামের গুরুত্ব মোটামুটি স্বীকার করে নিয়েছে। তারা ওয়ার্কিং অধিবেশনে 'বিসমিল্লাহ' দিয়ে সব কাজ শুরু করে। তার মানে ইসলামও যে একটা অংশ এটা এখন দু'দলই স্বীকার করে নিয়েছে। এ ঐকমত্য আমি পজিটিভলি দেখছি। এ বিষয়ে আর কোনো মতপার্থক্যের সম্ভাবনা নেই। আওয়ামী লীগ আর বিএনপি'র মধ্যে আমি বেশি মৌলিক পার্থক্য দেখছি না।

www.pathagar.com

প্র ॥ কিন্তু কাজের ধরনে বা সরকার পরিচালনার দিক থেকে?

উ ॥ আওয়ামী লীগ প্রথম থেকেই স্বাধীনতার পার্টি হিসেবে দাবি করে আসছে। মানে- আমরাই স্বাধীনতা এনেছি। এ দাবিটা তারা ছাড়তে চায় না। অনেক বেশিই করে আর কি। অতো বেশি না করলেই চলে। যেমন- টিভি খুললেই বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবন্ধু। দরকার পড়ে না তো। বঙ্গবন্ধুকে তো কেউ অস্বীকার করে না। অ্যাজ এ ফাউন্ডিং লিডার অব দ্যা ন্যাশন, নোবডি অবজেকটস ইট। আমরা পলিটিক্যাল সায়েন্টিস্টরা বলবো- ফাউন্ডিং লিডার অব দ্যা ন্যাশন। যারা আওয়ামী লীগের, তারা বলবেন বঙ্গবন্ধু। আবার যারা বেশি ভালোবাসেন তারা বলবেন, জাতির পিতা। দ্যাটস অল রাইট। গান্ধীকেও তো ভারতের জাতির পিতা বলা হয়েছে। সংবিধানে তো আর লিখে দেয়া হয়নি। অনেকে মনে করেন, গান্ধী না নেহরুই ছিলেন প্রকৃত জাতির পিতা। সুতরাং এগুলো মামুলি ব্যাপার। শেখ মুজিবুর রহমান ফাউন্ডিং লিডার অব দ্যা কান্ট্রি। তা যে ভাবেই তাঁর পতন হোক, তাঁর যে গ্রেট কন্ট্রিবিউশন, এটাকে তো কেউ চ্যালেঞ্জ করেনি। সুতরাং এটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে বরং, ইন্টেলেকচুয়ালি সেকেন্ড মুজিব হত্যা হতে পারে। তবে এটার মধ্যে যে পার্সোনাল ইনভলভমেন্ট আছে তা বুঝতে পারি। হাসিনা, শি ইজ এ বিগ লিডার। বাট শি ইজ এ ভেরি সাফারড লেডি, ইন দ্যা সেন্স, শি হ্যাজ লস্ট হার ফাদার-মাদার এভরিবডি। সুতরাং এটা তার মনে বারবার আসেই। কিন্তু তবু তাকে একটু প্রাগমেটিক হতে হবে। একটা জিনিস বেশি বললে, জিনিসটা তিতা হয়ে যায়।

প্র ॥ সরকার পরিচালনার প্রশ্নে?

উ ॥ সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে কতোগুলো সাধারণ নিয়ম-কানুন আওয়ামী লীগ মানতে চাচ্ছে না। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন নির্বাচিত উপাচার্যকে সরিয়ে দলীয় লোককে বসানো হয়েছে। আমি একসময় সেখানে ছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে এভাবে দলীয়করণের দশা আগে তেমন একটা দেখা যায়নি। কিছু নিয়ম-কানুন আওয়ামী লীগ মানতে চাচ্ছে না, এটা গণতন্ত্রের জন্য শুভ লক্ষণ না। সে জন্যই অনেকে বলে, ফ্যাসিস্টসুলভ ব্যবহার। এ এটিচ্যুড কিছুটা আওয়ামী লীগের মধ্যে আছে। আওয়ামী লীগ শুড বি কনশাস অ্যাবাউট ইট; এটা ছেড়ে দেওয়াই ভালো। যেমন আমি খুব আহত হয়েছি যে, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান বলেছেন, আমরা ইচ্ছা করলে চিরদিন ক্ষমতায় থাকতে পারি। এটা তো একটা গণতান্ত্রিক কথা হলো না। গণতন্ত্রে চেঞ্জ অব দ্যা পাওয়ার শুড বি অ্যাকসেপ্টেড।

তবে ক্ষমতার বদলের জন্য, আমি ব্যক্তিগতভাবে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার কনসেপ্ট সমর্থন করি না। কারণ এর ফিলোসফি হলো যে, পলিটিশিয়ানরা পলিটিশিয়ানদের বিশ্বাস করে না,তাই কয়েকজন ফেরেশতা ধরে নিয়ে আসো। ফেরেশতারা নির্বাচনটা করে দিয়ে যাক, তার পর আবার রাজনীতিকরা মারামারি করুক। সেদিন ব্রিটেনে নির্বাচন হলো। রুলিং কনজারভেটিভ পার্টি ওয়াজ এ কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট। সুষ্ঠু

www.pathagar.com

নির্বাচন অনুষ্ঠানে অসুবিধা কিছু হলো না। এভাবে যেদিন আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে বিএনপি অথবা বিএনপি সরকারের অধীনে নির্বাচন করে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসবে, সেটাই হবে রিয়েল ডেমোক্রেসি। তখন বোঝা যাবে যে, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ দু'পক্ষেরই আছে। এখন দু'পক্ষেরই নেই। যে ক্ষমতায় যেতে পারে, সেই থাকতে চায়। তবে মনে হয় এটা একটু কমছে।

প্র ॥ তা হলে কি আমরা ধরে নিতে পারি, এখনো এ দেশে গণতন্ত্র একেবারে জন্মের পর্যায়ে আছে?

উ ॥ হ্যাঁ, তবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াটা ধীরে হলেও শুরু হয়েছে। বিরোধীদলীয় এবং সরকার দলের নেত্রীর যে বক্তৃতা, তার মধ্যে বাক-বিতণ্ডার যে একটা শার্পনেস ছিল, তা অনেকটা কমে গেছে। আমার মনে হচ্ছে, আওয়ামী লীগ ও বিএনপি উভয়েই তাদের অতীত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা লাভ করছে। কিছুটা সংযত মনোভাব, দুই দলের নেতাদের মধ্যেই দেখা যাচ্ছে।

প্র ॥ এ দুই বড় দলের নিজেদের মধ্যে গণতন্ত্র নেই। তারা তাদের নিজেদের নেতা-নেত্রী নির্বাচনে, নীতি-নির্ধারণে, তাদের দুই মূল নেত্রীর ওপর প্রায় নির্ভরশীল।

উ ॥ এজন্য ট্র্যাডিশন দরকার। আমাদের জাতীয় পলিটিক্যাল কালচার যেটা, সেটা অনেকটা 'ফ্যাকশনালিজম প্রোমোট' করে। এই এক দল ভেঙে আরেক দল হয়ে যায়। এটা আমাদের একটা প্রবণতা হয়ে গেছে। এজন্য দল ঠিক রাখতে, সবার কাছে গ্রহণযোগ্য একজন নেতা দরকার।

প্র ॥ কিন্তু দলের ভেতরেই যদি গণতন্ত্রের চর্চা না থাকে–

উ ॥ সেটাই বলছি। কথাটা এভাবে বলা যায়, হাসিনা না থাকলেই আওয়ামী লীগ তিন ভাগ, খালেদা জিয়া না থাকলে বিএনপি কয়েক ভাগ। ইন দ্যাট ওয়ে, দে আর ন্যাশনাল কনসেনশাস বিল্ডারস রাদার দ্যান পার্টি লিডারস।

প্র ॥ গণতান্ত্রিক আচরণের বাইরে গণতন্ত্রের যে মৌলিক বিষয়গুলো-ক্ষুধা, দারিদ্র্য, বেকারত্ব এসব বিষয়ে বিএনপি আর আওয়ামী লীগ সরকারের কি ধরনের পার্থক্য লক্ষ্য করছেন?

উ ॥ ওই একই কথা। তবে ম্যাটার অব ইমপ্লিমেন্টেশন।

প্র ॥ ইমপ্লিমেন্টেশনের জায়গা থেকে কোনো পার্থক্য আছে কি?

উ ॥ আওয়ামী লীগ মাত্র অল্প ক'মাস ক্ষমতায়। এতে ঠিক বোঝা যায় না। বিএনপি মোটামুটি ভালোই ছিল। শেষে অবশ্য দু'বছর স্ট্রাইকেই গেলো। আওয়ামী লীগের ডিফেক্ট হচ্ছে তার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ক্যাপাবিলিটি অতো নেই। এর কারণ অনভিজ্ঞতা। তবে আমি মনে করি- রাজ্জাক, তোফায়েল, নাসিম- দিজ পলিটিক্যাল মিনিস্টারস আর ডুইং ফাইন। তারা বক্তব্যও অনেক সংযত করে ফেলেছেন। সুতরাং দেশ মোটামুটি গণতন্ত্রের দিকে যাচ্ছে। আমি আশাবাদী।

প্র ॥ আওয়ামী লীগে'র দক্ষতা-

উ ॥ দক্ষতার অভাব আছে বলে আমার মনে হয়। এর কারণ দীর্ঘ দিন ক্ষমতায় না থাকা।

www.pathagar.com

জিয়ার আনা বিধানটি আসলে গণতান্ত্রিক নয়

প্র ॥ আপনি সম্ভবত সরকারের অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের কথা কিছু বলছিলেন?

উ ॥ আমার মতে, এসব অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব না নেওয়াই ভালো। আই অ্যাম ইগার টু পয়েন্ট আউট, আওয়ামী লীগের কেবিনেটেই এতো নন আওয়ামী লীগার আছে। পলিটিক্স শুড বিলং টু পলিটিশিয়ান। আর এক্সপার্ট কাউকে যদি নিতে হয় তা হলে এভাবে না, এক্সপার্ট অ্যাডভাইজার হিসেবে নেয়া যায়। 'পলিটিক্স মাস্ট বি ইন কমান্ড'। কেবিনেট শুড বি ইন কমান্ড। অ্যান্ড কেবিনেট শুড কনসিস্টস অব পলিটিশিয়ানস। জিয়াউর রহমান প্রোভিশন করে গেছেন যে, দশভাগ স্পেশালিস্ট আনা হবে। দ্যাট ইজ নট রিয়ালি ডেমোক্রেটিক প্র্যাকটিস। স্পেশালিস্টদের ফাংশন হলো টু অ্যাডভাইজ অন স্পেসিফিক ম্যাটারস। ন্যাশনাল গোল, ওভার অল ফিলোসফি, দিজ শুড বি দ্যা প্রিজার্ভ অব দ্যা পলিটিশিয়ান, হু আর দ্যা রিয়াল লিডারস অব দ্যা কান্ট্রি। এটা গড়তে সময় লাগবে। যেমন এটাও বলতে পারি যে, পরবর্তীকালে যদি খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী হন, শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হন তারা বেটার প্রধানমন্ত্রী হবেন। কারণ তখন তারা নিজেদের ভুল থেকে শিখতে পারবেন। এরা একজন গৃহিণী থেকে, আরেক জন অপজিশন থেকে এসে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। সুতরাং অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে আমলারা অনেকটা আধিপত্য বিস্তার করে। পলিটিক্যাল ইনফ্লুয়েন্সটা অতোটা রিফ্লেকটেড হতে পারে না ফিলোসোফিক্যালি। কিন্তু আই ওয়ান্ট দ্যাট পলিটিক্স মাস্ট বি ইন কমান্ড। এটা অবশ্য মাও সে তুং-এর কথা, আই অ্যাম নট অরিজিনাল।

প্র ॥ এখানে কি সেনাবাহিনীর কোনো নেপথ্য ভূমিকা আছে? যেমন- ১২ জুনের নির্বাচনের আগে সেনাবাহিনীর একটা অংশ ট্যাঙ্ক নিয়ে রাজপথে নেমেছিল।

উ ॥ ওই ঘটনাটা যখন ঘটে, তখন আমি জাপানে ছিলাম। তাই বিস্তারিত জানি না। তবে পত্রপত্রিকায় যতোটা পড়েছি, তা থেকে আমার মনে হয় যে, বিশ্বাস ওয়াজ ভেরি রাইট ইন অ্যাসারটিং দ্যা সিভিলিয়ান অথরিটি। প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান অ্যান্ড প্রেসিডেন্ট বিশ্বাস ওয়াজ রাইট।

প্র ॥ মুক্তিযুদ্ধের পর থেকে বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহে মনে হচ্ছে যেনো সেনাবাহিনী রাষ্ট্রপরিচালনায় এক ধরনের ভূমিকা রাখতে চায়, অথবা রাখার ক্ষেত্র তৈরি করছে। তাই রাষ্ট্রপরিচালনায় সেনাবাহিনীর কোনো ভূমিকা আছে কি-না, থাকা উচিত কি-না, এবং থাকতে হলে তা কিভাবে হওয়া উচিত?

উ ॥ আর্মি শুড বি আন্ডার দ্যা কন্ট্রোল অব দ্যা সিভিল গভর্নমেন্ট। দ্যাট'স দ্যা বেসিক অব ডেমোক্রেসি। কথাটা হচ্ছে কি, সেনাবাহিনী আর আগের মতো ক্ষমতা নেওয়ার জন্যে অতোটা বোধহয় উদগ্রীব না।

প্র ॥ সরকার পরিচালনায় তারা কি কোনো ভূমিকা রাখছে?

উ ॥ আই ডোন্ট নো, হোয়েদার দে হ্যাভ এনি ইনফ্লুয়েন্স উইথ শেখ হাসিনা গভর্নমেন্ট। বাট ইট সিমস্ টু মি, শেখ হাসিনা ইজ ইন কমান্ড।

www.pathagar.com

প্র ॥ পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের বিষয়টা-

উ ॥ এটা বেশি দূর গেলে হয়তো সেনাবাহিনীর মধ্যে প্রতিক্রিয়া হতে পারে। ন্যাশনাল সিকিউরিটির ব্যাপার আছে তো। সুতরাং এ ব্যাপারে হাসিনা গুড বি ক্লিয়ার অ্যান্ড টক টু দেম। জাতীয় স্বার্থে এটা করা উচিত। তাদের সঙ্গে কনসাল্ট করা উচিত, তাদের এক্সপার্ট অপিনিয়নটা কি। পাবলিক অপিনিয়নও এটা চাচ্ছে না, সুতরাং হাসিনা গুড বি কেয়ার ফুল। এটা আমার ব্যক্তিগত মত।

প্র ॥ একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে আপনি কিভাবে দেখছেন?

উ ॥ এগুলো হলো লো টেনশন ওয়ার। এটা অনেক দিন চলে। এটা চেপে রাখা যায় না। কারণ সাধারণত এটা বিদেশী সাহায্য ও আশ্রয় পায়। ভারত যতদিন আশ্রয় প্রশ্রয় দেবে ততদিন শান্তিবাহিনীর এ উৎপাত চলতেই থাকবে। হাসিনা একদিন মুখ ফসকে বলে ফেলেছিলেন, দু' একটা মরতেই থাকবে। কথাটার অনেক সমালোচনা হয়েছে। কিন্তু কথাটা সত্যি। সুতরাং ওদের সঙ্গে নেগোসিয়েশন করতে হবে, কিন্তু আমাদের সার্বভৌমত্ব ছাড়া যাবে না।

প্র ॥ কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়িদের মধ্যে শান্তিবাহিনীর জনপ্রিয়তা অবিশ্বাস্য রকমের। দ্বিতীয়ত শান্তিবাহিনীর যে যুদ্ধ, তা দমনের জন্য সাধারণ পাহাড়িদের ওপর নির্যাতন করা হয়েছে। বাঙালিরা গিয়ে তাদের বসতি দখল করেছে, তাদের ভূমি দখল করেছে। অপারেশনের নামে সেনাবাহিনী সেখানে যে সব হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে এটাও চলতে পারে না।

উ ॥ এর মধ্যে দ্বিমত আছে। যখন গোলাগুলি হয়, তখন দু'পক্ষ থেকেই হয়। কথা হলো যে, শেখ সাহেব তো তাদের বলেছিলেন, ভাই তোমরা নিজেদের মধ্যে গোলমাল করো না। পয়েন্ট ফোর পারসেন্ট অব দ্যা পিপল্, টেন পারসেন্ট অব দ্যা ল্যান্ড। এটা নিয়ে গোলমাল করো না। যতোটুকু দেওয়ার কথা, আমি দেবো। তোমরা চুপচাপ থাকো। তখন আবার চীন তাদেরকে ব্যাক করেছিল। যখন জিয়াউর রহমান এলেন, তখন তাদেরকে ব্যাক করা শুরু করলো ভারত। তবে আমার মনে হয় ১৯৮৯-এ যে কাউন্সিল অ্যাক্ট করা হয়েছিল, দ্যাটস্ এনাফ ফর আইডেন্টিটি অব দ্যা ট্রাইবালস। সেখানে অনেক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল তাদেরকে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা থেকে শুরু করে, চাকমারাই হবে তাদের কাউন্সিলের চেয়ারম্যান। এর বেশি আর চাকমাদের যাওয়া উচিত না। চাকমাদের এ বিদ্রোহ অনন্তকাল থাকবেও না। ইন্ডিয়া উইল বি ভেরি

www.pathagar.com

ডিসগাস্টেড। ইতিমধ্যে তারা আসাম সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে যে, ওদের সাপোর্ট করো না। কিন্তু কতোটা কন্ট্রোল আছে! ওখানে কতোগুলো 'ভেস্টেড ইনপিউটস' আছে। যারা এদের রেশন নেয়, এদের কাছে অস্ত্র বিক্রি করে। তবে আই উড সে দ্যাট দো দ্যা ল' ওয়াজ মেইড বাই হেটেড এরশাদ, দ্যা ১৯৮৯ অ্যাক্ট ইজ এনাফ। শান্তিবাহিনী শুড অ্যাকসেপ্ট ইট। এর বেশি আর ছাড় দেওয়া উচিত না।

প্র ॥ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সেনাবাহিনীসহ সরকারি প্রশাসন তথা আমলাদের হাতেই রেখে দেওয়া হয়েছে। ফলে স্থানীয় সরকার পরিষদের ওই ব্যবস্থা পাহাড়িদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেনি। বরং অবিশ্বাস ও অনাস্থা বেড়েছে।

উ ॥ সেটা প্র্যাকটিসের ব্যাপার। আমার মনে হয়, সরকারকে সে আইন অনুযায়ীই চলা উচিত।

প্র ॥ যে শান্তি আলোচনা বর্তমানে চলছে, এ ব্যাপারে আপনার মতামত?

উ ॥ '৮৯-র বেশি ছাড় দেওয়া আওয়ামী লীগের জন্যে 'ডিজাস্টারাস' হবে। ন্যাশন উইল নট একসেপ্ট ইট। ৮৯'র আইনে স্থানীয় সরকার পরিষদকে ২০টি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এটা অনেকটা ভারতের অঙ্গরাজ্যের ক্ষমতার মতো। দ্যাট শুড বি বেসিস অব সেটেলমেন্ট। আওয়ামী লীগের এর বেশি যাওয়া উচিত না। তা হলে দেশ দ্বি-খণ্ডিত হবে। আওয়ামী লীগকেই জনগণ এ জন্য দায়ী করবে।

ঢাকা-দিল্লী সুসম্পর্কই পার্বত্য শান্তির রক্ষাকবচ

প্র ॥ যেখানে বাঙালি ও পাহাড়ি উভয়ে উভয়কে ভয় পায়। এদের মধ্যে যে সন্দেহ ও অবিশ্বাস, তা কি সহজে দূর করা যাবে?

উ ॥ ব্যাপার হলো যে, এটা ওই শেখ হাসিনার কথাই ঠিক- দু'একটা মরবেই। ইট টেকস্ টাইম। তবে আমার যতোদূর জানা আছে, বিশেষ করে এরশাদ আমলের পর থেকে আর্মিকে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয়েছে, টু টেক ডিফেন্সিভ পজিশন। শান্তিবাহিনীর লোক দেখলে কাভার নিতে হবে। গুলি করা যাবে না। তারাই আগে গুলি শুরু করলে তাহলে গুলি করা যাবে। আর মহিলা শান্তিবাহিনী দেখলে গুলি তো করাই যাবে না, বরং পালাতে হবে। তবে এটার গুড সলিউশন হলো- এ গুড রিলেশন বিটুইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড বাংলাদেশ। দ্যাট ক্যান বি মেইড বাই হাসিনা। ইন্ডিয়াকে তিনি বোঝাতে পারেন যে, ভাই এটা বাদ দাও। ইন্ডিয়া সাহায্য ও সমর্থন বাদ দিলেই, এটা এমনিতেই ঠিক হয়ে যাবে। এখন চীনও ইন্টারেস্টেড হবে না। আর '৮৯-র আইনটা সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা উচিত।

www.pathagar.com

প্র ॥ এটা তো গেলো একটা দিক। ওদের জাতিসত্তা বিকাশের বিষয়টা-

উ ॥ সেটা তো '৮৯-র আইনেই যথেষ্ট নিশ্চয়তা দেওয়া আছে। এ আইন অনুযায়ী সংস্কৃতি, এমনকি আইন শৃঙ্খলাও ওদের হাতে থাকবে। ডিফেন্স থাকবে সরকারের কাছে। সুতরাং এ আইনকে কার্যকর করেই সমাধান সম্ভব এবং তাই করা উচিত। আর পাহাড়িদের অস্ত্রের উৎস বন্ধ করতে হবে। একমাত্র শেখ হাসিনার পক্ষেই এটা সম্ভব। হাসিনা ক্যান রিকোয়েস্ট গুজরাল। তার সঙ্গে সুসম্পর্ক আছে।

প্র ॥ শান্তি আলোচনা চলছে। এতে চুক্তি হলেও বিগত দিনে সেখানে যেসব হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন হয়েছে সেগুলোর কি বিচার হওয়া উচিত?

উ ॥ সব ভুলে যেতে হবে। রিস্টার্ট করতে হবে। ওই সব করতে গেলেই, আবার মারামারি শুরু হবে। লুক ফরোয়ার্ড। সুতরাং আমার মনে হয়, ওই আইনের বেশি যাওয়া ঠিক হবে না। অ্যাজ দ্যা গভর্নমেন্টস্ হ্যাজ নট ইমপ্লিমেন্টেড ইট, আওয়ামী লীগ শুড ইমপ্লিমেন্ট ইট। অ্যান্ড দে শুড রিকোয়েস্ট ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট যে, তোমরা আর ওদেরকে সাহায্য ও সমর্থন দিও না। তা হলেই ওরা এমনি নিঃশেষ হয়ে যাবে।

প্র ॥ পার্বত্য চট্টগ্রামের মতো গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় নীতি নির্ধারণের প্রশ্নে কি সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী বা বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ও মতামত নেয়া জরুরি?

উ ॥ অবশ্যই। কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই সরকার তা নেয় না।

প্র ॥ তা হলে কি এ ধরনের পরামর্শ ও মতামত গ্রহণের জন্য সাংবিধানিকভাবে কোনো ব্যবস্থা থাকা উচিত বলে মনে করেন?

উ ॥ না, এটা কনভেনশনালি ডেভেলপ করতে হবে। যেমন চীনের প্রশ্ন উঠলে ক্লিনটন হার্ভার্ড ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়সহ চীন বিষয়ক বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। এ রকমভাবে আমাদেরও করতে হবে। সাংবিধানিকভাবে কোনো কিছু করার প্রশ্নই ওঠে না। আবার আমার যে অভিজ্ঞতা, তাতে দেখেছি, এদের সঙ্গে আলাপ করতে গেলে বলে, যান যান, পলিটিক্স অনেক বুঝি। লেকচার দরকার নেই। সুতরাং আর যাই না। তারা মনে করে, তারাই সব বোঝে। তাদের কোনো উপদেষ্টা দরকার নেই। তো এটা ঠিক যে, উপদেষ্টা কমিটি বানিয়ে সরকার বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করতে পারে।

প্র ॥ উপদেষ্টা কমিটি কিভাবে হবে? প্রত্যেকটা মন্ত্রণালয়ের কি উপদেষ্টা কমিটি থাকবে?

উ ॥ যেমন অর্থমন্ত্রী শাহ এম এস কিবরিয়া ২০ জনকে নিয়ে একটা উপদেষ্টা পরিষদ করেছেন। তবে অতোটা ফর্মালি করার দরকার নেই। কনভেনশন হিসেবে এটা করা উচিত। আমেরিকায়ও এটাই নিয়ম। উপদেষ্টারা পর্দার আড়ালে থাকেন। তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে নীতি নির্ধারণ করা হয়। তা ঘোষণা করেন রাজনীতিকরা। এতে কমান্ড

www.pathagar.com

অব পলিটিক্স ঠিক থাকে। কিন্তু ফিট করতে হবে তো। দুনিয়া খুব টেকনিক্যাল হয়ে যাচ্ছে। স্কিল দরকার সব জায়গায়। স্লোগান দিয়ে আর কিছু হবে না। স্কিল্ড লোক দরকার। স্কিল্ড ওয়ার্কার দরকার। স্কিল্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটর দরকার। অতো পার্টিজান হলেও চলবে না। আজকে যেমন সরকার মনে করছে, পানি বিশেষজ্ঞ এটিএম আব্বাস অন্য পার্টি করতেন, তার পরামর্শ নেওয়া হবে না। তারা আইনুন নিশাতের পরামর্শ নিচ্ছে। আসলে দেশের স্বার্থে, মোর অ্যান্ড মোর গুড বি কনসাল্টেড। দেয়ার আর আদার এক্সপার্টস। যদি জিয়ার আমলেও উপদেষ্টা থেকে থাকে, তাদেরও অভিজ্ঞতা আছে। পানি সম্পদ মন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক নিজেই তো তার আগের পজিশন অনেকটা বদলে ফেলেছেন। এখন তিনি বলছেন, পানি তো ঠিকমতো পাচ্ছি না। আবার চিরদিন আওয়ামী লীগ গঙ্গা ব্যারাজে'র বিরোধিতা করেছে। কিন্তু সেটা এখন রাজ্জাক বলছেন। মানে তিনি বুঝতে পারছেন, পানি পাওয়া খুব মুশকিল। কারণ ওয়াটার ইজ এ প্রভিন্সিয়াল সাবজেক্ট। উজান থেকে অনেক পানি নিয়ে যায়। ফারাক্কা পয়েন্টে এসে পানিই থাকে না। সুতরাং ফারাক্কা পয়েন্টে পানি ভাগাভাগি চুক্তির অন্যতম দুর্বলতা। পুরো গঙ্গার পানি ভাগাভাগির কথা উঠেছিল প্রথমে। তা হলে নেপালকেও অন্তর্ভুক্ত করা যেতো। ফারাক্কা বাঁধে তো পানি এসে কমেই যায় এমনি। এটাতো পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার কিছু করতে পারবে না।

প্র ॥ ভারত তো পানির প্রবাহ বাড়ানোর কথা বলেছে। সঙ্কোশ থেকে গঙ্গা পয়েন্টে পানি নিয়ে আসবে।

উ ॥ এটা খুব মুশকিল। টাইম ফ্যাক্টর। তাছাড়াও কোটি কোটি টাকার ব্যাপার।

প্র ॥ তারা ইতিমধ্যে প্রকল্প হাতে নিয়েছে।

উ ॥ দ্যাটস্ গুড।

প্র ॥ তবে সঙ্কোশ থেকে পানি আনবে। কিন্তু সঙ্কোশ তো আবার ব্রহ্মপুত্রের প্রধান উৎস।

উ ॥ তা হোক, তাতে অসুবিধা নেই। ব্রহ্মপুত্রে যথেষ্ট পানি আছে, তারা আসামে ডাইভার্ট না করলেই হয়। তাই এখনই ব্রহ্মপুত্র নিয়ে আলোচনা করা উচিত। যাতে আসামে তারা ডাইভার্ট না করে। এ ক্ষেত্রে চীনকেও নেওয়া যেতে পারে।

পানি আলোচনায় চীনকে রাখতে হবে

প্র ॥ চীন বলছে ব্রহ্মপুত্রের ব্যাপারে তাদেরও কিছু করণীয় আছে এবং থাকতে হবে। একজন চীনা বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশ সফরকালে একথা বলেছেন।

উ ॥ চায়না গুড বি ইনক্লুডেড। নদী ও পানি বণ্টনের ব্যাপারে উই গুড গেট টুগেদার ফর দ্য ইন্টারেস্ট অফ দ্যা ম্যানকাইন্ড। ব্রহ্মপুত্র চীনের মধ্য দিয়ে অনেক দূর এসেছে। সো দে আর পার্টি টু ইট। যেমন রাইন নদী বহু দেশ দিয়ে গেছে। ওরা চুক্তি করে নিয়েছে। সবাই পার্টি টু ইট। এমনি যুদ্ধ করেছে, কিন্তু পানি নিয়ে কেউ তেমন কোনো সমস্যা করেনি। সুতরাং পানির বিষয়টি ফয়সালা করতে হবে তাড়াহুড়া না করে। পপুলারিটি অর্জনের জন্য তাড়াতাড়ি করে সাইন দিয়ে আসলাম–এটা চলবে না।

www.pathagar.com

কারণ ব্যুরোক্র্যাটরা বড় শয়তান, ইন অল কান্ট্রিজ। ইন্ডিয়ানরা আরো পাকা ব্যুরোক্র্যাট। ব্যুরোক্র্যাটরা এক লাইন ছাড় দিতে চায় না। পলিটিশিয়ানরা যদিও কিছু ছাড় দিতে চায়, ওরা দিতে দেয় না। তাই নেগোসিয়েশন ধীরে সুস্থে করা উচিত। পাঁচ বছর যথেষ্ট সময়। গঙ্গা চুক্তি এতো তাড়াহুড়া করে করাটা ঠিক হয়নি।

প্র ॥ তার মানে ফারাক্কার পানি বণ্টনে যে চুক্তি হয়েছে, তা তাড়াহুড়া না করে আরো ধীরে সুস্থে চিন্তা করে এবং নেপাল বা ভুটানকে নিয়ে করলে আরো ভালো ও কার্যকর হতো বলে মনে করেন?

উ ॥ হ্যাঁ, ভালো হতো। আমি সেটাই চেয়েছিলাম। ইন্ডিয়ানরা সব সময় চায় দ্বি-পাক্ষিক। তৃতীয় পক্ষ আনতে তারা রাজি নয়। বড় দেশ সবসময় চায় দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি ও আলোচনা।

প্র ॥ আমাদের ৫৪টি অভিন্ন নদ-নদী আছে। এসব নদ-নদীর ব্যাপারে আলোচনা ও চুক্তি কি নেপাল, ভুটান বা চীনকে নিয়ে করা উচিত?

উ ॥ হ্যাঁ, নিয়ে করা উচিত। একটা চুক্তি করে আমরা বুঝতে পারছি যে, সমস্যাটা অতো সহজ না।

প্র ॥ এ সমস্যা উত্তরণে বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও ভুটানকে নিয়ে যে উপ-আঞ্চলিক জোটের কথাবার্তা চলছে তাতে কি সুফল পাওয়া যাবে বলে মনে করেন?

উ ॥ উপ-আঞ্চলিক জোটের কথা ভারত বলে। সেখানে চীনকে বাদ দেয় কেন? পাকিস্তানকে বাদ দেয় কেন? কারণ ইন্ডিয়া তো ডমিনেটিং পাওয়ার। ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে তো কথা বলতেই সাহস পায় না প্রস্তাবিত জোটের কেউ। সুতরাং ভারত তো উপ-অঞ্চল চাইবেই। এতে আমাদের ঠকা। এটা হলে চীন ও পাকিস্তানকে নিয়ে হওয়া উচিত। পাকিস্তানের হাতে আণবিক বোমা না থাকলে ভারত তাদেরকে পানির হিস্যা দিত কিনা সন্দেহ। ওয়াটার ইজ এ ভেরি ভ্যালুয়েবল থিং ফর ইরিগেশন। রাজপুতনা তো এখনো মরুভূমি। সেখানে পানি নেওয়া দরকার। ইন্ডিয়া নিডস্ ওয়াটার। আর বাংলাদেশ মানেই পানি। পানি না হলে বাংলাদেশ ডাজ নট এক্সিস্ট। ফারাক্কার পানি চুক্তিতে শেখ হাসিনা বেশি আশা করেছিলেন। শি ওয়াজ টু অপটিমিস্টিক অ্যান্ড টু আনরিয়ালিস্টিক। কারণ ইন্ডিয়া ইচ্ছা করলেই পানি দিতে পারে না। তার কেন্দ্রীয় সরকারও দুর্বল।

প্র ॥ উপআঞ্চলিক জোট কি সার্ককে ক্ষতিগ্রস্ত করবে?

উ ॥ সার্ককেই বড় করে চীনকে আনা হোক না কেন। আমরা একটা বড় এশিয়ান জোট করি না কেন?

প্র ॥ কিন্তু এশিয়াতে আবার অনেক আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক জোট আছে।

উ ॥ তবু উই মাস্ট ইনভলভ চায়না। উই কান্ট ইগনোর চায়না। চায়না ইজ এ বিগ পাওয়ার।

প্র ॥ দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের শত কোটি মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে সার্ক করা হয়েছে ১২ বছর হলো। কিন্তু এর সাফল্য–

www.pathagar.com

উ ॥ সার্ক হ্যাজ নট বিন ইউজড। সার্ক সনদে বলাই আছে, দ্বি-পাক্ষিক কোনো সমস্যা এখানে আলোচনা হবে না। সার্কে পানি চুক্তির আলোচনা হয় না। জিয়া একটা বল ছুড়ে দিয়েছিলেন। স্টার্টার হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি দেখেছেন, এরা পরস্পর কথাই বলে না, অন্তত কথা বলা তো শুরু হোক। আলটিমেটলি, সার্ক চীনসহ করা উচিত। কারণ আমরা ডেভেলপিং ওয়ার্ল্ড। একই ধরনের সমস্যা ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, চীনের। এখন তো কমিউনিজমও নরম হয়ে গেছে। চীনও এখন যুদ্ধ-সংঘাত অতো বেশি চায় না। সব দেশেরই কমন ইন্টারেস্ট হলো, উন্নত হওয়া। কারণ সবাই বুঝতে পারছে, ইকোনমিক ও টেকনোলজিক্যালি উন্নত হলে, সামরিক ক্ষমতা এমনিই এসে যায়।

প্র ॥ সার্ক এখনো সরকারের সঙ্গে সরকারের সম্পর্কে সীমিত। জনগণের সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক উন্নয়ন ও কার্যকর যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা জরুরি। তা হলে সার্ক আরো কার্যকর হবে। আপনার কি মতামত?

উ ॥ এ ব্যাপারেও কথা আছে। জনগণও অনেক সময় বেয়াদবের মতো কথা বলে, ভারতের একজন শিল্পী এখানে এসে না কি বাঙালিদের বাস্টার্ড বলেছে। একটু সংযত হতে হবে তো।

প্র ॥ এটা তো একটা ব্যতিক্রম হিসেবে ধরা যায়।

ভারত বাংলাদেশকে দেখে
পাকিস্তানের দৃষ্টিতেই

উ ॥ না, এতে আমি খুবই দুঃখ পেয়েছি। তারা যে কতো পার্শিয়াল! হেমন্ত মুখোপাধ্যায় আসলেন। আবু হেনা টিভিতে তার সাক্ষাৎকার নিলেন। জিজ্ঞেস করলেন বাংলাদেশের কোন শিল্পীর গান তার ভালো লাগে। তিনি বললেন, বাংলাদেশী কোনো শিল্পীর গান আমার ভালো লাগে না। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি সাবিনা, রুনা এদের নাম শুনেছেন? এদের কারো গান শুনেছেন? হেমন্ত বললেন, না। আসার আগেও তো দু'একটা গান শুনে আসা উচিত ছিল। আই ওয়াজ সো এস্টোনিসড! আমি হেমন্ত'র একজন ভক্ত। আমার মাথা একেবারে নিচু হয়ে গেলো যে, হি ওয়াজ নট এ গ্রেট ম্যান। আমার এতো রাগ হয়েছিল, একদিন বক্তৃতা করতে চেয়েছিলাম যে, আমাদের যথেষ্ট শিল্পী আছে। বাইরের কোনো শিল্পী আনা যাবে না। আমরা ছোটো একটা দেশ, এ মনোভাব নিয়ে তারা আমাদের দিকে তাকায়। ঠিক পাকিস্তান যেভাবে আমাদের দিকে তাকাতো।

প্র ॥ যদি মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগটা বাড়ে, যেমন যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, রেল পথ, সড়ক পথ।

উ ॥ না, এর সঙ্গে স্ট্র্যাটেজির সম্পর্ক আছে। ইটস এ ভেরি গুড পয়েন্ট। এগুলোর সঙ্গে যোগাযোগের অন্য ব্যাপার। আপনি যে করিডর চাচ্ছেন-

www.pathagar.com

প্র ॥ না, করিডরের কথা নয়। যেমন এখন বিমান যোগাযোগ আছে। তা হলে সরাসরি সড়ক ও রেল যোগাযোগে বাধা কোথায়?

উ ॥ এর মধ্যে পয়েন্ট আছে। সড়ক যোগাযোগটা হলেই, এর মধ্যে স্ট্র্যাটেজির প্রশ্ন আসে। সৈন্য পাঠানোর প্রশ্ন আসে। বাণিজ্যের প্রশ্ন আসে। ধরুন এখানে সড়ক থাকলো, আর চীনের সঙ্গে যুদ্ধ লেগে গেলো। সেভেন সিস্টারসে সৈন্য পাঠাতে হবে। সড়ক দিয়ে নেবে। আমরা ছোট দেশ। এখানে আমাদের সিকিউরিটির প্রশ্ন দেখা দেবে। এটা ভেবে দেখতে হবে, যেটা শেখ হাসিনা দেখছেন না। ভারতের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক অবশ্যই চাই। কিন্তু সিকিউরিটি পয়েন্ট অব ভিউ থেকে দেখতে হবে তো। যেমন যখন পাকিস্তান গঠনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হ'া, নেহরু, প্যাটেল, গান্ধী তো তখন দূরে চলে গেছেন, আর মাউন্ট ব্যাটেন, জিন্নাহ আলোচনা করছেন। জিন্নাহ খুব চালাক ছিলেন। তিনি দেখলেন সব গেলো, কলকাতাও গেলো। তিনি আস্তে বললেন, আমার শেষ দাবি হলো, আমি পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তান যেতে করিডর চাই। তখন নেহরু, প্যাটেল -এঁরা লাফ দিয়ে উঠে বলেছিলেন, তা হলে পাকিস্তানই মানি না। সুতরাং করিডর, ট্রানজিট এগুলো সিকিউরিটির প্রশ্ন। এটা দেখতেই হবে। বড় রাষ্ট্র, ঐতিহাসিকভাবে সব সময়ই ছোট রাষ্ট্রের ওপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করে। যখন শক্তিতে সমান হয়, তখনই সমঝোতা হয়। ভারত সুযোগ পেলে ছাড়বে না। অ্যান্ড গুজরাল ইজ এ গুড স্ট্র্যাটেজিস্ট। আই নো হিম। এখানে BIISS-অর্থাৎ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ-এ তিনি প্রায়ই আসতেন। আসতেন ভবানী সেনগুপ্ত, যিনি তাঁর এক নম্বর উপদেষ্টা ও বন্ধু। মি. সেনগুপ্ত অবশ্য হাসিনারও বন্ধু, আওয়ামী লীগেরও বন্ধু এবং তিনি আমারও বন্ধু। দে বিলং টু দ্যা থিংকিং গ্রুপ অব ইন্ডিয়া। ভারতকে কিভাবে মহান বানানো যায়, সুপার পাওয়ার বানানো যায়, এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও আলোচনা করে এ গ্রুপটা। ওই গ্রুপের মনোভাব আমি জানি। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে তারা তাদের প্রয়োজনেও সাহায্য করেছে। ২৫ মার্চ ক্র্যাক ডাউনের পরদিনই, গুজরাল কিন্তু বলেছিলেন, 'সেনচুরিস অপরচুনিটি টু ব্রেক আপ অফ পাকিস্তান'।

প্র ॥ কিন্তু ট্রানজিট বা করিডোর ছাড়াও তো সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করা যায়।

www.pathagar.com

উ ॥ কিন্তু সেক্ষেত্রেও, ভারতীয় যেসব বাস, ট্রাক ঢুকবে তা চেক করতে হবেতো। আমরা পারবো না। উই শ্যাল লুজ আওয়ার কন্ট্রোল। নিয়ন্ত্রণের শক্তিই তো আমাদের নেই। আগে সে শক্তি হোক। এতো তাড়া কিসের। তবে শেখ হাসিনা ছাড়া অন্য কোনো সরকারকে তারা কোনো কনসেশন দেবে না। আই নো দেম। সো শেখ হাসিনা হ্যাজ দ্যা অপরচুনিটি। আর জাতীয় ঐকমত্য যদি করতে হয়, তাহলে প্রধান প্রধান জাতীয় ইস্যুতে হাসিনা এবং খালেদার ঐকমত্যে আসা উচিত। যেমন গঙ্গা চুক্তি স্বাক্ষরের আগে বিরোধী দলকে বলা উচিত ছিল, যে এটা এভাবে করতে যাচ্ছি।

দেশে সামরিক শাসন আসবে না

প্র ॥ এই শলা-পরামর্শের যে অভাব তা তো আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির অংশ। রাজনৈতিক সংস্কৃতির অবনতির জন্যেই এমন হচ্ছে। এর অবনতির কারণ কি?

উ ॥ অবনতি হচ্ছে বলবো না। আমার তো মনে হয় উন্নতিই হচ্ছে। এখন তো আর মার্শাল ল হবে না। আর্মি আসতে তো এখন সাহস পাবে না। এটা একটা পলিটিক্যাল ডেভেলপমেন্ট। আর এ রাজনীতিকরা, যতো বেশিই গালাগালি করুক, আলটিমেটলি তো এরা সিভিল ওয়ারে যায়নি। যে অবস্থা তৈরি হয়েছিল, তাতে তো সিভিল ওয়ারের ব্যবস্থা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তো, দু'দলই সংযমের পরিচয় দিয়েছে। আর যদি মারামারি খুনোখুনির কথা বলেন, দ্যাটস দ্য সেম ইন ইন্ডিয়া, ল' অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশন ইজ দ্য সেম ইন বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া অ্যান্ড পাকিস্তান। কালচার প্রশ্নে কিছুটা বিশৃঙ্খলা মডার্নাইজেশনের সঙ্গে হবেই। কারণ সব লোকের চাকরি দেওয়া যাবে না। কিন্তু সব লোকের আকাঙ্ক্ষা বেড়ে যাবে। ওরা মনে করবে, ধুত্তরি, আর কতো; ভেঙে ফেলাই।

প্র ॥ যেমন ফতোয়াবাজদের সঙ্গে এনজিও'র লড়াই, এটাওতো মডার্নাইজেশনের সঙ্গে রক্ষণশীলতার দ্বন্দ্বের ফল।

উ ॥ হ্যাঁ পুরনো পন্থীরা চাইবে না পরিবর্তন করতে। মডার্নরা বলবে, বৈজ্ঞানিক পরিবর্তন। এটা হবেই। ঐতিহাসিক সত্য। এটা ইংল্যান্ড, ইউরোপে অনেক হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর নৃশংস হত্যাকাণ্ডে জাতির
বিবেক অপরাধবোধে পীড়িত

প্র ॥ তা হলে দেখা যায় মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা আমাদের আধুনিকায়নের একটা প্রধান বাধা।

উ ॥ আমার মনে হয়, মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা বাংলাদেশে কিছু বুদ্ধিজীবীর মাথায় আছে। সমাজে এসব কিছু নেই। জনগণ এসব নিয়ে কিছু চিন্তা করে না। বাংলাদেশের মানুষ অসাম্প্রদায়িক। আমি বলি, এটা 'সেক্যুলার ইসলাম।'

www.pathagar.com

প্র ॥ আমাদের রাজনীতি, এখনো খুবই অতীত আশ্রয়ী।

উ ॥ এটা এখন ভুলে যেতে হবে। ইট শ্যুড বি ফিউচার ওরিয়েন্টেড। অতীতকে ভুলে যেতে হবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যেভাবে মারা গেছেন, এভাবে মৃত্যুও আর কোনো দিন হবে না। ন্যাশন হ্যাজ লার্নড এ লেসন। এ রকম নৃশংস হত্যাকাণ্ড আর হবে না। এটা অভিজ্ঞতার মধ্যে এসে গেছে যে, এটা ভালো না। এতে জাতির বিবেক অপরাধবোধে পীড়িত। সুতরাং এসবের মধ্যে আর না যাওয়াই উচিত। একটা জিনিস খুবই প্রশংসনীয়। সেটা হলো, জিয়াকে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলায় আসামি না করে শেখ হাসিনা গ্রেট স্টেটসম্যান-এর পরিচয় দিয়েছেন। আগে হাসিনা যেভাবে জিয়াবিরোধী বক্তৃতা দিতেন, তাতে আশঙ্কা করছিলাম, জিয়াকে আসামি করবেন এবং একটা গোলমাল লাগবে। এটা হাসিনার মহানুভবতার লক্ষণ। ইচ্ছে করলে জিয়াকে দায়ী করা যেতো। অ্যাকচুয়ালি, রেসপনসিবিলিটি গোজ টু সফিউল্লাহ, জিয়া, খালেদ মোশাররফ অ্যান্ড মেনি আদারস। ওপরের তিনজনকে তো বাদ দেওয়া যায় না। তাদের সব জানারই কথা। তারা আগে থেকে ব্যবস্থা নেননি কেন? এসব থেকে দেখা যাচ্ছে রাজনৈতিক সংস্কৃতির উন্নতি হচ্ছে।

প্র ॥ আপনি বলছেন রাজনৈতিক সংস্কৃতির উন্নতি হচ্ছে। অন্যদিকে ট্রানজিট বা সড়ক-রেল যোগাযোগ নিয়ে যে সব কথাবার্তা হচ্ছে -

উ ॥ আমার বক্তব্য হবে, ইফ হাসিনা ওয়ান্টস ইট দেন শি শুড কল ফর ফ্রেশ ইলেকশন। এরকমই হয়। বিরাট জাতীয় ইস্যু, যা জাতিকে বিভক্ত করতে পারে সে সব ইস্যুতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে জাতীয় নির্বাচন দিয়ে সে বিষয়ে ম্যান্ডেট নিতে হয়। শেখ হাসিনা ট্রানজিটের ম্যান্ডেট নিয়ে আসেননি।

প্র ॥ সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, ট্রানজিট বিদ্যুৎ, ইস্যুতে ভারতের সঙ্গে বিএনপি'র সময়েই অগ্রগতি হয়েছিল।

উ ॥ হ্যাঁ। এ দু'টোর ব্যাপারে আমি জানি। এখন আছে রিভার ট্রানজিট। এটা জিয়া করে গেছেন। কিন্তু জিয়ার উদ্দেশ্য ছিল অন্যরকম এতে পদ্মায় কিছু পানি আসবে। তাই রিভার ট্রানজিট দিলে কিছু ভালো ফল হবে।

প্র ॥ রিভার ট্রানজিট যদি বিপজ্জনক না হয় তাহলে রোড ট্রানজিটে সমস্যা কোথায়?

উ ॥ রোড ট্রানজিট অনেক বড় ব্যাপার। আর যমুনায়, আমরাই তো নৌকা চালাতে পারি না। রিভার ট্রানজিট তাই কোনোদিন হয়নি। ওটা থিওরিতেই আছে। নো ইফেক্ট।

প্র ॥ আপনি বলছিলেন, বিদ্যুতের ব্যাপারে -

www.pathagar.com

উ ॥ বিদ্যুৎ আমদানি নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। বিএনপি বিদ্যুৎ আমদানির বিষয়টি কনফার্ম করে গেছে কি না জানি না। কিন্তু আমরা বিদ্যুৎ আমদানি করতে যাবো কেনো। জাপান বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য অ্যাটমিক রি-অ্যাক্টর স্থাপন করেছে। একটা ভূমিকম্পের দেশ। তবুও তারা ৫০টি রি-অ্যাক্টর স্থাপন করেছে। রূপপুরে আমরা পারমাণবিক বিদ্যুৎ তৈরি করতে পারি। প্রধানমন্ত্রীর স্বামীই তো পরমাণু বিজ্ঞানী। আমাদের প্রকৌশলী আছে। আমরা এখন একটু কষ্ট করি। তারপর আমরা নিজেরাই, বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করে নিতে পারি।

হাসিনা জিয়াকে ক্ষমা করেছেন

প্র ॥ ট্রানজিটের প্রশ্নে বলা হচ্ছে যে, এ ব্যাপারে বিএনপি সরকারই ভারতের সঙ্গে চুক্তি করে গেছে।

উ ॥ আই ডোন্ট নো। আই ডোন্ট থিংক সো। কারণ জিয়া স্ট্র্যাটেজিস্ট ছিলেন তো! তিনি সামরিক দিকটা বেশি বুঝতেন। ট্রানজিটের সঙ্গে স্ট্র্যাটেজিক প্রশ্ন জড়িত। আজ ইউরোপ বড় হয়ে গেছে। কেউ আর কাউকে আক্রমণ করবে না। ইউরোপের সঙ্গে তুলনা হয় না। ইউরোপে এখন যুদ্ধ অপ্রাসঙ্গিক। যুদ্ধ করলেই ক্ষতি। অসম দেশের মধ্যে এসব ট্রানজিট হতে পারে না। এটা অত্যন্ত বিপজ্জনক। এতে সার্বভৌমত্ব ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। আমি শেখ হাসিনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করতে পারি না। বঙ্গবন্ধুর মেয়ে তো! বঙ্গবন্ধু কিন্তু ভীষণ ইনডিপেনডেন্ট ছিলেন। বঙ্গবন্ধু ওয়াজ কমিটেড টু বাংলাদেশ। জিয়া, খালেদা জিয়া ওয়াজ কমিটেড টু বাংলাদেশ। আই থিংক, হাসিনা ইজ অলসো কমিটেড টু বাংলাদেশ। আই হ্যাভ ডাউট অ্যাবাউট এরশাদ। আই থিংক, একসেপ্ট এরশাদ, অল অফ দেম আর গ্রেট লিডার। আমাদের উন্নয়নে, ঐতিহাসিক কারণে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ড একটা বিরাট বাধার সৃষ্টি করেছে। এটা তো সাইকোলজিক্যাল ব্যাপার। ইট উইল অ্যাফেক্ট হাসিনা অল হার লাইফ। সুতরাং এগুলো কিছু সাইকোলোজিক্যাল বেরিয়ার তৈরি হচ্ছে। বাট উইথ দ্য টাইম, এগুলো চলে যাচ্ছে। যেমন বললাম, জিয়াকে ক্ষমা করে দিয়েছেন হাসিনা। ভার্চুয়ালি, জিয়াকে ক্ষমাই করে দেওয়া হয়েছে 'বাই নট ইনভলভিং হিম ইন দ্যা ট্রায়াল হাসিনা হ্যাজ অ্যাডজাস্ট দ্যাট হি ওয়াজ নট ইনভলভড।' এভাবে আরো অনেকে আইনত দায়ী। সুতরাং যেগুলোতে বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারকে মেরেছে, শুধু সেগুলোকে ধরেছেন, এতে শেখ হাসিনা বেশ সংযমের পরিচয় দিয়েছেন।

www.pathagar.com

ভারত বড় ভাই তাকে মহত্ত্বের পরিচয় দিতে হবে

প্র ॥ আপনার কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা, পানি সমস্যাসহ বিভিন্ন আঞ্চলিক ও দ্বি-পাক্ষিক সমস্যা সমাধানে নেগোসিয়েশনই একমাত্র পথ। এক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের বিষয়টিও জরুরি। তা ছাড়া বর্তমান বহুকেন্দ্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার বাস্তবতায় আমাদেরকে আঞ্চলিক সহযোগিতার ওপর জোর দিতেই হবে। এক্ষেত্রে কিভাবে এগুনো দরকার?

উ ॥ নিঃশর্তভাবে। যেমন আমরা ওয়াটার রিসোর্স রিসেটেলমেন্ট করতে চাই উইদাউট এনি গিভ অ্যান্ড টেক। কিন্তু ভারত বলে, পানি দেবো এর বিনিময়ে খানিক দাও। আমরা সবাই মিলে, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র অববাহিকাকে বিশ্বের স্বার্থে, মানবতার স্বার্থে, জনগণের স্বার্থে গড়ে তুলবো। কিন্তু ব্রহ্মপুত্রের পানি আনতে না দিলে, আরেকটা ঠেকাবো, এটা তো আর হয় না। ইন্ডিয়া শুড হ্যাভ দ্যাট মাচ গ্রেটনেস। বড় রাষ্ট্র হতে হলে মনটা বৃহৎ করতে হয়। ইন্ডিয়া ক্যান মেক কনসেশন, উই ক্যান্ট। আমরা কনসেশন দিলে মরুভূমি হয়ে যাই। কিন্তু ভারত তো তা হবে না। সো ইন্ডিয়া হ্যাভ এ গ্রেটার রোল টু প্লে। কিন্তু তারা গিভ অ্যান্ড টেক চায়। এতে তো সমস্যার সমাধান হয় না।

প্র ॥ বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে, দু'দেশের এলিটদের ব্যক্তিগত সম্পর্ককে কাজে লাগানো যায় না?

উ ॥ এক্ষেত্রে ভারতীয় এলিটরা খুব বেশি মাত্রায় জাতীয়তাবাদী। তাদের একটা বোধ হয় হীনম্মন্যতা আছে। তারা সুপার পাওয়ার হতে চায়। তারা এ লক্ষ্যে, নিজেদের স্বার্থে যা করা দরকার, তাই করে। ভারতীয় ইন্টেলেকচুয়ালদের এ জেনারেশন চলে গেলে হয়তো আমাদের সঙ্গে সমঝোতা হবে।

প্র ॥ উন্নয়নের প্রশ্নে এখন আমাদের কি করা দরকার?

উ ॥ উন্নয়নের প্রশ্নে, আমাদের রাজনীতিকদের দু'পক্ষই প্রায় একমত। এখন কার্যকর করাটাই বড় কথা। ব্যুরোক্র্যাসি ও পরিকল্পনা কমিশনের সংস্কার দরকার। শিক্ষার প্রসার জরুরি। এখন আওয়ামী লীগ যাতে এসব বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে পারে, তার জন্য ব্যবস্থা করতে হবে। অনেক কাজ আছে, যেগুলো করতে গেলে জনসমর্থন হারাতে হয়। কিন্তু সেসব ব্যবস্থাও নিতে হবে। আর ভেদাভেদের দিকে যেন রাজনীতিকরা না যান, সেটা দেখতে হবে। বিরোধী দলের প্রতিও আমার আবেদন

www.pathagar.com

থাকবে, তারা যেন সে উদারতার পরিচয় দেন। যেন আর বিভেদের পথে দেশকে ঠেলে না দেন। একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায়, দেশকে এগিয়ে নিতে হবে। তারা যেন এ লক্ষ্যে যার যার অবস্থান থেকে কাজ করেন। এ মুহূর্তে সরকার ও বিরোধী দলের কাছে এটাই একজন নাগরিক হিসেবে আমার একান্ত আবেদন।

দৈনিক আজকের কাগজ, সাক্ষাৎকার, ২৯ জুলাই, ১৯৯৭

www.pathagar.com

৭ আওয়ামী লীগের মাথায় এখনো বাকশালী চিন্তা

প্রশ্ন ॥ আওয়ামী লীগ সরকার তাদের দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করেছে। গত এক বছরের আওয়ামী সরকারের রাষ্ট্র পরিচালনাকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করছেন।

উত্তর ॥ গত এক বছরের আওয়ামী শাসনকে আমি 'A Year of Learning' বলেই উল্লেখ করতে চাই। গত এক বছরে আওয়ামী লীগ সরকার কিছু তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ সরকারের প্রশাসনিক কোনো অভিজ্ঞতা নেই। সরকার এখনো শিখছে। শিক্ষানবিসের অধ্যায় এখনো পেরোতে পারেনি তারা। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তারা শিখছে রাষ্ট্র পরিচালনা। সেহেতু সরকারের কিছু কিছু ভুল-ত্রুটি হয়েছে। বাকশালিত্বের 'মাইন্ড সেট' তাদের মধ্যে এখনো রয়ে গেছে। তার বিশ্লেষণে, ক্ষমতাহীন আওয়ামী লীগ ও ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। সরকারে থেকেও তারা বিরোধীদের মতো আচরণ করছে। প্রধানমন্ত্রী যখন বক্তব্য দেন তখন মনে হয় তিনি যেন বিরোধী দলে রয়েছেন।

ন্যাশনালিস্ট দল সবদেশেই ফ্যাসিস্ট

আওয়ামী লীগ স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দল এবং একটি ন্যাশনালিস্ট দল। আর ন্যাশনালিস্ট পার্টি সব দেশেই একটু ফ্যাসিস্ট মনোভাবের হয়। সারা দুনিয়ায় ন্যাশনালিস্ট পার্টির মধ্যে এই মনোভাব একটা অভিন্ন প্রপঞ্চ। আমরা দেশ স্বাধীন করেছি। এই দেশটা আমাদের। আমরাই সব। এই ভাব ও আত্মগরিমা বর্তমান সরকারের মধ্যে রয়ে গেছে। সরকারের রাষ্ট্র পরিচালনার যে ধারা, তাতে দেখা গেছে, গুরুত্বপূর্ণ সব পদে আওয়ামী লীগ মনোভাবাপন্ন লোকদের বসানো হচ্ছে। বিগত সরকারও যে এই ভুলটা করেনি তা নয়। একই পথে পা দিয়েছে হাসিনা সরকার। ক্ষমতাসীনরা ভাবে, নিজেদের লোক বসালেই বুঝি কাজ হয়ে যায়। কিন্তু আসলে ধারণাটা ভুল। সঠিক পদে সঠিক লোক, উপযুক্ত ও যোগ্য লোককে স্থান দিতে হবে। যদু মধু কাউকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি করে দেওয়া যায় না। খালেদা জিয়া সরকারের আমলে এটা দেখা যায়। শুধু জিয়া পরিষদের চেয়ারম্যান হবার সুবাদে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হবার সুযোগ পেয়ে বসেন জুনিয়র এক প্রফেসর।

www.pathagar.com

ভারতের সঙ্গে পানি চুক্তি অবশ্যই একটি সাফল্য

বর্তমান সরকারের তড়িঘড়ি সিদ্ধান্তের জ্বলজ্যান্ত উদাহরণ হলো পানি চুক্তি। এই চুক্তি করতে এতো হুড়োহুড়ির প্রয়োজন ছিল না। আন্তর্জাতিক কোনো চুক্তি করতে হলে, সমঝোতার জন্য, আলোচনার জন্য সময় প্রয়োজন। ভারতের সঙ্গে পানি চুক্তিটা অবশ্যই একটা সাফল্য। তবে তড়িঘড়ি করে চুক্তি করায় বাংলাদেশ এখন বেকায়দায়।

প্র ॥ ভারতের সঙ্গে ট্রানজিট বা করিডরের প্রসঙ্গে বর্তমান সরকারের মনোভাবকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করছেন।

উ ॥ এই বিষয়ে আমার বক্তব্য পরিষ্কার, ভারতকে করিডর দেবার ম্যান্ডেট জনগণ আওয়ামী লীগ সরকারকে দেয়নি। এই করিডর বা ট্রানজিট দেওয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব, অস্তিত্ব ও নিরাপত্তা সম্পর্কযুক্ত। তাই এই বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হলে, অবশ্যই গণভোটের অথবা মধ্যবর্তী নির্বাচনের প্রয়োজন। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, ভারতকে ট্রানজিট আমাদের দেশের সার্বভৌমত্বকে ক্ষুণ্ন করবে। ভারত আমাদের যতই বন্ধু রাষ্ট্র হোক আমাদের প্রথমে দেখতে হবে জাতীয় স্বার্থকে। করিডর দেওয়া সোজা কথা নয়, সামরিক ও নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে এটা খুব স্পর্শকাতর ইস্যু। আমি আদৌ এই করিডর দেওয়ার পক্ষে নই। যদি একজন লোকও এর বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তবে সেই একজন হবো আমি। আমি সত্যি অবাক হয়েছি, সম্প্রতি টেলিভিশনে 'দেশবাসীর মুখোমুখি' অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে কেউ এই ট্রানজিট প্রসঙ্গে কোনো প্রশ্ন করেননি।

প্র ॥ একুশ বছর পর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসেছে। গত এক বছরে হাসিনা সরকার জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে কতখানি সফল হয়েছে বলে আপনি মনে করেন।

উ ॥ অনুন্নত দেশগুলোতে বহুবিধ ও ব্যাপক সমস্যা রয়েছে। এগুলোর সমাধান করা সহজ কোনো কাজ নয়। এক অর্থে বলা যায়, প্রায় প্রতিটি সরকারই ব্যর্থ। প্রতিটি সরকারই আংশিক সফল। আংশিক ব্যর্থ। টোটাল সাকসেস, আমরা কোনো সরকারের কাছ থেকে পাইনি। রাজনৈতিকভাবেও, আওয়ামী লীগ যে সফল হয়েছে গত এক বছরে, তা বলা যাবে না। কেননা তারা বিরোধী দলের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করছে না। এটা সরকারের একটা মাইনাস পয়েন্ট। শিল্পখাতে সরকার ব্যর্থ হয়েছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। গত বছর রাজনৈতিক অস্থিরতা ছিল না। লাগাতার হরতাল, ধর্মঘট হয়নি। তবুও প্রবৃদ্ধির হার কমলো কেন। এই হার কেন ৭ শতাংশ থেকে ৩ শতাংশে নেমে গেল।

প্র ॥ এর কারণ কি?

উ ॥ আমার মনে হয় এটা কিছুটা হ্যাংওভার ও ইমেজগত সমস্যার জন্য হয়েছে। নীতি এবং তা বাস্তবায়নের সমস্যাও রয়েছে। সিভিল সার্ভিসের কর্মদক্ষতা কমে গেছে। এখানকার আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করে।

www.pathagar.com

প্র ॥ আমরা কি বলতে পারি, সরকারের সমস্ত ব্যর্থতার দায়ভাগের বেশিরভাগ বর্তায় ল্যাথারজিক আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার ওপর।

বিএনপির ধমকাধমকি আর আওয়ামীলীগের তোষণনীতি

উ ॥ রাজনীতিবিদদের কর্তব্য হলো, এই আমলাদের সক্রিয় করা। বিএনপি সরকার আমলাদের ধমকাধমকি করে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইতো। আর আওয়ামী লীগ এক্ষেত্রে বেছে নিয়েছে ভিন্ন পথ। তারা তোষণ নীতির পথ ধরেছে। আমলাদের বেশি কিছু বলা যাবে না। এখানে এখন নীতি বাস্তবায়নে চলছে চরম দুর্ভিক্ষ।

প্র ॥ গত বছরের অর্থনৈতিক অবস্থার চালচিত্রকে কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে আপনি মূল্যায়ন করেন।

উ ॥ প্রথম কথা হলো, অর্থমন্ত্রী ইফেকটিভ নন। আর্থিক খাতে অব্যবস্থাপনা হয়েছে। শেয়ার বাজার নিয়ে মাতামাতি কম হয়নি। পথে বসেছে হাজারো লোক। মানুষকে লোভ দেখিয়ে, শেয়ার বাজারে কৃত্রিম এক পরিবেশ তৈরি করা হয়েছিল। শেয়ার বাজার নিয়ে যে নাটক রচিত হয়েছিল, তা ছিল অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যর্থতা। বিশ্বের অন্য কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে সেখানকার অর্থমন্ত্রী পদত্যাগ করতেন।

প্র ॥ গত এক বছরে শেখ হাসিনা সরকারের অর্থমন্ত্রী সবচেয়ে বেশি সমালোচিত ও আলোচিত হয়েছেন।

উ ॥ দেশের সম্পদ বাড়ুক, অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হোক, এটা আমরা সবাই চাই। আর যদি অর্থনৈতিক উন্নতি না হয়, তবে অর্থ মন্ত্রণালয় তো সমালোচিত হবেই। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের দায়িত্বটা অর্থ মন্ত্রণালয়ের ওপর বর্তাবে। আর সেজন্যে অর্থমন্ত্রী হিসেবে আওয়ামী লীগ একজন বিশেষজ্ঞকে বেছে নিয়েছিল। তবে এখন দেখা যাচ্ছে বিশেষজ্ঞ না হলেও চলবে। মূল কথা হলো, নীতি বাস্তবায়ন। অর্থমন্ত্রী ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট- সেটা তিনি নিজেই বলতে পছন্দ করেন। তবে বিষয়টা হলো, তিনি অনেক আগেকার ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। তারপর অর্থনীতির ধারা অনেক পরিবর্তিত হয়েছে।

আওয়ামী লীগের নিষ্ঠাবান নেতা কর্মীরা বঞ্চিত

আওয়ামী লীগের আরেকটি সমস্যা হলো, তারা মন্ত্রিসভায় অনেক বেশি অরাজনৈতিক ব্যক্তিকে স্থান দিয়েছে। আওয়ামী লীগের নিষ্ঠাবান নেতা-কর্মী, যারা জীবনভর দেশের জন্য কাজ করেছেন, খেটেছেন, অথচ আজ ফল ভোগ করছে সুবিধাবাদীরা। এটা ঠিক নয়। এ কারণেই আমাদের রাজনৈতিক প্রশিক্ষণটা নষ্ট হচ্ছে।

www.pathagar.com

নেতাদের দেশ চালাতে শিখতে হবে। দেশ চালাতে যদি টেকনোক্রেটদের ডাকতে হলো, তবে তো এই প্রশ্ন উঠবে- তুমি তাহলে কি শিখলে।

প্র ॥ ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও ক্ষমতাহীন আওয়ামী লীগের মধ্যে কি পার্থক্য আপনার চোখে পড়ে।

উ ॥ তেমন কোনো পার্থক্য নেই। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এখনো বক্তব্য দিলে, যেন মনে হয়, বিরোধী দলের নেত্রী বক্তব্য দিচ্ছেন। সরকার পরিচালনায় আওয়ামী লীগকে আরো অনেক কিছু শিখতে হবে। অন্যের ওপর দোষ চাপানোর মনোভাব হাসিনা সরকারের মধ্যেও রয়েছে। সর্বত্র ষড়যন্ত্রের গন্ধ খোঁজা কোনো সমস্যার সমাধান করে না। আওয়ামী লীগের মধ্যে এই এটিচ্যুড এখনো আছে, 'যত দোষ নন্দ ঘোষ'। ক্ষমতায় থাকাকালে, বিএনপিরও একই মনোভাব ছিল। এটা ধীরে ধীরে কাটবে। সুতরাং ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতাহীন আওয়ামী লীগের মধ্যে, তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসেনি।

প্র ॥ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতা গ্রহণের পর, দেশে বিদেশী বিনিয়োগ বাড়বে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। শুরুতে উৎসাহ পাওয়া গেলেও, আশানুরূপ বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি আমরা পাইনি। এর কারণ কি?

উ ॥ বিএনপি সরকারের শেষ দু'বছরে, বিরোধী দলের লাগাতার আন্দোলন, বিক্ষোভ-ভাঙচুর এর কারণ। আমরা এই অস্থিতিশীলতার কথা ভুলে গেলেও, বিদেশীদের কাছে এই হ্যাংওভারটা কাটেনি। আর অনেক দেশ তো মনে করে, হাসিনা সরকার দু'বছরও টিকবে না। এমনকি আওয়ামী লীগের ঘনিষ্ঠ মিত্র ভারতও এই আশঙ্কামুক্ত নয়। তাই পানি চুক্তিটা প্রথমে তারা দু'বছর মেয়াদের জন্যে প্রস্তাব করেছিল। দুই বছরের সেই বিক্ষুব্ধ আন্দোলনের হ্যাংওভারটা কাটতে সময় লাগবে। দু'বছর ধরে দেশ অচল থেকেছে। তারপর আপনি মানুষকে বোঝাচ্ছেন, দেশ আবার সচল হয়ে গেছে। সবাই তো আর বোকা নয়, একটু বুঝে শুনে ঝুঁকি কমিয়ে সবাই বিনিয়োগ করতে চায়। আর তাছাড়া বিনিয়োগের জন্য, এশিয়ায় আরো বহু সম্ভাবনাময় দেশ রয়েছে। যেখানে অন্তত রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা নেই। বাংলাদেশে বিনিয়োগের জন্যে বিনিয়োগকারী দেশগুলো এখনো আস্থা অর্জন করতে পারেনি।

সংসদ অচল না করতে
খালেদা জিয়ার সিদ্ধান্ত সঠিক

প্র ॥ গত এক বছর জাতীয় সংসদের কার্যক্রম দেখে কি আপনার মনে হয়, বর্তমান সংসদ জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে পারবে।

উ ॥ বিরোধীদলীয় নেত্রী খালেদা জিয়ার একটা কথা আমার বেশ পছন্দ হয়েছে। তিনি বলেছেন, বিরোধী দল হিসেবে সংসদে এবং সংসদের বাইরেও আন্দোলন করবো। সংসদকে অচল করবো না। আমার ব্যক্তিগত মতামত হলো, বিরোধী দলে থাকাকালে আওয়ামী লীগেরও এই নীতি হওয়া উচিত ছিল। পঞ্চম সংসদ থেকে তাদের পদত্যাগ করা উচিত হয়নি। বর্তমান সরকার যদি ভারতকে করিডর বা ট্রানজিট দেওয়ার

www.pathagar.com

বিতর্কিত কোনো সিদ্ধান্ত না নেয়, তবে জাতীয় সংসদ অচল হয়ে পড়ার কোনো কারণ আমি দেখছি না এ মুহূর্তে।

প্র ॥ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কেমন চলছে।

উ ॥ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ভালো চলছে না। কারণ ওই বাকশালীকরণ। ভাইস চ্যান্সেলরের ওপর চাপ বাড়ছে, আওয়ামী লীগ পন্থীদের নেন। আওয়ামী প্রার্থীকে জেতান। বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের পরিবর্তন জরুরি হয়ে পড়ছে। আমি এই বিষয়টির ওপর জোর দিতে চাই। আমি এই অধ্যাদেশের বিরুদ্ধে। এই অধ্যাদেশ পরিবর্তন করতে পারে আওয়ামী লীগই। কেননা এটা তৈরি হয়েছিল ১৯৭৩ সালে, তাদেরই আমলে। বিশ্ববিদ্যালয় এখন রাজনীতিকীকরণের স্থানে পরিণত হয়েছে। ভাইস চ্যান্সেলর হওয়াটাই এখন সবার জীবনের স্বপ্ন হয়ে গেছে।

প্র ॥ বলা হয়ে থাকে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়াশোনা কম হয়, রাজনীতি বেশি।

উ ॥ আমাদের মহান ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ এবং আরো অনেক আন্দোলনে এদেশের ছাত্রসমাজের গৌরবজনক ভূমিকা রয়েছে একথা অনস্বীকার্য। তবে দেশ স্বাধীন হয়েছে আজ ২৫ বছর। তারপর দেশ গড়ার, দেশকে এগিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব ছিল রাজনীতিবিদদের, রাজনৈতিক নেতাদের। কিন্তু তা হয়নি। রাজনৈতিক নেতারা তাদের অস্ত্র হিসেবে ছাত্রসমাজকে ব্যবহার করে।

শিক্ষক নয় ভোটার নিয়োগ চলছে

প্র ॥ এখন ভাইস চ্যান্সেলর যখন নতুন কোনো শিক্ষককে নিয়োগ দেন, আসলে উনি শিক্ষক নন, একজন ভোটারকে নিয়োগ দেন। কথাটি ঠিক?

উ ॥ সত্যি কথা। তিনি শিক্ষক নন, একজন ভোটারকেই নিয়োগ দেন। এ ধরনের নিয়োগের জন্য ভাইস চ্যান্সেলরের ওপর প্রচণ্ড চাপ দেওয়া হয়। ভাইস চ্যান্সেলরদের জন্য আমার সত্যি মায়া হয়।

প্র ॥ বর্তমান সরকার বেতার ও টিভির স্বায়ত্তশাসনের বিষয়ে তাদের প্রতিশ্রুতি পালনে কতখানি উদার?

উ ॥ আওয়ামী লীগের মধ্য থেকে বাকশালিত্বের রেশ এখনো কাটেনি। মুখে বলে গণতন্ত্র, কিন্তু একদলীয় মনোভাবটা এখনো রয়েছে তাদের মধ্যে। আমরাই দেশের একমাত্র উত্তরাধিকারী, আমরাই সব–এই অবস্থা থেকে তারা বেরুতে পারছে না। তাদের বুঝতে হবে, এই দেশটা সমগ্র জনগণের, কেবল আওয়ামী লীগের নয়। আওয়ামী লীগ স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছে। এটা কেউ অস্বীকার করে না। শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা, অবদানও কেউ অস্বীকার করে না। তবে শেখ মুজিবুর রহমান

www.pathagar.com

ভালো করে রাষ্ট্র চালাতে পারেননি, এটাও সবাই স্বীকার করে। জোর করে জাতির পিতা বানানোর প্রয়োজন নেই। একমাত্র পাকিস্তান ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও জাতির পিতার বিধান নেই। মজার বিষয় হলো, ভারতে মহাত্মা গান্ধী এবং জওহরলাল নেহরু উভয়কে জাতির পিতা বলা হয়। এই বিষয়ে সংবিধানে কিছু লেখা নেই। সুতরাং আমাদের এখানে জাতির পিতা নিয়ে বাড়াবাড়ির কোনো দরকার নেই বলে আমি মনে করি। বেতার-টিভির স্বায়ত্তশাসনের দাবিটা জোরদারের জন্য চাই শক্তিশালী বিরোধী দল। এই দাবি আদায়ের জন্যে বিএনপিকে সংসদে এবং সংসদের বাইরে পত্রপত্রিকায় জোরালো ও দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে। পৃথিবীর কোনো শাসনকর্তা, সে যতই গণতান্ত্রিক হোক না কেন, সহজে কোনো দাবি পূরণ করে না। এই দাবি আদায়ের জন্য আপনাকে লড়াই করতেই হবে।

প্র ॥ সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার ছিল সন্ত্রাসমুক্ত বাংলাদেশ। তারা এক্ষেত্রে কতখানি সফল।

উ ॥ সন্ত্রাস রাজনৈতিক দলের অংশে পরিণত হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলোই সন্ত্রাস টিকিয়ে রাখছে। 'ক্রিমিনালাইজেশান অব পলিটিক্সের' -এ ধারা বন্ধ করতে হবে। সরকারি ও বিরোধী উভয় দলকে শপথ নিতে হবে, নিজেদের স্বার্থে সন্ত্রাসীদের ব্যবহার বন্ধ করার।

প্র ॥ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে গত এক বছরে সরকার কতটুকু সফল।

উ ॥ কোন ধরনের অর্থনৈতিক ফিলোসফি আমাদের দেশে উপযুক্ত তা-ই আমরা এখনো খুঁজে পাইনি। এটা আমাদের বুদ্ধিজীবীদের দুর্বলতা, রাজনৈতিক নেতাদের দুর্বলতা, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কৌশলের ওপর আপনি কি কোনো বই দেখেছেন? আমি অন্তত দেখিনি।

ভারত প্রেম ও সেনাবাহিনীর জন্য সর্বোচ্চ বরাদ্দ পরস্পর বিরোধী

প্র ॥ সরকারের চলতি বাজেট সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি?

উ ॥ বাজেটে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে প্রতিরক্ষা খাতে। আমি এর বিরুদ্ধে। ভারত যদি আমাদের এতো বড় বন্ধুই হয়, তাদেরকে যদি আমরা করিডোরই দিতে পারি, তবে এতো বড় প্রতিরক্ষা বাজেটের প্রয়োজনটা কেন। বলা চলে বাজেটে প্রতিরক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দিয়ে আওয়ামী লীগ সরকার সেনাবাহিনীকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা চালিয়েছে। এক অর্থে, এটাকে ঘুষ প্রদানই বলা যায়।

আওয়ামী লীগের ভারত প্রেম এবং বাজেটে সেনাবাহিনীর জন্য সর্বোচ্চ বরাদ্দ বিষয়টি পরস্পর বিরোধী। সরকার হয়তো এটা জেনেশুনেই করেছে অথবা সেনাবাহিনীর

www.pathagar.com

ভয়ে করেছে। তবে এই দুটোই ভুল। চলতি বাজেট সম্পর্কে এটাই আমার প্রথম প্রতিক্রিয়া।

প্র ॥ আগামী দিনগুলোতে আওয়ামী লীগ সরকারের সাফল্য সম্পর্কে আপনি কতখানি আশাবাদী।

উ ॥ সরকার সব ক্ষেত্রে খুব বেশি সফল হবে এমনটি নয়। ঠেলেঠুলে চলবে। কারণটা হলো অভিজ্ঞতার অভাব। আমলাদের মধ্যে দলীয় মনোভাব বাড়ছে। গণতন্ত্র আজ রাজনীতিকীকরণ হয়ে পড়েছে। সিভিল সার্ভিসের মানসিক দলীয়করণের কুপ্রভাব ছেয়ে গেছে। এ সরকার চলবে। তবে তাদের কাছ থেকে অসাধারণ বা অভাবনীয় কোনো উন্নয়ন আশা করা যায় না।

দৈনিক মানবজমিন, ২৯ জুন, ১৯৯৭
সাক্ষাৎকার গ্রহণ : মোহসীন আব্বাস ও এম. এম. কায়সার

www.pathagar.com

৮ টিকে থাকবে বাংলাদেশ

আমি অনেক সময় ভাবি, What is Unique about Bangladesh. বিশ্বের প্রত্যেক দেশেরই, একটা Unique (অনন্য) বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এখানে প্রফেসর আবদুল্লাহ ফারুক আছেন, কথাটা বলতে আমার ভয় লাগে। কিন্তু আমি সবসময়ই Optimistic (আশাবাদী)। আর আজ এই জাতীয় সংহতি সম্মেলনে দাঁড়িয়ে, মনে হলো, আমাদের বাংলাদেশীদের এমন একটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যে কারণে সকলের প্রিয় এই মাতৃভূমি চিরদিন টিকে থাকবে (উচ্ছ্বসিত শ্রোতামণ্ডলীর করতালি)। আমাদের এই বৈশিষ্ট্যটা কি? এটি হলো, আমরা পরস্পর যতই ঝগড়াঝাটি বা মারামারি করি না কেন, বিপদ দেখলে আমরা এক হয়ে যাই।

কিছুদিন আগে আমি বিদেশ থেকে এসেছি। আসার পর থেকেই, একের পর এক শুনছি, ভারতকে ট্রানজিট, করিডর প্রদান, উপ-আঞ্চলিক জোট গঠন ইত্যাদি এসব শুনে-টুনে এক রকম নিরাশ হয়ে গিয়েছিলাম। তো, এই পর্যায়ে দেখলাম, কতিপয় যুবক এই জাতীয় সংহতি সম্মেলন করার আয়োজনে এগিয়ে এলেন। আর এতেই যেন ভোরের আলো ফুটে উঠলো। এখন আমার মনে হচ্ছে, ইন্ডিয়ান এক্সপ্যানসনইজম (ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদ) প্রতিহত করার এই যাত্রা সফল হবে।

আজ সকালে আমি বাংলাদেশের সংবিধান পড়ছিলাম। যেটা ১৯৭২ সালে সরকারিভাবে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। একটি বিষয় আমি বিশেষভাবে খুঁজছিলাম। অন্যসব Sovereign Country-ট্রিটি সম্পর্কে তাদের সংবিধানে কি ধরনের বিধান রেখেছে সেটা দেখলাম। লক্ষ্য করেছি, প্রত্যেক দেশের সংবিধানেই ট্রিটি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট বিধান রয়েছে। কিন্তু আমি দেখলাম, ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানে ট্রিটি সম্পর্কে কোনো বিধান নেই। ১৯৭৭ সালে সামরিক শাসনের অধীনে, সংবিধানের একটি অ্যামেন্ডমেন্ট (অনুচ্ছেদ ১৪৫ক) আনা হয়। এতে বিদেশের সঙ্গে সম্পাদিত সকল চুক্তি সংসদে উপস্থাপনের ব্যবস্থা রাখা হয়। এছাড়া সিক্রেট ট্রিটি (জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো চুক্তি) কেবল সংসদের গোপন বৈঠকে পেশ করার ব্যবস্থাও করা হয়। আমি বলবো, it was an improvement। কিন্তু আজ আমি সুপারিশ রাখতে চাই যে,

www.pathagar.com

বিদেশের সঙ্গে সম্পাদিত যেসব ট্রিটি আমাদের সার্বভৌমত্বকে affect করে সেসব ট্রিটি সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় রেটিফাই করার ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে (তুমুল করতালিতে হলভর্তি জনতার সমর্থন)। আর এটা যদি আনা সম্ভব হয়, তবে সেটাই হবে Powerful Instrument। আমি অবশ্য কাউকেই (রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত মহল) সন্দেহ করি না। শুধু বলবো, একটি বৃহৎ রাষ্ট্র হিসেবে ইন্ডিয়া আমাদের গিলে ফেলতে চায়, আর আমার বিবেচনায়, বাংলাদেশের জনসাধারণের মনেও, একই শংকা বিরাজমান। এ প্রসঙ্গে আমি আর একটা কথা জোর দিয়ে বলতে চাই, সেটা হলো, বিদেশের সঙ্গে কোনো ট্রিটি করার আগে শেখ হাসিনা ওয়াজেদ প্রাইভেটলি অথবা পাবলিকলি খালেদা জিয়ার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে পারেন। আর এরকম ঘটনার মধ্য দিয়েই, কিন্তু 'ন্যাশনাল কনসেনসাস' হতে পারে। ট্রিটি নিয়ে এরকম আলোচনা করা, atleast it is the rules of the game. আমি আশা করবো অন্তত 'রুলস অব গেম' এর স্বার্থে প্রধানমন্ত্রী এরকম আলোচনা নিশ্চিত করবেন।

প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশে ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। কিন্তু জনগণের সেই ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট নামের কালো আইন রাখার কি কোনো সামঞ্জস্য রয়েছে? আমি আশা করবো, প্রধানমন্ত্রী কিছুদিন আগে স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট বহাল রাখা সম্পর্কে যে কঠোর উক্তি করেছেন তা পুনঃ বিবেচনা করবেন। আমি যে সমস্যাটা দেখতে পাই, তা হলো স্পিকারকে নিয়ে গোলমাল। তাঁকে নিয়ে একটা Political Controversy চলছে। আমার ব্যক্তিগত ধারণা, ইংল্যান্ডের স্পিকারের নিয়োগ পদ্ধতির চেয়েও, আমি জাপানে এই বিধানটি ভালো দেখেছি। সেখানে স্পিকার হিসেবে যিনি শপথ গ্রহণ করেন, তিনি তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দল থেকে পদত্যাগ করেন। আমাদের দেশে জাপানের এই বিধানটি যদি কনভেনশন হিসেবে develop করে তাহলে খুবই ভালো হয়। স্পিকার লিখিতভাবে বলবেন যে, তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিত্ব করছেন না।

আমি একজন প্রফেসর। তাই আজকের এই সম্মেলনে, এর চেয়ে জোরালো আমার আর কিছু বলার নেই। আজ যে জাতীয় সংহতি শুরু হলো তা যেন চিরদিন টিকে থাকে।

অনুলিখন : মিজানুর রহমান খান

গত ৭ এপ্রিল, ৯৭ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে সরকার, সম্পদ ও গণতন্ত্র শীর্ষক অধিবেশনে প্রফেসর তালুকদার মনিরুজ্জামান সভাপতির ভাষণ দেন।

সাপ্তাহিক রাষ্ট্র, ১০ এপ্রিল ১৯৯৭

www.pathagar.com

৯ ট্রানজিট দিলে বাংলাদেশ সার্বভৌমত্ব হারাবে

প্রশ্ন ॥ চলমান ট্রানজিট বিতর্ক সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

উত্তর ॥ ভারতকে যদি ট্রানজিট সুবিধা দেওয়া হয়, তবে বাংলাদেশ তার স্বাধীন ও সার্বভৌম অস্তিত্ব কোনোক্রমেই টিকিয়ে রাখতে পারবে না। বাংলাদেশ পরিণত হবে ভারতের একটি 'সঙ্গরাজ্য' বা "অঙ্গরাজ্যে'। তাই যে কোনো মূল্যে হোক ট্রানজিট দেওয়ার পরিকল্পনা নস্যাত করে দেওয়া উচিত। আমার কোনো রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ নেই। ট্রানজিট ইস্যু ভারতের সুদূরপ্রসারী সামরিক স্ট্র্যাটেজির সঙ্গে সম্পর্কিত এবং তা বাংলাদেশের জন্য কোনো কল্যাণ বয়ে আনবে না। তাই আমি এ প্রশ্নে বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার একটি ঘোষণার সঙ্গে একমত যে, রক্তের বিনিময়ে হলেও দিল্লীকে বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে দ্বিপাক্ষিক ভিত্তিতে করিডর বা ট্রানজিট দেওয়ার উদ্যোগ প্রতিহত করতে হবে। প্রতিবেশী দেশ হিসেবে ভারতের সঙ্গে আমরা সব সময়ই ভালো সম্পর্ক বজায় রাখতে আগ্রহী এবং সরকারকে সে ব্যাপারে অবশ্যই সচেতন থাকতে হবে।

জার্মানির মতো হলেও আমরা ভারতকে ট্রানজিট দিতে পারতাম

প্র ॥ ইউরোপের সঙ্গে বাংলাদেশের বাস্তবতা কিভাবে ও কতোটা প্রাসঙ্গিক?

উ ॥ গোটা ইউরোপ আজ একত্রিত হচ্ছে ঠিকই। সেখানে শুধু ট্রানজিট নয়, সর্বক্ষেত্রে তাদের সহযোগিতার ভিত রচিত হচ্ছে। তারা আজ অভিন্ন মুদ্রার প্রচলনের কথাও ভাবছে। কিন্তু ইউরোপের জাতিগুলো, শত বছরের লড়াই শেষে আজ একটি সমতায় এসেছে। অর্থনীতি ছাড়াও, নিরাপত্তার ক্ষেত্রে তারা এখন সংশয়মুক্ত। এ সংশয় এ উপমহাদেশে প্রবল। তাই ভারতকে ট্রানজিট দিতে ইউরোপের দিকে তাকালে চলবে না। বাংলাদেশকে তাকাতে হবে তার নিজের দিকে। তার যদি টেকনোলজি না থাকে, তাহলে তার অধঃপতন অবধারিত। আর যার টেকনোলজি থাকবে সে উপরে উঠে যাবে। আমরা তো এখনো রয়ে গেছি অষ্টাদশ শতকে। ফ্রান্স অথবা জার্মানির মতো

www.pathagar.com

থাকলেও আমরা ইন্ডিয়াকে ট্রানজিট দিতে পারতাম। ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে ক্ষমতা ও সমান মর্যাদার ভিত্তিতে। তারা আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে শিল্পায়নের এমন একটা উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, যেখানে সামরিক ফ্যাক্টর হয়ে পড়েছে গৌণ। যুদ্ধ-বিগ্রহ বা সংঘাত হলে তারা নিজেরাই ধ্বংস হয়ে যাবে-এ ধরনের এক অভিন্ন অনুভূতি নিয়ে তারা পরস্পরের কাছাকাছি হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট সেদিক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

প্র ॥ যুক্তি দেয়া হচ্ছে যে, ভারতকে ট্রানজিট সুবিধা দেওয়ার বিনিময়ে বাংলাদেশ বেশুমার রাজস্ব আদায় করতে পারবে।

উ ॥ এটা খুবই অবাস্তব ও অবাস্তব যুক্তি। আমাদেরকে একটা সরল সত্য বুঝতে হবে। আর তা হলো, যেখানে 'ইকুয়াল ডেভেলপমেন্ট' নেই সেখানে পরস্পর কাছে এলে, সঙ্গত কারণেই ছোট দেশ এক্সপ্লয়েটেড হবে। ভারতের বিশাল অর্থনীতির যে চাপ, তা ক্ষুদ্র ও অনগ্রসর বাংলাদেশ কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না। ভারতীয় ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা তাদের সর্বগ্রাসী থাবা নিয়ে আমাদের উঠতি সব কল-কারখানা ও শিল্প স্থাপনাগুলোকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। এ মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে, ১৯৭৩ সালে কলকাতা সফরের সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ড. বঙ্গেন্দু গাঙ্গুলীর একটি তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি। ড. গাঙ্গুলী ভারতের একজন খ্যাতিমান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী। রাজনীতিতে তিনি বাম ঘেঁষা। জ্যোতি বসুর কাছে নমস্য ব্যক্তিত্ব। তিনি বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামেরও একজন পৃষ্ঠপোষক। ওই সময়ে দেশে ফেরার পথে তার কাছে আমি একটি প্রশ্ন রেখেছিলাম। বলুন তো, ভবিষ্যতে বাংলাদেশকে কোন পথে চলতে হবে?

'দে সাক ক্যালকাটা,
দে উইল সাক বাংলাদেশ'

ড. গাঙ্গুলী অতি দ্রুত জবাব দিয়েছিলেন, ভারতের ব্যবসায়ী, বিশেষ করে মাড়োয়ারিদের আপনাদের দেশে কিছুতেই ঢুকতে দেবেন না। কারণ, 'দে সাক (Suck) ক্যালকাটা, দে-উইল সাক বাংলাদেশ (তারা কলকাতাকে শুষে নিয়েছে, বাংলাদেশকেও তারা শুষে নেবে)।' একথা কি অস্বীকার করা যাবে যে, কলকাতা আজ অবাঙালি মাড়োয়ারিদের হাতেই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে না? অধিকাংশ বৃহৎ শিল্প-কারখানাই তো তাদের নিয়ন্ত্রণে। ইদানীং, একজন মাত্র বাঙালি শিল্পপতির নাম শোনা যাচ্ছে। আর তিনি জ্যোতি বসুর ছেলে। জ্যোতি বসু নিজে সফল রাজনীতিক হিসেবে নাম করেছেন সত্য কিন্তু তিনিও মাড়োয়ারিদের ডিকটেশনের বাইরে যেতে পারেননি। বাঙালি মুখ্যমন্ত্রী হয়েও অবাঙালিদের বৃত্তে বন্দি। সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও তো তার চাপ আছে। উত্তম-সুচিত্রা

www.pathagar.com

অভিনীত সিনেমাগুলোর পরে, আর তেমন কোনো উন্নতমানের ছবি কিন্তু হয়নি। ওটাই সবেধন নীলমনি। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বাঙালিরা দেখে। নতুন করে ওইভাবে আর কেউ গড়ে ওঠার সুযোগ পায়নি।

প্র ॥ ভারত আমাদের বন্ধু রাষ্ট্র। নিকটতম প্রতিবেশী। তার সঙ্গে কি ট্রানজিট সহযোগিতা একেবারেই অসম্ভব?

উ ॥ ভারতের সঙ্গে ট্রানজিট সংক্রান্ত সহযোগিতা সেদিনই হতে পারে, যেদিন আমরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবো। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের মতো শিল্পোন্নত দেশও কিন্তু পরস্পর পরস্পরের শিল্পকে প্রটেকশন দিতে সময়ে সময়ে বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। বাজার অর্থনীতির তারা মহাজন। কিন্তু নিজেদের শিল্পকে কি করে বাঁচিয়ে রাখতে হয়, তা তাদের ভালোই জানা। তাহলে আমরা কেন নিজদেরকে 'ওপেন' করবো? এই যে ইউরোপ আজ একত্রিত হচ্ছে। তার পেছনেও কিন্তু একই লজিক। যুক্তরাষ্ট্র, জাপান 'অ্যাডভান্স টেকনোলজি' নিয়ে উপরে চলে গেছে। ইউরোপ কি তা চেয়ে চেয়ে দেখবে। সেও কিন্তু প্রকান্তরে, প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার তাগিদেই জোট বাঁধছে। বাংলাদেশকে তো ইউরোপের বাস্তবতা মোকাবিলা করতে হচ্ছে না।

প্র ॥ বিশিষ্ট ভারতীয় বুদ্ধিজীবী ভবানী সেনগুপ্ত বলেছেন, বাংলাদেশের স্বার্থেই ভারতকে ট্রানজিট দিতে হবে। নইলে বাংলাদেশ হবে একটি বদ্ধ জলাশয়–এ সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন।

উ ॥ উনি আমার বন্ধুপ্রতিম। বিজ্ঞ ব্যক্তি। কিন্তু আমি মনে করি, তিনি ওই মন্তব্য রেখেছেন ভারতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করতেই। আর আমার বক্তব্য, বাংলাদেশের স্বার্থে। ভারত অনেক বড় রাষ্ট্র। অনেক শক্তিশালী তাদের অর্থনীতি। আমরা তাদের পর্যায়ে নেই। তাদের ট্রানজিট দিলে, উই উইল বি ক্রাশড। ট্রানজিটের বিনিময়ে মোটা অংকের 'টোল' প্রাপ্তির গল্প শুনিয়ে লাভ নেই। রাজস্বের চেয়ে স্বাধীনতা অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

বিদ্যুৎ আমদানি প্রশ্নে
জাপানের কথা ভাবুন

প্র ॥ বর্তমান সরকার ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানির সম্ভাবনা পরীক্ষা করে দেখছে?

উ ॥ এটি হতে পারে আরেকটি আত্মঘাতী পদক্ষেপ। পানির ওপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ নেই। ৩০ বছরের পানি চুক্তি হলেও, সোজা কথা হচ্ছে, ইচ্ছে হলে তারা দেবে অথবা দেবে না। এখন যদি আমরা বিদ্যুতের ওপরও নির্ভরশীল হই, তাহলে নতুন করে বিপদ ডেকে আনাই হবে। আমি মনে করি, অ্যাটমিক রি-অ্যাকটরের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কোনো বিকল্প নেই। নতুন সরকারের উচিত, এক্ষুণি এ লক্ষ্যে পদক্ষেপ

www.pathagar.com

নেওয়া। জাপানের কাছে চাইলে তারা বাংলাদেশকে নিউক্লিয়ার প্লান্ট দেবে। তারা ইতিপূর্বে ইন্দোনেশিয়াকে দিয়েছে। এ মুহূর্তে জাপানের ৫০টি রি-অ্যাকটর রয়েছে। প্লুটোনিয়াম নির্ভর এসব রি-অ্যাকটর দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, এক ভয়ানক ঝুঁকির মধ্যে এসব রি-অ্যাকটর কাজ করছে। কারণ জাপান ভূমিকম্পের দেশ। কোনোদিন রি-অ্যাকটর এলাকায় ভূকম্পন হলে ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে। জাপানি জনগণের এটা জানা আছে; তাই তারা এর বিপক্ষে। কিন্তু সরকার তা চালিয়ে নিতে বদ্ধপরিকর। তাদেরকে এ নিয়ে জিজ্ঞেস করলে, তারা জবাব দিয়েছে, বিদ্যুতে স্বনির্ভর থাকতেই এ ঝুঁকি মেনে নেওয়া হয়েছে। জাপানের গাড়ি সারা বিশ্বে চলে। কিন্তু তাদের ঘরে জ্বালানি নেই। চাহিদার শতকরা ৯০ ভাগ ডিজেল আমদানি করতে হয় মধ্যপ্রাচ্য থেকে। তাই তারা বিদ্যুতেও আমদানি নির্ভর হতে চায়নি। এরজন্য বেছে নিয়েছে মরণপণ ঝুঁকি। তাই বলছি, পানিতে আমরা নির্ভরশীল। বিদ্যুতেও নির্ভরশীলতা চাই না।

প্র ॥ ভারত এবং বাংলাদেশ সম্প্রতি ভুটান ও নেপালকে নিয়ে একটি নতুন সাব-রিজিওনাল গ্রুপ গঠনে মনোনিবেশ করেছে।

উ ॥ পাকিস্তানকে বাদ দিয়ে এ গ্রুপ গঠন করলে আঞ্চলিক সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ব কিভাবে দৃঢ় হতে পারে? ভারত কি আসলে উপ-আঞ্চলিক জোট গঠনের আড়ালে দক্ষিণ এশিয়ায় এন্টি চায়নিজ ব্লক তৈরির পরিকল্পনা করছে? প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সার্ক-এর রূপরেখা এঁকেছিলেন কিন্তু এ ধরনের স্ট্র্যাটেজিক সমীকরণ বাদ দিয়ে। সে কারণে সার্ক কাঠামোতে বিশেষ কোনো দেশের স্ট্র্যাটেজিক স্বার্থ সংরক্ষিত হয়নি। কিন্তু সাব–রিজিওনাল গ্রুপ গঠনে তো আঞ্চলিক শক্তির ক্ষেত্রে ভারসাম্যের ঘাটতি দেখা দিতে পারে। আমরা ক্ষুদ্র দেশ। 'বিগ পলিটিক্স'-এর সঙ্গে আমাদের জড়িত হওয়ার প্রশ্ন আসে না।

ট্রানজিট ভারতের সামরিক স্ট্র্যাটেজি

প্র ॥ ট্রানজিট ইস্যুর সঙ্গে ভারতের সামরিক স্ট্র্যাটেজিটা কিভাবে জড়িত একটু কি ব্যাখ্যা করবেন?

উ ॥ আগামী শতাব্দীর গোড়াতেই একটি নতুন কোল্ড ওয়ার বা স্নায়ু যুদ্ধের পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে। আর সে সময়টাতে, ইন্ডিয়া 'সুপার পাওয়ার' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। এরকম একটি সম্ভাবনাকে সামনে রেখে ভারত এখন থেকেই চারদিক গুছিয়ে নিতে চাইছে। আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণে মনে রাখতে হবে যে, পশ্চিমে এখন যে 'পিস প্রসেস' চলছে তা কিন্তু এশিয়ার 'পিস প্রসেস' থেকে ভিন্ন। পশ্চিমী শক্তিগুলো

www.pathagar.com

নিজেদের এমন পর্যায়ে উন্নীত করেছে যে, তারা বুঝতে পেরেছে, তাদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধে কোনো ফল নেই। তাই তারা সহযোগিতার জন্য শামিল হচ্ছে। তাদের আগ্রহ আর কোনো দেশ দখলের প্রতি নয়, গ্রহ জয়ে। কিন্তু এশিয়ার অবস্থাটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। জাপানকে পরাস্ত করার ক্ষমতা রাখে চীন। কিন্তু পরমাণু বোমা ব্যবহার সম্পর্কে চীনের বক্তব্য হলো, সে কখনো এতে 'ফার্স্ট পার্টি' হবে না। অন্যদিকে জাপানও কিন্তু চীনকে পরাস্ত করতে সক্ষম। এবং আমি মনে করি তারা তা পারবে, 'নন নিউক্লিয়ার ওয়ার' দিয়েই।

প্র ॥ এ উপমহাদেশে আণবিক যুদ্ধের হুমকি কি নিছক কল্পনাপ্রসূত ধারণা?

উ ॥ না আমি তা মনে করি না। আফ্রিকার বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী Ali Mazrui মধ্য সত্তর দশকে এ ব্যাপারে একটি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। এটি তিনি প্রথমে প্রকাশ করেছিলেন জাপানে এক সেমিনারে। পরে তার বক্তৃতাটি লন্ডনের ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের জার্নালে-এ ছাপা হয়। এই রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এমন একটি সময়ে সেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, যখন ভারত সবে পরমাণু বোমা তৈরি করেছে। কিন্তু পাকিস্তানের তখন ছিল না। তিনি বলেছিলেন, ভবিষ্যতে যদি কখনো পরমাণু যুদ্ধ হয়, তবে তা ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যেই ঘটবে। কারণ এই দুটো দেশের মধ্যে যে ধরনের রেষারেষি, বিদ্বেষ ও ঘৃণা, তা বিশ্বের অন্য কোনো অঞ্চলে নেই। ওই রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বলেছিলেন, ভারত যখন পরমাণু বোমা বানিয়েছে, তখন পাকিস্তানও একদিন তা তৈরি করবেই। প্রফেসর আলীর মতে, পাক-ভারত পরমাণু যুদ্ধ হলে পৃথিবীতে সেটাই হবে শেষ পরমাণু যুদ্ধ। কারণ এই যুদ্ধের ফলে, পৃথিবীর পরিবেশ এত দূষিত হয়ে যাবে যে, হিরোশিমা ও নাগাসাকি সে তুলনায় হবে 'টি পার্টি'। এ যুদ্ধের ভয়াবহতার মুখে, পৃথিবীর অন্যসব দেশ তাদের অস্ত্র সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে। প্রফেসর আলী সম্প্রতি ইসলামাবাদ সফর করেন। তার ভবিষ্যদ্বাণীর আংশিক কিন্তু ইতিমধ্যে সত্যে পরিণত হয়েছে। কারণ এই দুটো দেশই এখন পরমাণু বোমার অধিকারী। আর আমি মনে করি যে, পাকিস্তানের হাতে এটম বোমা রয়েছে বলেই ভারত আজও পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মির দখল করে নিতে সংযমের পরিচয় দিচ্ছে। অন্যথায় তারা হয়তো তা দিত না।

এশিয়ার ক্ষমতার ভারসাম্যের আরেকটি সমীকরণ হচ্ছে- চীন ও জাপান। চীন সামরিকায়নে অতি দ্রুত এগিয়ে গেছে। এখন সে তার শক্তি প্রদর্শন করতে চাইছে। এজন্য সে তার দৃষ্টির প্রসার ঘটিয়েছে সমুদ্রের দিকে। সপ্তম নৌবহরের মতো একটা জাঁকজমকপূর্ণ প্রদর্শনী তার দেখানো চাই। অনেক সিকিউরিটি স্পেশালিস্ট মনে করেন যে, চীনারা ইরাবতী নদীর মুখে সাবমেরিন বেজ তৈরির যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তা

www.pathagar.com

তাদের ওই মনোভাবেরই প্রতিফলন। পশ্চিমী শক্তিসমূহও কিন্তু চীনের এই সামরিক শক্তি সম্প্রসারণে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। সোভিয়েত রাশিয়াকে 'খেয়ে' ফেলার পরও কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চোখে ঘুম নেই। তার নিরন্তর শিরঃপীড়া চীনকে নিয়ে।

প্র ॥ ট্রানজিট কিভাবে ভারতের সামরিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হতে পারে? যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন কেন চাইছে যে, ভারতকে ট্রানজিট প্রদান করুক বাংলাদেশ?

উ ॥ চীনের সঙ্গে সম্ভাব্য যুদ্ধে ভারত আমাদের ভূখণ্ডকে করিডর হিসেবে ব্যবহার করবে। যেভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে হিটলার ফ্রান্সকে দখল করে নিতে বেলজিয়ামকে করিডর হিসেবে ব্যবহার করেছিল। আর ভারতকে ট্রানজিট দিতে পশ্চিমাদের এই আকাঙ্ক্ষাটাও কিন্তু এসেছে মূলত এ অঞ্চলে তাদের সামরিক স্ট্র্যাটেজি থেকেই। চীনকে বাগে রাখতে, ট্রানজিট ইস্যুতে তারা দিল্লীকে সমর্থন করছে। মনে রাখতে হবে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, যেখানে স্বার্থের কোনো মৌলিক দ্বন্দ্ব নেই, সেসব ক্ষেত্রে ব্রিটেন সাধারণত যুক্তরাষ্ট্রকেই সমর্থন করে থাকে। জাপানও পারতপক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের নীতির বিরোধিতা করে না। সুতরাং ট্রানজিট ইস্যুতে, এদের সকলের অবস্থান অভিন্ন হলে বিস্ময়ের কিছু নেই।

চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার ও তেল সম্পদ আহরণে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি

ভারতের মূল দৃষ্টি চট্টগ্রাম বন্দরকে কব্জা করা। সামরিক, অর্থনৈতিক ও সর্বোপরি, বাংলাদেশে তেলসহ অন্যান্য অনাবিষ্কৃত খনিজ রত্নের ওপর খবরদারি সে ভালোভাবে করতে পারবে, যদি চট্টগ্রাম বন্দরের উপর যে কোনো ভাবে একবার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে। কলকাতা বন্দরের আর ভবিষ্যৎ নেই। এর সম্ভাবনা ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। ৪০ হাজার কিউসেক কেন, এর চেয়ে বেশি পরিমাণ পানি দিয়েও কলকাতা বন্দরকে আর 'সিংহদ্বার' করা যাবে না। ভারত সেটা বুঝতে পেরেই চট্টগ্রাম বন্দর পেতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। আমি তো মনে করি, বাংলাদেশের সঙ্গে সমুদ্রসীমা নির্ধারণে ভারত যে বিরোধিতা করেছে, ভারতকে চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করতে না দেওয়ার পেছনে এটিও এক শক্ত যুক্তি হতে পারে। তেল সম্পদ আহরণে ১৯৭৫ পূর্ব আওয়ামী লীগ সরকারের অভিজ্ঞতা দুঃখজনক। দিল্লীর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কন্যা শেখ হাসিনাকে সে ঘটনা ও তার সুদূরপ্রসারী পরিণাম সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে। বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে সমুদ্রসীমা নির্ধারণে ভারতের সঙ্গে বিরোধের সূত্রপাত ১৯৭৪ সালের এপ্রিলে। এ সময়ে বাংলাদেশ এ ইস্যুর নিষ্পত্তিতে দিল্লীকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাব দেয়। পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ে মাত্র ৫টি বৈঠক হওয়ার পর তা ভেঙে যায়। বাংলাদেশ এই আলোচনা অসমাপ্ত রেখেই যখন তেল সম্পদ আহরণে আন্তর্জাতিক

www.pathagar.com

টেন্ডার আহ্বান করে, তখন তা দিল্লীর সীমাহীন ক্রোধের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে ৬টি বিদেশী কোম্পানির সঙ্গে বাংলাদেশ চুক্তি সই করে। এর মধ্যে তিনটি ছিল আমেরিকান, অন্য তিনটি– কানাডা, যুগোস্লাভিয়া ও জাপানের। আমাদের এটা ভুলে গেলে চলবে না যে, ভারতের নৌবাহিনী, সেদিন একটি আমেরিকান কোম্পানির জাহাজকে শক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে বিদায় নিতে বাধ্য করেছিল। মার্কিন প্রফেসর Marcus Franda, যিনি বাংলাদেশের একজন বন্ধু, তিনি তাঁর 'বাংলাদেশ : দি ফার্স্ট ডিকেড' বইতে ওই ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। বইটি ১৯৮১ সালে দিল্লীতে প্রকাশিত হয়। ফ্রান্ডা বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ও একই বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিস অব ইনটারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স-এর ডিরেক্টর হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। ফ্রান্ডা উল্লেখ করেন, ' . . . Even while the socalled "fifth round" of talks looked promising, optimism evaporated when the Indian navy physically prevented an American Oil Company vessel from exploring, on behalf of Bangladesh, a disputed area. Shortly after the incident the Bangladesh government shifted its stance on the boundary issue claiming even more of the seabed than it had originally'.

সাক্ষাৎকার : মিজানুর রহমান খান
সাপ্তাহিক রাষ্ট্র, ৮ জানুয়ারি ১৯৯৭

www.pathagar.com

১০ সংসদে অশোভন উক্তি রাজনীতিকদের নিম্ন সংস্কৃতির পরিচায়ক

সংসদে অশালীন বক্তব্য ও গালাগালি আমাদের রাজনীতিকদের নিম্নসাংস্কৃতিক মান ও রুচির পরিচয় তুলে ধরে। জাতীয় সংসদে সাম্প্রতিক এই গালাগালির ঘটনার জন্য স্পিকার তার দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। কারণ তার উচিত ছিল, যথাসময়ে মাইক বন্ধ করে দেওয়া অথবা সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্য বা সদস্যদের সংসদ কক্ষ থেকে বের করে দেওয়া। তবে সংসদে গালাগালি ও অপ্রীতিকর ঘটনার কথা পৃথিবীর উন্নত দেশের পার্লামেন্টেও যখন-তখন শোনা যায়। অন্যান্য দেশের আইন সংক্রান্ত কার্যকলাপ সম্পর্কে, আমরা বই পত্রে যা পড়ি, সে আদর্শ পৃথিবীর কোনো পার্লামেন্টেই চলে না। এমনকি ব্রিটিশ পার্লামেন্ট, যাকে 'মাদার অব অল পার্লামেন্ট' বলা হয়, সেখানেও ঝগড়া-ঝাটি হয়। ওখানে প্রতিপক্ষের উদ্দেশে 'সান অব অ্যা বিচ' অর্থাৎ শুয়োরের বাচ্চা কথাটি প্রায়ই উচ্চারিত হয়। অথচ ব্রিটিশদের পার্লামেন্টারি রাজনীতির ইতিহাস প্রায় সাড়ে ৭শ' বছরের পুরনো। ১২১৫ সালে তাদের পার্লামেন্টের সূচনা। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের দু'কক্ষ, হাউস অব কমন্স ও হাউস অব লর্ডস, তখন থেকেই ক্ষমতার লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। কালক্রমে, হাউস অব লর্ডস থেকে হাউস অব কমন্স গুরুত্বপূর্ণ হয়। সে সময় এ নিয়ে বিরোধের এক পর্যায়ে এক রাজার গলা কেটে ফেলা হয়। পার্লামেন্টে হাতাহাতি -মারামারির ঘটনাও ঘটেছে। ব্রিটেনে পার্লামেন্টারি বিপ্লব হয়েছে ১৬৮৯ সালে। তখন হাউস অব কমন্স অর্থাৎ সাধারণ প্রতিনিধি সভায় মারামারি হাতাহাতি হতো। এ জন্যই হাউস অব কমন্সের ট্রেজারি বেঞ্চ ও অপজিশন বেঞ্চের মাঝখানে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা রাখা আছে। ওখানে ক্লার্করা বসে। কিন্তু ওই জায়গাটা 'ইনটেনশনালি' রাখা হয়েছে যাতে দু'পক্ষের মধ্যে সহজে মারামারি লেগে যেতে না পারে। পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র ভারতের পার্লামেন্টেও মারামারি, গালাগালি, অপ্রীতিকর ঘটনার নজির আছে। বছরখানেক আগে ভারতের ইউনাইটেড প্রভিন্সের প্রভিন্সিয়াল এসেম্বলিতে মারামারি হয়েছে মদের বোতল নিয়ে। এই ক'দিন আগে হংকংয়ের এসেম্বলিতে সদস্যদের মধ্যে গলাধাক্কা, কিল-ঘুষির ঘটনা ঘটেছে। এটা বিবিসি টেলিভিশন ও সিএনএনের মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারিত হয়েছে।

www.pathagar.com

১৯৫৮ সালে আতাউর রহমান সরকারের সময় শেরেবাংলা একে ফজলুল হকের দল কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও আওয়ামী লীগের মধ্যে পার্লামেন্টে চেয়ার ছোড়াছুড়ির ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনায় তৎকালীন ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলী মারা যান। সে ঘটনার সময় তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান উপস্থিত ছিলেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে, পার্লামেন্ট অধিবেশনে অশালীন বক্তব্য, গালাগালি এমনকি মারামারির ঘটনা যতো অপ্রত্যাশিত, দুঃখজনক আর লজ্জাজনকই হোক, তা নতুন কিছু নয়। এমন ঘটনার নজির আরো অনেক আছে। কিন্তু গত সপ্তাহে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি এমপিদের মুখ থেকে এ দু'টি দলের শীর্ষ নেত্রীদের সম্পর্কে যেভাবে কুৎসা রটানো হয়েছে তাতে আমাদের রাজনীতিকদের নিম্ন সাংস্কৃতিক মান ও কুরুচির পরিচয় প্রকাশ পেয়ে গেছে। তারা সেদিন যে ভাষায় কথা বলেছেন, যেভাবে শীর্ষ নেত্রীদের সম্পর্কে অপমানজনক কথাবার্তা বলেছেন, তাতে দেশের প্রতিটি মানুষ বিব্রতবোধ করেছেন। আমাদের রাজনীতিকদের সৌজন্যবোধ যে সাধারণ মানুষের চেয়েও অনেক নিম্নস্তরের, তাই এর মাধ্যমে বড় উৎকটরূপে প্রকাশ পেয়ে গেছে।

সংসদে স্পিকারের পদটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি হচ্ছেন সংসদের অভিভাবক। তাকে অত্যন্ত নিরপেক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হয়। তাকে ননপার্টিজান হতে হয়। এ জন্যই স্পিকার পদের মর্যাদা অন্যরকম। সবাই তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে। ব্রিটেনে দেখা গেছে, স্পিকার যে এলাকায় নির্বাচনে প্রার্থী হন সেখানে বিরোধী দল কোনো প্রার্থীই দেয় না। ফলে বিভিন্ন মেয়াদে বার বার স্পিকার তার পদে বহাল থাকতে পারেন। জাপানে কেউ স্পিকার হলে, তাকে সংশ্লিষ্ট দল থেকে পদত্যাগ করতে হয়। কিন্তু আমাদের দেশের স্পিকারের মর্যাদা এবং নিরপেক্ষতা সেরকম প্রশ্নাতীত নয়। সংসদের সাম্প্রতিক গালাগালির ঘটনায় স্পিকার তার দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। অন্যান্য দেশে স্পিকার এ ধরনের ঘটনার আশংকা দেখা দেওয়া মাত্র সার্জেন্টস অব আর্মস ডেকে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেন। প্রয়োজনে কোনো সদস্যকে তাদের মাধ্যমে সংসদ কক্ষ থেকে বের করে দেন। আমাদের স্পিকার এই গালাগালির ঘটনার সময় সেরকম কোনো ব্যবস্থা নেননি। যথা সময়ে মাইকও কেড়ে নেওয়া হয়নি। রেডিওর মাধ্যমে সারাদেশের মানুষ এসব কথা শুনেছে এবং ছিঃছিঃ করেছে। সাবেক স্পিকার শেখ রাজ্জাক আলী তখন এ বিষয়ে স্পিকারকে সংসদের রুলস অব প্রসিডিউরের ২৭০ প্রয়োগ করার আহ্বান জানান। এরপরই তার বোধোদয় হয়। তিনি এসব বক্তব্য এক্সপাঞ্জ করা এবং মাইক বন্ধ করে দেওয়ার হুমকিসহ কিছু গা বাঁচানো কথা বলেছেন। এভাবে স্পিকারের দায়িত্ব পালন হয় না। তার অবস্থা দেখে মনে হয়েছে, স্পিকার এ ধরনের কথা এনজয় করেন। তা না হলে তিনি আগে কেন ব্যবস্থা নেননি বা এ বিষয়ে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেননি?

www.pathagar.com

আর আমাদের সংসদ সদস্যরাই বা কেন এমন অশ্লীল ভাষায় বক্তব্য রাখতে গেলেন তার জবাবে বলতে হয়, এর কারণ আমাদের রাজনীতিকদের স্বার্থের দ্বন্দ্ব! আমাদের রাজনৈতিক নেতারা দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। এখন মন্ত্রী হলে, ঘরে বসে লাখ লাখ টাকা ভর্তি খাম উপঢৌকন পাওয়া যায়। এই পাওয়া না পাওয়ার দ্বন্দ্বের কারণে, তাদের রুচিবোধ ও হিতাহিত জ্ঞান অনেকাংশে লোপ পেয়েছে। তা না হলে একটা রাস্তার লোক যে ধরনের কথা বলতে সংযত হয়, সে ধরনের কথা বিদেশী অতিথিদের সামনে, সমগ্র-জাতিকে সাক্ষী রেখে অন দ্য রেকর্ড, অন দ্য ক্যামেরা তারা কি করে বলতে পারলেন? আর যা বললেন, তা তাদের সমপর্যায়ের কারো সম্পর্কে নয়, দেশের শীর্ষস্থানীয় দুই নেত্রী সম্পর্কে। এর আরেকটা কারণ হচ্ছে, আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে সর্বজনমান্য কোনো মূল্যবোধ নেই। সে রকম কোনো ঐতিহ্য এখনো গড়ে উঠেনি। পার্লামেন্টের রুলস অব দ্য গেমস এখানে মানা হয় না। নিয়ম-শৃংখলার কথা যা আছে, তা কাগজে কলমেই, বাস্তবে তার বালাই নেই। আমেরিকায় একটা কথা প্রচলিত আছে যে, অল পলিটিশিয়ান্স মে বি ব্যাড, বাট প্রেসিডেন্ট ইজ গুড। সব রাজনীতিক খারাপ হতে পারে, কিন্তু প্রেসিডেন্ট তা নন। রোম সাম্রাজ্যের সময় থেকে একটা কথা চালু আছে যে, সিজারস ওয়াইফ ইজ এবাভ সাসপিশন। সিজার অর্থাৎ রাজার স্ত্রী সন্দেহের উর্ধ্বে। এসব কথার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এই যে, শীর্ষ পদের একটা বিশেষ মর্যাদা আছে। সেই মর্যাদার জন্যই শীর্ষ পদে আসীন নেতা বা নেত্রী ছোটখাটো কোনো ভুল করলে, সেটি জাতির জন্যে বিপজ্জনক না হলে তা ধরা হয় না। কারণ এটাই নিয়ম। এটাই দীর্ঘদিনের লালিত ঐতিহ্য। আমাদের এ রকম কোনো ঐতিহ্য নেই। এজন্যই সংসদ সদস্যরা, দেশ বিদেশের গণ্যমান্য অতিথিদের সামনে, শীর্ষ নেত্রীদের সম্পর্কে এমন অশালীন বক্তব্য রাখতে পেরেছেন। অবশ্য এর অর্থ এ নয় যে, আমাদের সংসদীয় গণতন্ত্র হুমকির মুখে পড়েছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন তোলারও কোনো অবকাশ এতে তৈরি হয়নি। কারণ সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে, এরকম বাক-বিতণ্ডা, অশালীন বক্তব্যের নজির অনেক আছে যদিও তা অবাঞ্ছিত, পরিত্যাজ্য এবং নিন্দনীয়। কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে, আমাদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কেউ কেউ গণতন্ত্রের যে দিকটা নিন্দনীয়, নেতিবাচক ও পরিত্যাজ্য সে দিকটাকেই আঁকড়ে ধরেছেন। আর এভাবে নিজেদের চারিত্রিক ও সাংস্কৃতিক নিম্ন রুচির মাধ্যমে গোটা সংসদের মান মর্যাদা ক্ষুণ্ন করেছেন। এ জন্য এখন থেকেই সংসদীয় রীতিনীতি বা রুলস অব দ্যা গেম যথাযথভাবে অনুশীলনের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। আমাদের সংসদ সদস্যদের দল বদল ঠেকানোর জন্য সংবিধানের আর্টিকেল ৭০-এর বাস্তবায়ন প্রয়োজন। আর্টিকেল ৭০ অনুযায়ী, কোনো সংসদ সদস্য চাইলেই দল বদল করতে পারেন না। কারণ আর্টিকেল ৭০-এ বলা হয়েছে, "কোনো নির্বাচিত প্রতিনিধি কোনো নির্বাচনে কোনো রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরূপে মনোনীত হয়ে কোনো ব্যক্তি সংসদ

www.pathagar.com

সদস্য নির্বাচিত হলে তিনি যদি উক্ত দল থেকে পদত্যাগ করেন, অথবা সংসদে উক্ত দলের বিপক্ষে ভোটদান করেন, তাহলে সংসদে তার আসন শূন্য হবে।" এই আর্টিকলের ব্যাখ্যায় আরো বলা হয়েছে, "কোনো সংসদ সদস্য যদি দলের নির্দেশ অমান্য করে সংসদের কোনো বৈঠকে অনুপস্থিত থাকেন, তা হলে তিনি উক্ত দলের বিপক্ষে ভোটদান করেছেন বলে গণ্য হবে।" এই আর্টিকল অনুযায়ী কিছুদিন আগে বিএনপি ত্যাগকারী দুই সংসদ সদস্যের সরকারি দলে যোগদানের ফলে তাদের সদস্য-পদ চলে যাওয়ার কথা। কিন্তু আওয়ামী লীগ এবং এই দুই সদস্য যুক্তি দেখিয়েছেন যে, বর্তমান সরকার ঐকমত্যের সরকার। তাই নিজ দল ত্যাগ না করেও বিরোধী দলের কোনো সদস্য সরকারের মন্ত্রিসভায় যোগ দিতে পারেন। এই যুক্তিতেই, সম্ভবত ক'দিন আগে, বদরুদ্দোজা চৌধুরীকে কোনো এক সভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপ-প্রধানমন্ত্রী হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। জবাবে বদরুদ্দোজা চৌধুরী বলেছিলেন, উপ-প্রধানমন্ত্রী পদে তো আমি ছিলামই। এরচেয়ে বড় কিছু থাকলে বলুন। এ থেকেই স্পষ্ট হয়, আমাদের নেতা-নেত্রীরা সংসদীয় রীতিনীতি এমকি সংবিধানের সুনির্দিষ্ট আর্টিকেলকে তারা কেমন অবজ্ঞার চোখে দেখেন। বিএনপি যদি সংসদে এমন কোনো মোশন আনতো, যেখানে সব সদস্যের উপস্থিত থাকা এবং ভোট দান করা বাধ্যতামূলক, তাহলে দল ত্যাগকারী দুই সদস্য স্বপন ও আলাউদ্দিন বেকায়দায় পড়তো। কারণ তাহলে তারা হয় দলের পক্ষে ভোট দিত; না হয় তাদের সদস্য পদ চলে যেত।

সাপ্তাহিক পূর্ণিমা

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : মাহমুদ কাসেম

www.pathagar.com

১১ আমি খুবই আশাবাদী বাংলাদেশ একদিন অনেক বড় হবে

প্রশ্ন ॥ আজকের এই সুন্দর বিকালে যখন আমরা সাক্ষাৎকার পর্বে মিলিত হয়েছি, তখন পৃথিবীব্যাপী সহজে নিরাময়যোগ্য রোগে মৃত্যুবরণ করছে ১ হাজার শিশু এবং শিশু প্রসবের অক্ষমতার কারণে সামান্য স্বাস্থ্যসেবার অভাবে প্রায় ২ হাজার মা মৃত্যুবরণ করছেন। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, সামরিক ব্যয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই প্যারাডক্স থেকে বেরিয়ে আসার উপায় কি?

উত্তর ॥ প্রতিটি দেশই চায় তার সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে। কোনো দেশই আশঙ্কামুক্ত নয় যে, তার ভূখণ্ডের উপর অন্যের আক্রমণ হবে না। এজন্য প্রতিটি দেশই তার ভূখণ্ডগত সার্বভৌমত্ব রক্ষার ব্যাপারে সব সময় সজাগ থাকে। তবে এই যে তথ্য, তা নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক। আমার মনে হয়, এই হিউম্যান ট্রাজেডিকে রুখতে হলে সামরিক ব্যয় কমানো প্রত্যেকের উচিত এবং এজন্য একটা আন্তর্জাতিক চুক্তি হওয়া দরকার। এই চুক্তি তো বৃহৎ শক্তিরা কখনো করবে না, যদি না তা তাদের অনুকূলে যায়। এটাও মনে রাখতে হবে, বৃহৎ শক্তিগুলোর স্বার্থ অন্য জায়গায় নিহিত। কারণ অস্ত্র উৎপাদন সেক্টর, তাদের আয়ের অন্যতম বড় সেক্টর। ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসানের পর পাশ্চাত্যে সামরিক ব্যয় কিছুটা কমেছে। পক্ষান্তরে আমরা দেখতে পাচ্ছি, উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে পরস্পরিক আস্থা, বিশ্বাস খুবই কম। একে অপরকে ভয় পায়। উন্নয়নশীল দেশগুলোর এলিটরা মনে করে, যতো আর্মস 'প্রকিউর' করা যায় ততোই 'সিকিওর' হওয়া যায়।

সুতরাং আমি মনে করি সামরিক ব্যয় কমানোর মুভমেন্টটা চুক্তি আকারে, বৃহৎ শক্তিগুলোর তরফ থেকে প্রথম শুরু হওয়া উচিত। যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যে উদ্যোগ গ্রহণ শুরু করছে। রাশিয়াও করেছে। আঞ্চলিক শক্তিগুলো যেগুলো ডমিন্যান্ট, যেমন-দক্ষিণ আমেরিকা, ব্রাজিল এবং আর্জেন্টিনা, এশিয়ায় ভারত এবং চীন যদি পদক্ষেপ না নেয় তাহলে অন্যরা তা নেবে না। যেমন ভারত যদি সামরিক ব্যয় বাড়াতেই থাকে, বাংলাদেশও তার নিরাপত্তার জন্য এ ব্যয় বাড়াবে, পাকিস্তানও বাড়াতেই থাকবে। দেশ অনুযায়ী, সামরিক চাহিদা তো বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে।

প্র ॥ আপনি কি মনে করেন না যে, ভারত ও পাকিস্তান পলিটিক্যাল মাইন্ডসেটে ইতিবাচক ভাবনা প্রবেশ করা উচিত কিংবা মাইন্ডসেটে এক ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তন আনা জরুরি?

www.pathagar.com

উ ॥ মাইন্ডসেটে পরিবর্তন আনা কঠিন। কারণ সামাজিক পরিবর্তনের ইতিহাস পড়লেই, আপনি দেখতে পাবেন, পলিটিক্যাল মাইন্ডসেটে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের আইডিয়া এসে সম্পৃক্ত হয়েছে। এই যে আন্তর্জাতিকতাবাদের আইডিয়াটা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে প্রবল হয়ে উঠেছিল, সেটা আবার জাতীয়তাবাদের উত্থানে ধীরে ধীরে অপসৃত হতে লাগলো। বিশেষত মার্কিন-সোভিয়েত দ্বন্দ্বের ফলে ঔপনিবেশিক দেশগুলোতে, সেগুলো এখন স্বাধীন, সার্বভৌম, জাতীয়তাবাদ একটি ইতিবাদী ধারণা দিতে সক্ষম হয়েছিল এবং সেটি হলো অভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষা। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে যেমন ধরুন কাশ্মির যুদ্ধ, শ্রীলঙ্কার গৃহযুদ্ধ, কঙ্গো, কিংবা দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রসমূহের সংঘাত–এগুলোকে ঠিক এড়ানো যাচ্ছে না। পরস্পরের প্রতি ঘৃণা আর সংঘাত হচ্ছে বাস্তবতা। এই সংঘাত দূর করা না গেলে, এসব দেশের আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া কখনোই সফল হতে পারবে না। যদিও এসব দেশের সাধারণ জনগণ ও এলিটদের কাছে এই আধুনিকীকরণ অত্যন্ত কাঙ্ক্ষিত বিষয়। এ জন্য আমি মনে করি সমাজের এলিটদেরকে তাদের ভূমিকা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সৎ হতে হবে।

প্র ॥ আপনি এলিটদের কর্মকাণ্ডের ওপর জোর দিতে চান। অর্থাৎ তাদের মাইন্ডসেটে একটা পরিবর্তন আসা দরকার।

উ ॥ আপনি ভালো করেই জানেন আমাদের সোসাইটিতে এলিটরা সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে। কি স্টেট, কি সোসাইটি, কি কালচার, এভরিথিং। দে ম্যানিপুলেট ইনফরমেশন, দে চেইঞ্জ দ্যা হিস্ট্রি, দে চেইঞ্জ দ্যা সিলেবাস, এভরিথিং। দক্ষিণ এশিয়ায়, ইন্ডিয়ানরা যদি বলে ইন্ডিয়া একটি হিন্দু রাষ্ট্র, আদভানির দল বিজেপি সেটা করতে চেয়েছিল কিন্তু পারছে না, সেক্ষেত্রে পাকিস্তানও নতুন করে ভাববে, বাংলাদেশও ভাবতে বাধ্য। সুতরাং এলিট লেভেলে একটা বোঝাপড়া হওয়া জরুরি বলে আমার মনে হয়।

প্র ॥ এলিট লেভেলের আন্ডারস্ট্যান্ডিং কমবেশি বিভিন্ন পরিসরে তো হচ্ছে। এর জন্য অন্য কিছুর আবশ্যকতা কি আপনি উপলব্ধি করেন?

উ ॥ এ আন্ডারস্ট্যান্ডিং-কে শক্তিশালী করার জন্য দরকার স্টেটসম্যানশিপ। এটা খুব বেশি আজ আর দেখা যায় না।

প্র ॥ স্টেটসম্যানশিপের অভাবই দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তাকে -

উ ॥ হ্যাঁ। আপনি দেখেন, সবাই যে যার মতো করে 'কন্সটিটুয়েন্সি নার্সিং' করছে। এটোমিক ডিভাইস টেস্টের কথাই ধরেন না কেন। এটা ভারত না করলেও পারতো। ডিভাইস টেস্টের মাধ্যমে মনে করা হলো, সরকারের প্রেস্টিজ বেড়ে গেলো, সাপোর্ট বেড়ে গেলো। সুতরাং ভারত যখন এই টেস্ট করলো, পাকিস্তান তো আর বসে থাকতে পারে না। মোট কথা হচ্ছে, ইন্টারনাল কনজাম্পশনের উর্ধ্বে উঠে একটা বড় ধরনের, মহান চিন্তা করার মতো স্টেটসম্যানের অভাব প্রতিনিয়তই বেড়ে যাচ্ছে। দু-একজন যে নেই এমনটা নয়। নেলসন ম্যান্ডেলা তো দেখি একজনই। দ্বিতীয় ম্যান্ডেলা তো পাই না। এক সময় দক্ষিণ এশিয়ায় নেহরুকে এ রকম মনে করা হতো, কিন্তু কাশ্মির ডিসপিউটে ব্যাকআউট করার ফলে তাঁর সেই 'মরাল অথরিটি' চলে যায়।

www.pathagar.com

প্র ॥ ১৯৪৮ সালে কাশ্মিরকে কেন্দ্র করে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর -

উ ॥ হ্যাঁ আমি তো এখন এমন কোনো নেতা দেখি না, যে জাতীয় স্বার্থের উর্ধ্বে মানবাধিকারকে গুরুত্ব দেয়। আপনি যাই বলেন না কেন, ন্যাশনাল ইন্টারেস্টকে এখনো স্ট্রিটলি দাম দেওয়া হয়। আন্তর্জাতিকতাবাদ বলে যতো কথা হচ্ছে, কিংবা বিশ্বায়ন বলে যতো স্লোগান দেওয়া হোক, আমার মনে হয়, এটা পশ্চিমী পুঁজিবাদের বিশেষ করে আমেরিকান পুঁজিবাদের একটা সম্প্রসারণ। এ প্রক্রিয়ায় জনগণ 'ইনসিকিউর' থেকে যায়। দারিদ্র্য দূর হয় না।

প্র ॥ দক্ষিণ এশিয়ায় রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছে জরুরি কে? সামরিক বাহিনী, অস্ত্রভাণ্ডার নাকি গণমানুষ?

উ ॥ এ ক্ষেত্রে একটি গ্যাপ আমাদের কাছে স্পষ্ট। আপনি জানেন যে, আমাদের রাজনীতিবিদদের কথা ও কাজের মধ্যে বিরাট ফারাক। দক্ষিণ এশিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। অমর্ত্য সেন দারিদ্র্যের ওপর গবেষণা করে নোবেল পুরস্কার পেলেন। যদি তার তত্ত্ব সঠিক হয়, তো এটা ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের নেতৃত্বের মুখে বিরাট চপেটাঘাত। এলিটরা দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য কিছুই করতে পারছে না। এরা মুখে বলেন এক কথা, কাজ করেন আরেকটা; জাতীয় পরিসরে যখন আমলারা কনফারেন্স-এ বসেন তখন কেউ কিন্তু নিজের স্বার্থ গৌন করে দেখেন না। সবার কাছে যার যার স্বার্থ মুখ্য। আন্তর্জাতিক পরিসরে যান–একই বিষয় দেখবেন। প্র্যাকটিশনাররা কিংবা ডিপ্লোম্যাটরা ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স টেবিলে যেকোনো ইস্যুর ক্ষেত্রে এভাবেই বলে : Bangladesh's interest first then, India's interest first then, England's interest first then, US interest first then কেউ বলে না যে আমি বৈশ্বিক স্বার্থে কথা বলছি। জাতীয় স্বার্থ একটু এদিক-ওদিক হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলেই, স্ব-স্ব কর্তৃপক্ষ তা প্রত্যাহার করে।

ল্যান্ড মাইনের কথাই ধরেন। সবাই তো ল্যান্ড মাইনের বিরুদ্ধে। যেহেতু এর কারণে নিজেদের জনগোষ্ঠীর ক্ষতি হয়, সেহেতু ল্যান্ড মাইন ধ্বংস করতে সবাই রাজি। রাজি না কারা? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, উত্তর কোরিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া। তার কারণ ওরা যে যুদ্ধ করে তার সুবিধার জন্য এটা দরকার। সুতরাং তারা ল্যান্ড মাইন ধ্বংসের চুক্তিতে স্বাক্ষর করে না। তাহলে গ্লোবাল ইন্টারেস্ট কোথায়? গণমানুষই বা কোথায়?

প্র ॥ কিছুদিন আগে ট্রাফিক জ্যাম নিয়ন্ত্রণের জন্য সেনা সদস্যদের সাহায্য নেওয়া হয়েছিল। এই সিদ্ধান্তটিকে অনেকে বাঁকা চোখে দেখেছেন। আপনি বিষয়টিকে কিভাবে দেখবেন?

উ ॥ এ বিষয়ে আমার মন্তব্য হলো, সেনা সদস্যরা যতো বাইরে আসে ওরা ততোই সিভিলিয়ানদের দুর্বলতা বুঝতে পারে। অতীতের দৃষ্টান্ত রয়েছে। ট্রাফিক ব্যবস্থার মান উন্নয়নের জন্য সেনা সদস্যদের দিয়ে কয়দিন চলবে? এসব বাদ দিয়ে বরং মানুষের সড়ক জ্ঞান বাড়াতে হবে, ট্রাফিক এডুকেশন দিতে হবে, নাগরিকদের সিভিক এডুকেশনের মাধ্যমে সিভিক সেন্স দিতে হবে। আর্মি দিয়ে আপনি কতোদিন ট্রাফিক

www.pathagar.com

সিস্টেম ঠিক রাখতে পারবেন? আমাদের দেশে কেউ ট্রাফিক সিগন্যাল মানে না। এই সিভিক সেন্স না থাকলে যানজট কমবে কিভাবে? জাপান তো অতি জনবহুল দেশ, কিন্তু সবকিছুই সেখানে ভালোভাবে চলছে। যে যার মতো লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট নিচ্ছে, কেউ কাউকে ঘুষি মারছে না। মোটকথা বড় জিনিস হচ্ছে দেশপ্রেম। আবার সে জন্য জাতীয়তাবাদকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এ কাজটা করলে বাংলাদেশের ক্ষতি হবে, অতএব আমি এটা করবো না। এ বোধ তৈরি করতে হবে।

আমাদের দরকার
দেশপ্রেমিক এলিট

প্র ॥ সিভিক সেন্স নিয়েও তো প্রশ্ন করা যেতে পারে?

উ ॥ এটাও নির্ভর করে নেতৃত্বের ওপরে। কারণ প্রধানমন্ত্রী নিজে যদি ঘুষ না খান, অন্যান্য মন্ত্রীও খাবে না। এই সেট-আপটা বা আদর্শটা আসতে হবে উপর থেকে, রাজনৈতিক নেতৃত্ব থেকে। আমার কি মনে হয় জানেন, আমাদের দরকার একদল দেশপ্রেমিক এলিট। যারা নিজেদের স্বার্থকে, সন্তুষ্টিকে তোয়াক্কা না করে ভবিষ্যতের জন্য নিজেদের উৎসর্গ করবে। এরকম ডেডিকেশন ছাড়া কোনো দেশেই উন্নতি সম্ভব হয়নি।

প্র ॥ ডেডিকেটেড এলিট খুবই জরুরি আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে। আমাদের এলিটরা কি ডেডিকেটেড নয়?

উ ॥ ডেডিকেটেড এলিট তৈরি করতে হলে এলিটদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন। মিথস্ক্রিয়া বেশি হওয়া জরুরি। যেমন- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং বিরোধী দলীয় নেত্রী খালেদা জিয়া পরস্পর আলোচনা করে দেশের সমস্যাগুলো নির্ধারণ করতে পারেন। প্রচার মাধ্যমে এ খবরগুলো আসতে হবে এমনটিও নয়। জাতীয় স্বার্থের ব্যাপারে তারা মুখোমুখি হয়ে, একে অপরের দেশপ্রেমকে শ্রদ্ধা জানাতে পারেন। জাতীয় স্বার্থকে উভয়ে দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে তুলে ধরতে পারেন। এভাবে একটা ডেডিকেটেড এলিট তৈরি করা গেলে দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব। অনেক স্থবিরতা কাটানো সম্ভব। শেখ হাসিনা কিংবা খালেদা জিয়ার এখন আর কি না পাওয়ার আছে? কিন্তু জাতিকে দেওয়ার তো অনেক কিছুই আছে।

প্র ॥ জাতীয় সংসদে বিরোধীদলীয় নেত্রী খালেদা জিয়া সেনানিবাসে বসবাস করেন। একজন সিভিলিয়ান লিডারের সেনানিবাসে বসবাস করাটা কতোখানি যুক্তিসঙ্গত?

উ ॥ এ ব্যাপারে প্রথমেই আমি যেটা বলতে চাই, সেটা হলো, জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর দেশব্যাপী কিন্তু শোকের ছায়া নেমে আসে। কারণ যাই হোক, এটা একটা ঐতিহাসিক সত্য। ওই সময় দেখা গেলো, বসবাস করার মতো কোনো বাড়ি জিয়া পরিবারের ছিল না। সেনানিবাসের বাড়িটি সংসদের সম্মতিক্রমে জিয়া পরিবারকে দেওয়া হয়। তখন সংসদে আওয়ামী লীগের ৩৯ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু

www.pathagar.com

এখন আওয়ামী লীগের ধারণা হলো, খালেদা জিয়া সেনানিবাসে সেনাবাহিনীর সদস্যদের নিয়ে রাজনীতি করেন। আমি মনে করি, আর্মি আর রাজনীতিতে আগ্রহী নয়। তারা কখনো আর পলিটিক্যাল পাওয়ারে আসতে চাইবে না। কারণ তারা জানে, এতে অনেক রক্তক্ষয় হয়। তা ছাড়া বর্তমানে তারা যা চাচ্ছে, তা তো পাচ্ছে। সুতরাং, তাদের কোনো ক্ষোভ নেই। আর এখন তো দুই নেত্রীর কাছে ফার্স্ট প্রায়োরিটি হলো 'ডিমান্ড অফ দ্যা আর্মি।' সুতরাং, আমার যা মনে হয়, খালেদা জিয়ার সেনানিবাসের বাসাটি নিয়ে আওয়ামী লীগ রাজনীতির মাঠ গরম করতে চায়।

প্র ॥ ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারিতে বাকশালের বিলটি সংসদে যখন পাস হয় তখন আপনি দর্শক গ্যালারিতে ছিলেন। বাকশাল গঠন নিয়ে আপনি গবেষণাও করেছেন। এর ইতিবৃত্ত কি?

উ ॥ এখন যেমন হচ্ছে, ঠিক তেমনি, ১৯৭৫ সালে বুদ্ধিজীবীরা আওয়ামী লীগের ঘাড়ে চেপেছিল। আওয়ামী লীগ যা বলে, তার চেয়ে বেশি বলে এরা। বেশি প্রগতিশীল, বেশি ধর্মনিরপেক্ষ। হাসিনা যা বলে, তার চেয়ে তিনগুণ বেশি বলে তার চেলারা। আওয়ামী কবি, অধ্যাপকেরা। এরা তো হাসিনা যতোটুকু সেক্যুলার না, তাঁরা তার চেয়ে বেশি। বুদ্ধিজীবীরা তখন মুজিবের ঘাড়ে চেপেছিল। তখন মুজিবের আরেকটা রিয়াল প্রবলেম ছিল, জাসদের সন্ত্রাসী ভূমিকা নিয়ে, আর্মিকে নিয়েও সমস্যা ছিল। রক্ষীবাহিনী দিয়েও কাজ হয়নি। মারামারি চলতেই থাকে। সংক্ষেপে বলা যায়, বাকশাল গঠনে প্রথমত মস্কো ইনটেলেকচুয়ালদের প্রভাব ছিল মুজিবের ওপর, দ্বিতীয়ত: শেখ মুজিব মনে করেছিল দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারি কি না বাকশাল গঠনের মধ্য দিয়ে।

বাকশাল গঠনে শান্তি প্রতিষ্ঠার ফ্যাক্টরও ছিল

প্র ॥ বাকশাল গঠনের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠাই যদি বঙ্গবন্ধুর লক্ষ্য ছিল তাহলে নিশ্চয় এটিকে তার নেতৃত্বের ইতিবাচক দিক হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। আপনি কি বলেন?

উ ॥ হ্যাঁ। বাকশাল গঠন মুজিবের নেতৃত্বের একটি ইতিবাচক দিক। তবে এর পেছনে আরো একটি ফ্যাক্টর ছিল, সেটি হলো ক্ষমতাকে ধরে রাখা। মস্কোপন্থী বুদ্ধিজীবীদের প্রভাব, শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং ক্ষমতা ধরে রাখা- এই তিনটি 'কুইক ফ্যাক্টর' এক হওয়াতে বাকশাল তৈরি হয়। স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে, সিরাজুল আলম খান, রব, জলিল এরা জাসদ গঠন করে আক্রমণাত্মক বক্তৃতা দিত। চরম বামপন্থীদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড দেশের আইনকানুন অনেকটা শিথিল করে ফেলেছিল। ফলে মুজিবের কাছে অবশ্যকরণীয় ছিল, শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা। মস্কোপন্থী বুদ্ধিজীবীরা

www.pathagar.com

তখন সমাজতন্ত্র, একদলীয় শাসন ইত্যাদি থিওরি মুজিবকে দিত। ওদের একটা প্রভাব তো মুজিবের ওপর ছিল।

প্র ॥ জাসদ গঠন এবং এর নেতৃত্বকে কিভাবে মূল্যায়ন করবেন?

উ ॥ একদিকে সমাজতন্ত্র ও শ্রেণীহীন সেনাবাহিনী গঠন করবে, এমন প্রত্যয় নিয়ে জাসদ গঠন করেছিল ওরা। সব ননসেন্স। আত্মম্ভরী। সিরাজুল আলম খান ছিল জাসদের নেতা। কতোগুলো বিশৃঙ্খল বাংলাদেশী, যাদের সবার হাতে অস্ত্র ছিল এবং সবাই নিজেদের মুক্তিযোদ্ধা বলে দাবি করতো তারা একত্র হয়ে জাসদ গঠন করেছিল। জাসদের সবাই ক্ষমতার অংশ পাওয়ার জন্য, এমন একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল যে, সে সময় মুজিব না থেকে অন্য কেউ থাকলে 'খবর' ছিল। জাসদ বিপ্লব করলো, ক্ষমতা গেলো জিয়াউর রহমানের হাতে। তার কারণ, জনগণকে নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা তাদের ছিল না। অজ্ঞতার কারণে, লিডারশিপ কোয়ালিটির ঘাটতির কারণে। তারা যে মার্কসবাদ প্রচার করতো, তারা নিজেরাই সেটা বুঝতো না।

জাসদের সন্ত্রাস বন্ধে মুজিব রক্ষাবাহিনী গঠনে বাধ্য হন

স্বাধীনতা যুদ্ধের পর বিশৃঙ্খলা থাকা স্বাভাবিক, তার ওপরে যদি জাসদের মতো একটি দল গড়ে ওঠে, যারা গ্রামে গ্রামে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালাতে থাকে, তখন তো শেখ মুজিব রক্ষীবাহিনী গঠন করতে বাধ্য হয়েছিল। মুজিবের আইডিয়া ছিল রক্ষীবাহিনী দিয়ে জাসদের গুণ্ডাদের পিটাবে। অন্যদিকে স্বাধীনতার পরে, আওয়ামীদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, লোভ, প্রাপ্তির ইচ্ছা এতো বেড়ে গিয়েছিল যে, রক্ষীবাহিনীকে ওরা নিজেদের বৈষয়িক লাভে ব্যবহার করেছে। ফরাসি বিপ্লবের পর একনায়কত্ব এসেছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ তো সশস্ত্র বিপ্লব, সুতরাং এর পরে একনায়কত্ব আসা স্বাভাবিক। এটাই নিয়ম। মুজিব আসলে চেয়েছিলেন, একটা সাংবিধানিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশকে পৃথক করতে। এটা আমার ব্যাখ্যা। তিনি মনে করেছিলেন, ছয় দফা ভাঙতে ভাঙতে কোনো এক মুহূর্তে একদফা হতে পারে। তিনি তো লেনিন ছিলেন না, মাও সে-তুংও ছিলেন না। তিনি ছিলেন সাংবিধানিক রাজনীতিবিদ।

প্র ॥ জিয়ার আমলে শাসন ব্যবস্থা সামরিকীকরণের প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়। এরশাদের পর এখন বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধেও একই অভিযোগ উঠেছে।

উ ॥ আসলে যে কোনো সরকারই চায়, আর্মিকে সন্তুষ্ট রাখতে। যে কারণেই হোক, হাসিনাও তাই চায়।

প্র ॥ বিএনপির অভিযোগ বিশেষ ক্ষমতা আইনের আওতায় বিএনপির ৭ হাজার নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তারা এদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহারের কথা বলছে কিন্তু বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিলের দাবি তুলছে না।

www.pathagar.com

উ ॥ বাংলাদেশে, যখন যে সরকারই আসুক না কেন, তারা এসে সমস্যার ব্যাপকতা দেখে এবং অপজিশনের কাছে ক্ষমতা হারাবে ভেবে স্বৈরমানসিক হয়। সবার ক্ষেত্রে এ কথা সত্য। আর যে কোনো স্বৈর শাসকেরই অন্যতম রক্ষাকবচ হলো, বিশেষ ক্ষমতা আইন।

প্র ॥ নয়া উপজেলা পরিষদ আইনে সরকার হাতে পরিষদ বাতিলের বিধান রাখা হয়েছে। এটা কি ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের চেতনার পরিপন্থী নয়?

উ ॥ আওয়ামী লীগ এমনভাবে পাওয়ার সিস্টেম তৈরি করছে যেন সবকিছু ধরে রাখতে পারে। আসলে বিকেন্দ্রীকরণের প্রকৃত স্পিরিট অনুসারে, জনগণের ক্ষমতায়ন হওয়া উচিত মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু এক্ষেত্রে মূল উদ্দেশ্য সরকারের স্বার্থে 'পাওয়ার সিস্টেম' তৈরি করা। আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে আমার অন্যতম অভিযোগ, তারা ভবিষ্যৎকে বুঝতে পারে না। তারা নিকট ভবিষ্যৎকে বড় করে দেখে। আগামীকাল কিভাবে ক্ষমতা থাকবে, সেটা তাদের কাছে বড়, কিন্তু এর ফল কি হতে পারে সেটা তারা ভাবতে চায় না।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণা অর্থহীন

প্র ॥ উপজেলা নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠানে বিরোধী দলের দাবি কতটুকু যুক্তিসম্মত?

উ ॥ এখানে সমস্যা হলো তত্ত্বাবধায়ক সরকার। কারণ তত্ত্বাবধায়ক সরকার মানেই একজন পলিটিশিয়ান অপরজনকে বিশ্বাস করে না, একজন অপরজনকে আস্থায় আনতে পারে না। তাই একজন দেবতাকে এনে বসাও! পলিটিশিয়ানরা নিজেরা যদি সৎ না হয়, তাহলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার থাকা সত্ত্বেও, নির্বাচনে ব্যালট বাক্স ভাঙা হবে। দৃষ্টান্ত আছে। আমি নিজেও জানি। তত্ত্বাবধায়ক সরকার হলেই যে নির্বাচন সুষ্ঠু হবে এটা ঠিক না। পলিটিশিয়ানদের বুঝতে হবে সৎ না হলে হবে না। 'হারি জিতি নাহি লাজ'-এ ধরনের স্পোর্টসম্যানশিপ স্পিরিট থাকতে হবে। জিততেই হবে-এটা মনে হয় ঠিক নয়।

প্র ॥ আপনি তাহলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কনসেপ্টটি -

উ ॥ অর্থহীন। এটা অবাধ নির্বাচন নিশ্চিত করতে পারে না। প্রধান রাজনৈতিক দল দুটি যদি ঐকমত্যের ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলোতে সিদ্ধান্ত নিতে না পারে, তবে নির্বাচনই শুধু অবাধ হবে না, আরো অনেক কিছুই হবে না। আগামী সাধারণ নির্বাচন সম্পর্কে, একটি আগাম মন্তব্য করা যেতে পারে, দুই প্রধান দল সমানভাবে প্রস্তুত থাকবে, আমরা যেটাকে বলি সন্ত্রাসের সাম্য, তত্ত্বাবধায়ক সরকার হলেও সেটা তারা বজায় রাখবে।

www.pathagar.com

প্র ॥ রাজনৈতিক দলগুলো রাজনীতির যে ট্রেন্ড গড়েছে, বিশেষ করে নির্বাচন সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডে, সেখান থেকে বের হওয়ার উপায়?

উ ॥ এই ট্রেন্ড থেকে বের হওয়ার উপায় হলো, আবার একই কথা, পলিটিশিয়ানদের মধ্যে বিশ্বাস তৈরি করা। একটা সৎ রাজনৈতিক শ্রেণী তৈরি করা না গেলে, দেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হবে না। এটা হাসিনাকে বুঝতে হবে। খালেদাকেও বুঝতে হবে।

এনজিও হলো
'শ্যাম্পেন সোস্যালিজম'

প্র ॥ বাংলাদেশে থার্ড সেক্টর ইতিমধ্যে একটি শক্তিশালী সেক্টরে পরিণত হয়েছে। কিভাবে মূল্যায়ন করবেন?

উ ॥ থার্ড সেক্টরের কর্মকাণ্ড হলো দরিদ্রকে দরিদ্র করে রাখার কাজ। থার্ড সেক্টরকে এদেশে শক্তিশালী করার মধ্য দিয়ে, বিদেশীদের প্রভাব বাড়ছে। বিদেশী ষড়যন্ত্রকারীরা বাংলাদেশকে দরিদ্র রাখতে চায়। কোনো এনজিও আপনাকে চল্লিশ টাকা ঋণ দিলে তো আপনি ধনী হতে পারছেন না। কোনো রকমে বেঁচে থাকতে পারবেন। এমন ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে দেশ শিল্পোন্নত হয়, যেন এমপ্লয়মেন্ট বাড়ে। একটি গরু কিনে দিলে কি হবে? আমি কি আমার ছেলেমেয়েকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার জন্য পাঠাতে পারবো? কিন্তু আমার লক্ষ্য হলো ছেলেমেয়েকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো। তাহলে আমার দেশের উন্নতি হবে। সুতরাং এনজিও হলো মলমের মতো। কোনো রকমে বেঁচে থাকা। তাই আমার মনে হয়, থার্ড সেক্টর থিওরি দিয়ে কোনো লাভ নেই। আর সিভিল সোসাইটির কথা যদি বলেন, ওটাতো পাশ্চাত্যে বহু আগেই ইন থিওরি এবং ইন প্র্যাকটিস ছিল। এটা নতুন বোতলে পুরাতন মদ। উন্নয়ন হওয়া উচিত রাষ্ট্রের উদ্যোগে, এনজিওর উদ্যোগে নয়। এনজিও হলো 'শ্যাম্পেন সোশ্যালিজম'। থার্ড সেক্টরের হোমড়া-চোমড়ারা অর্থনৈতিক উন্নয়নের তত্ত্ব দিচ্ছেন যে, বাংলাদেশ শিল্পায়নের উপযুক্ত নয়। এরা কোথায় যে এ তত্ত্ব পায়? সব হলো বিভ্রান্তির অর্থনীতি, মেকি অর্থনীতি।

প্র ॥ বাংলাদেশে ২৭ বছর অতিবাহিত হলো। ২৮ বছরে পা দিয়েছে। বাংলাদেশকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেন?

উ ॥ আমি খুবই আশাবাদী মানুষ। আমি স্বপ্ন দেখি যে, জাপানের মতো বাংলাদেশ একটা শিল্পোন্নত শক্তি হতে পারে। বাংলাদেশ একটি উন্নত দেশ হতে পারে। গত ২৭ বছরে যে ভুলত্রুটি করেছি তা আমাদের নেতারা সব ঠিক করে এগিয়ে যেতে পারে। জাপানের কিছু ছিল না। শুধু ২২% ভূখণ্ড নিয়ে জাপান শিল্পোন্নত দেশে পরিণত হয়েছে।

www.pathagar.com

সুতরাং আমাদের মেধা ও বুদ্ধি দিয়ে আমরাও এগিয়ে যেতে পারি। আমাদের প্রত্যেককে দেশ নিয়ে ভাবতে হবে, নেতাদেরও এটার ওপর জোর দিতে হবে। শিক্ষার মাধ্যমে দেশপ্রেমিক জনগণ তৈরি করতে হবে। বাংলাদেশকে বড় করাই বড় কথা। আমি আশাবাদী, বাংলাদেশ অনেক বড় হবে শিক্ষায়, জ্ঞানে, শিল্পে, মহত্ত্বে, সমঝোতায়, সর্বোপরি সামগ্রিক উন্নয়নে।

দৈনিক ভোরের কাগজ, সাক্ষাৎকার, ১৮ ডিসেম্বর ১৯৯৮

www.pathagar.com

১২ নূরুল কাদের ইকোনমিক্স

জ্ঞানীজনের কাছে শুনেছি এবং এখন শিক্ষক হিসেবে ছাত্রদেরকে বলি, 'সময়ের কাজ সময়ে করতে হয় নইলে অনুতপ্ত হতে হয়।' উপরোক্ত শিরোনামের প্রবন্ধটি আমি লিখতে চেয়েছিলাম প্রায় দুই বছর আগে। আমার স্নেহাস্পদ সাংবাদিক মিজানুর রহমান খানকে বলেছিলাম যে, নূরুল কাদের খানের একটা দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নিতে এবং তার জীবনের কার্যাবলীর একটা পূর্ণ বিবরণী তৈরি করতে। মিজানুর রহমান খান চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। আমি তখন ভেবেছিলাম, আমি নিজেই তাঁকে টেলিফোন করে তাঁর দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নিয়ে একটি প্রবন্ধ রচনা করব। কিন্তু এর কিছুদিন পরই জাপানে গবেষণার কাজে চলে যাই। ফলে তাঁর সাক্ষাৎকারটি আর নেওয়া সম্ভব হয়নি। হঠাৎ করে কয়েকদিন আগে তার মৃত্যুর ছোট সংবাদটি একটি দৈনিক কাগজে দেখে অত্যন্ত ব্যথিত হলাম। মনে অনুশোচনা এলো। তাঁর উপর সামান্য একটি লেখা তাঁর জীবিত অবস্থায় লিখতে পারলাম না। আজ তাই অন্তত মরণের পর তাঁর উপর কিছু লেখা একান্ত দরকার বলে অন্তরে তাগিদ অনুভব করলাম।

এখানে বলা উচিত, নূরুল কাদের খানের সঙ্গে আমার তেমন কোনো ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব ছিল না। যখন আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্র তখন নূরুল কাদের খান এম এ শেষ বর্ষের ছাত্র ছিলেন। মিষ্টভাষী ও ভদ্র ব্যবহারের জন্য সুদর্শন এই তরুণ অনেকের কাছেই অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। সেই সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হল নির্বাচনে তিনি সহসভাপতি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ছাত্র ইউনিয়নের প্যানেল থেকে তিনি নির্বাচনে প্রার্থী হন। তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ছাত্রলীগের প্যানেল থেকে একজন। তখন ফজলুল হক হলে ইসলামপন্থী ছাত্রশক্তির সংখ্যা ছিল নিতান্তই কম। ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির সম্পর্ক ছিল বলে আমরা ইসলামপন্থীরা সিদ্ধান্ত নিলাম তার বিরুদ্ধে ভোট দেবার জন্য। যতদূর মনে পড়ে, নূরুল কাদের খান খুব অল্প ভোটে সহসভাপতি নির্বাচিত হতে ব্যর্থ হন। মনে হয়, আমরা ইসলামিস্টরাই তার পরাজয়ের কারণ ছিলাম। তিনি সেটা জানতেন, তবুও যখন দেখা হয়েছে তখনই স্নেহমাখা সুরে বলতেন, 'তালুকদার ভালো আছ তো।'

ছাত্রজীবন শেষে আমরা দু'জন দুই পথে চলে যাই। তিনি সিএসপি হয়ে প্রশাসনিক বিভাগে যোগদান করেন। আমি নানা পথ ঘুরে শেষ পর্যন্ত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে

www.pathagar.com

অধ্যাপনা শুরু করি। তারপর ১৯৭০ সালে তিনি পাবনার ডিসি হন এবং পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে প্রবাসী সরকারের সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করেন। শেখ মুজিব সরকারের সময়েও তিনি সেক্রেটারি পদে কাজ করেন। সংবাদপত্রে পড়েছি তিনি সেসময় পদত্যাগ করে ব্যবসা শুরু করেন। পরবর্তীকালে লোকের কাছে শুনেছি, তিনি অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি হয়ে গেছেন। তবে আমার সঙ্গে একটা দীর্ঘ সময় আর সাক্ষাৎ হয়নি।

প্রায় এক যুগ আগে হঠাৎ তার সঙ্গে একদিন দেখা। আমি আমার স্ত্রীসহ গুলশানে কোনো একটি কাজে যাই। কাজ শেষে একটি ভিডিও ক্যাসেটের দোকানে প্রবেশ করি। এর পেছনে একটা কারণ ছিল। আমরা বুঝতে চেষ্টা করছিলাম গুলশানের অভিজাত এলাকার বাসিন্দারা কোন ধরনের ভিডিও ক্যাসেট পছন্দ করে। ভিডিও দোকানে ঢুকেই দেখি, সেই সুদর্শন নূরুল কাদের খান। তাঁকে দেখেই জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা হলো-'ভাই কেমন আছেন।' কিন্তু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লাম। ভাবলাম, তিনি আজ একজন কোটিপতি ব্যবসায়ী। হয়তো আমাকে চিনতেই পারবেন না। একটু পরেই আশ্চর্য হলাম। তিনি সেই স্বভাবসুলভ স্নেহের সুরে বললেন, 'তালুকদার তুমি এখন কোথায় থাক। কেমন আছ?' উত্তরে বললাম, 'আমি এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আছি।' আমার স্ত্রীকে তার সঙ্গে পরিচয় করে দিলাম এবং বললাম আমার স্ত্রীও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা। তিনি অতি মধুরভাবে হেসে উঠলেন এবং বললেন, তালুকদার আমিও বিয়ে করেছি, খুব সুখে আছি। তোমার স্ত্রীকে নিয়ে আমার বাসায় বেড়াতে আসবে কিন্তু। বললাম, ঠিকানা তো জানি না। তিনি তার একটা কার্ড আমাকে দিলেন। কার্ডে দেখলাম নূরুল কাদের খান, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, দেশ গার্মেন্টিস ইন্ডাস্ট্রি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের নাম। কার্ডটা হাতে নিয়েই ভাবলাম, অবশ্যই তাঁর সঙ্গে একদিন আমি দেখা করব।

পাঠক হয়ত এতক্ষণ মনে করছেন, এই যৎসামান্য পরিচিত ব্যক্তির জন্য কেন এই প্রবন্ধ লিখতে বসেছি। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং আমার Specialization হলো Social change, Modernization এবং Political development এই বিষয়ে পড়াতে গিয়ে বারবার একটি কথা আমার মাথায় এসেছে, এখনো আসছে-দেশে কিভাবে ব্যাপক আধুনিকিকরণ এবং শিল্প বিপ্লব ঘটানো যায়। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে কোন বিশেষ পর্যায়ে take off position-এ যেতে পারে এবং কোন কারণে বেশিরভাগ উন্নয়নশীল দেশ উন্নয়নের মাঝপথে থমকে দাঁড়ায় এবং আর উপরে উঠতে পারে না। অবশ্যই পৃথিবী বিখ্যাত অনেক অর্থনীতিবিদ অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন মডেল তৈরি করে অনেক প্রসিদ্ধ বই লিখেছেন। এসব কিছু কিছু বই-এর সঙ্গে আমি পরিচিত। আমাদের দেশের বিখ্যাত অর্থনীতিবিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েই বলছি, আমার মনে হয়, তারা বাংলাদেশের জন্য উপযুক্ত মডেল তৈরিতে এখনো তেমন সফল হননি। সেদিন গুলশানে নূরুল কাদের খানকে দেখে, আমার মনে হলো, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মডেল আজকে যেন খুঁজে পেলাম। সেই সময়ে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার প্রায় ৭০ ভাগ আসত পোশাক শিল্প থেকে। এই পোশাক শিল্পে প্রায়

www.pathagar.com

দশ লাখ শ্রমিক কাজ করে। কর্মচারীদের মধ্যে অধিকাংশই মহিলা। পাটের বিশ্ব চাহিদা হারানোর পর এই পোশাক শিল্পের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেই বাংলাদেশ টিকে আছে। এই পোশাক শিল্পের প্রতিষ্ঠাতা নূরুল কাদের খান।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে যাদের সামান্য জ্ঞান আছে তারা জানেন যে এই উন্নয়নের জন্য তিনটি জিনিস প্রয়োজন- Employment generation, production এবং export of produced goods for profit earning, ফর্মুলাটা সহজ হলেও, এটা বাস্তবে পরিণত করার জন্য অনেক Entrepreneurship দরকার। এমন একদল লোক দরকার, যারা বুঝতে পারেন, দেশের কোন শিল্পটা কম খরচে নিজের দেশে তৈরি করা যায় এবং কোন কোন দেশে সেই শিল্পের প্রচুর চাহিদা হতে পারে। সেসব দেশ খুঁজে বের করা এবং উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী সেখানে বিক্রয় করার বাজার সৃষ্টি করা। এই কৌশল অবলম্বন করে জাপান অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে (ইউরোপ ও আমেরিকার তুলনায়) ব্যাপক শিল্প বিপ্লব সম্ভব করে তুলেছে এবং প্রথম সারির শিল্পোন্নত দেশ হিসেবে নিজের স্থান করে নিয়েছে। নূরুল কাদের খানের মৌলিক প্রতিভাই ছিল এটা যে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন পোশাক শিল্পই বাংলাদেশের জন্য একটা উপযুক্ত শিল্প। তিনি শুধু বুঝেই ক্ষান্ত হননি, বাস্তবে এই শিল্পকে প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং এই শিল্পের উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রফতানি করে নিজে বিত্তশালী হয়েছেন এবং তার সাফল্য দেখে বেশ কয়েক হাজার পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু শুধু পোশাক শিল্প দিয়েই বাংলাদেশের উন্নতি সম্ভব নয়। আমাদের দেশে গড়ে তোলা export oriented আরো অনেক শিল্প স্থাপন করতে হবে। তাই আজ আমাদের প্রয়োজন শত শত নূরুল কাদের খান, যাদের সৃষ্টিধর্মী চিন্তাধারা বিভিন্ন পথে বিকশিত হয়ে বাংলাদেশকে একটি শিল্পরাষ্ট্রে পরিণত করতে পারে। দুঃখের বিষয় গত বিশ বছরেও পোশাক শিল্পের মতো অন্য কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাই নূরুল কাদেরের মৃত্যুর সংবাদে এদেশের একজন সামান্য সমাজ বিজ্ঞানী হিসেবে আমি অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছি। আরও দুঃখিত হয়েছি, এই দেখে যে, বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নতিতে যার অবদান অতুলনীয় তার মৃত্যুর সংবাদটা এসেছে ছোট পরিসরে-বিজ্ঞাপন আকারে। ইউরোপ, আমেরিকা বা জাপান হলে নূরুল কাদের খানের মতো একজন উন্নয়ন পথিকৃৎ এর মৃত্যু সংবাদ সংবাদপত্রে অন্যতম লিড নিউজ হয়ে আসত।

নূরুল কাদের খান বিশ্ববিখ্যাত হতে পারেননি কিন্তু দেশের 'উন্নতির' জন্য অন্তত দু'জন ব্যক্তি বহির্বিশ্বে নন্দিত এবং পুরস্কৃত হয়েছেন। অবশ্যই আমি গ্রামীণ ব্যাংকের প্রধান প্রফেসর ইউনূস এবং ব্র্যাক প্রধান ফজলে হাসান আবেদের কথা বলছি। গ্রামীণ ব্যাংক অনেক প্রশংসা কুড়িয়েছে, বিশেষ করে বিদেশে। অনেক বিদেশী পত্রপত্রিকা এবং বিশ্ব নেতৃবৃন্দ প্রফেসর ইউনূসকে অর্থনৈতিক উন্নতির পথিকৃৎ হিসেবে মূল্যায়ন করেছেন। যারা গ্রামীণ ব্যাংকের উপর বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা করেছেন তারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, গ্রামীণ ব্যাংক মডেল একটা বিশেষ শ্রেণী (class)কে শুধু কোনোরকমে

www.pathagar.com

বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করতে পারে। এই শ্রেণীটি হলো-দেশের ক্ষুদ্র কৃষক শ্রেণী। গ্রামীণ ব্যাংক মডেলের মধ্যে দিয়ে mass production, mass employment, huge profit generation and reinvestment অর্থাৎ দেশের সত্যিকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। প্রশ্ন হচ্ছে, আধমরা রোগীকে ইনজেকশন দিয়ে কোনোরকমে বাঁচিয়ে রেখে দেশের ব্যাপক উন্নয়ন কিভাবে সম্ভব? ব্র্যাকের কর্মসূচিও প্রায় অনুরূপ। এর শুধু ভালোর দিকটা হলো, আবেদ শিক্ষা বিস্তারে প্রচণ্ড প্রয়াস নিয়েছেন এবং আমাদের সবারই জানা সার্বজনীন এবং diversified technical education ছাড়া দেশের জনগণকে প্রকৃত মানব সম্পদে পরিণত করা যায় না।

তাই নূরুল কাদের খানের মৃত্যু আমাদের কাছে নতুন করে প্রশ্ন রেখেছে। আমাদের উন্নয়নের পথিকৃৎরা, গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে দেখুন, বিশ্ব প্রশস্তি লাভের জন্য তথাকথিত poverty alleviation-এর নামে গ্রামীণ ব্যাংক বা ব্র্যাকের মতো ব্যবস্থা চালু রেখে, দেশের দারিদ্র্য বিমোচন কিছুটা লাঘব হলেও, প্রকৃত অর্থে আর্থিক উন্নয়ন সম্ভব হবে না। আজ সময় এসেছে, নূরুল কাদের খানের মতো সর্বপ্রকার প্রচার থেকে দূরে থেকে মৌলিক চিন্তার মাধ্যমে মরণপণ করে দেশোপযোগী ব্যাপক শিল্প ব্যবস্থা আবিষ্কারে ব্রতী হওয়ার। আমার সামান্য জ্ঞানে মনে হয় নূরুল কাদের খানই আমাদের দেশের উন্নয়নের প্রকৃত পথিকৃৎ। প্রফেসর ইউনূস ও আবেদের সাংগঠনিক অতুলনীয় প্রতিভার প্রশংসা করেও আমি অত্যন্ত বিনীতভাবে বলতে চাই, ইউনূস economics বা ব্র্যাক economics দ্বারা বাংলাদেশকে একটি সত্যিকারের শক্তিশালী, ধনী এবং শিল্পোন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করা যাবে না। আমাদের দরকার নূরুল কাদের economics।

নূরুল কাদের খান জান্নাতবাসী হোন এবং আমরা তার মতো শিল্পসংগঠকের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে শিখি, এই কামনা করেই শেষ করছি।

দৈনিক মুক্তকণ্ঠ ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮

www.pathagar.com

১৩ আমি আমেরিকার সঙ্গে পুরো সামরিক চুক্তির পক্ষে

প্রশ্ন ॥ দেশের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছু বলুন-

উত্তর ॥ আমার কাছে দেশের পরিস্থিতি খুবই ভয়াবহ মনে হয়। মনে হয় এই দেশ সোমালিয়া হয়ে যাবে। সোমালিয়া সিনড্রম।

প্র ॥ কেন সোমালিয়া সিনড্রম- ব্যাখ্যা করবেন? এটা কি পলিটিশিয়ানদের কারণে নাকি অন্য কোনো ফ্যাক্টর এখানে কাজ করছে?

উ ॥ এটা নেশান এজ অ্যা হোল। ইট ইজ ভেরি ডেনজেরাস। ইট ইজ ভেরি মাচ অ্যাডভানটেইজিয়াস ফর ইন্ডিয়া।

প্র ॥ এ জন্য কাকে দায়ী মনে করেন?

উ ॥ মোটামুটি আমার মনে হয় যে, আমাদের যে সামাজিক ভ্যালুগুলো, এগুলো স্বাধীনতার পরে নষ্ট হতে শুরু করে মুজিব আমলেই এবং এরশাদ তা পুরোপুরি নষ্ট করেছে। চুরি করলেও কোনো দোষ নেই, খুন করলেও কোনো দোষ নেই, ঘুষ গ্রহণেও কোনো দোষ নেই, রাষ্ট্রের করণীয় আবার কি? বাংলাদেশ আবার কি? বাংলাদেশ! এতো হবেই। এরকম একটা এটিচুড এদের মধ্যে রয়ে গেছে। যে যেভাবে পারে সেভাবে ধন সম্পদ গুছিয়ে নিচ্ছে।

প্র ॥ সামাজিক ভ্যালু'র ব্যাপারটা পরিষ্কারভাবে বলবেন?

উ ॥ যেমন যাকে তাকে মন্ত্রিত্ব অফার করা। বেচাকেনার রাজনীতি ইত্যাদি।

প্র ॥ কিন্তু পরবর্তীকালে এরশাদ তো কোনো সাজা ছাড়াই জেল থেকে বের হয়ে গেলেন?

উ ॥ এটা ঠিক হয়নি। খুব অন্যায় হয়েছে। অন্তত 'সিমবলিক পানিশমেন্ট' হলেও উচিত ছিল। আওয়ামী লীগও তো বেচাকেনার রাজনীতি করে। ক্ষমতার লোভে এরকম একটা লোক, যে দেশের এতো ক্ষতি করেছে- তার সমর্থনে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করেছে। সেই আওয়ামী লীগ কতটুকু প্যাট্রিয়ট সে নিয়ে অনেক সময় আমার সন্দেহ হয়।

www.pathagar.com

প্র ॥ আওয়ামী লীগ দাবি করেছে পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নে শান্তিচুক্তি করা হয়েছে।

উ ॥ মুখে বলা এক কথা, অ্যানালাইসিস ইজ ডিফারেন্ট। চুক্তির ফলে একটা আলাদা দেশই তো গঠন হয়েছে। সন্তু লারমা যদি বলে যে আমি স্বাধীন, তাকে তো আটক করার মতো শক্তি আগে ছিল এখন নেই। সুতরাং ইট ইজ এ লস্ট কেইস। এই চুক্তিটির পর থেকে আমি এই গভর্নমেন্টের উপর বিরক্ত। আগে মনে করতাম, অনভিজ্ঞ জানে না কিছু না, ফারাক্কা সাইন করেছে, এরশাদকে ছেড়ে দিয়েছে এসবই অনভিজ্ঞতার ফলে। বিভিন্ন কারণে হাসিনা এসবে রাজি হয়েছিল।

প্র ॥ চট্টগ্রাম বন্দর ভারতকে ব্যবহার করতে দেওয়ার যে বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক আছে- এ বিষয়ে আপনার অভিমত কি?

উ ॥ এটাও বাংলাদেশের স্বার্থ বিরোধী। ট্রানজিট-এর মানে কি? ইন্টারন্যাশনাল ট্রানজিট হলো ওয়ান কান্ট্রি টু এনাদার কান্ট্রি। আমরা ট্রানজিট দিতে পারি যদি তারা বার্মা পাঠায়। সোজা কথা হলো ইন্টার-স্টেইট ট্রানজিট হয় না তো। আর এটা অনুন্নত দেশে হয় না। এটা তো ইউরোপ না। ভারতের মূল উদ্দেশ্য হলো বিদ্রোহ অধ্যুষিত আসামকে ধরে রাখা।

প্র ॥ কিন্তু ভারত বলছে, তারা ট্রানজিট ব্যবহারের বিনিময়ে বাংলাদেশকে অর্থ দেবে, বাংলাদেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে-

উ ॥ আরে না, তারা তো বিশ্বব্যাংকের টাকাই শোধ দিতে পারে না। ভারতের এমন দারিদ্র্য। ওরা এখন বলছে ঠিকই কিন্তু বাস্তবে দেবে না। কিন্তু আসলে যা হবে, জনগণ ট্রানজিট প্রতিহত করবে। ট্রানজিট দিলেও তা মুখ থুবড়ে পড়বে।

প্র ॥ এখন ভারত বলছে চট্টগ্রাম বন্দর উন্নয়নের কথা–

উ ॥ ওরা কি উন্নতি করবে? ভারত নিজেই তো একটা সেকেন্ড গ্রেডের টেকনোলজিক্যাল পাওয়ার। আমরা আমেরিকা বা ইউরোপের সাহায্য নেব। আমরা অফার দিলে ওরা আসবে।

প্র ॥ বর্তমানে সোফা চুক্তি নিয়ে নানা আলোচনা আছে। বাংলাদেশের এই ক্ষেত্রে কি করা উচিত?

উ ॥ বাংলাদেশের অবশ্যই উচিত হবে সোফায় স্বাক্ষর করা।

প্র ॥ কেন?

উ ॥ ভারতের একটা বড় শক্তির উপস্থিতিকে কাউন্টার দেওয়ার জন্য। 'সিম্বলিক প্রেজেন্স অব এ বিগ পাওয়ার ইন বাংলাদেশ ইজ এ প্রেট টু ইন্ডিয়া'

প্র ॥ কিন্তু অনেকেই বলছেন সোফা চুক্তি হলে আমেরিকা, অন্য অনেক দেশের মতো বাংলাদেশকেও ধ্বংস করবে?

www.pathagar.com

উ ॥ জাপান কি ধ্বংস হয়েছে। ফিলিপাইন ধ্বংস হয়েছে কারণ ওরা বোকা। ওরা সারাদিন আন্দোলন করেছে। জাপানিরা চালাক, কোরিয়ানরা চালাক, তাইওয়ান চালাক। আমেরিকার সহযোগিতায় এখন তাদের 'হাই স্ট্যান্ডার্ড অব লিভিং'। এখন তো ভিয়েতনামও চালাক হয়েছে।

প্র ॥ কিন্তু সোফা–

উ ॥ আসলে এটা একটা 'বিগিনিং অব আমেরিকান এপ্রোচ টু আস।' তারা আসলে বলছে 'উই ওয়ান্ট টু বি প্রেজেন্ট হিয়ার'। সোফা যদি সামরিক চুক্তি হিসেবেও গণ্য হয় তবুও আমি তো দোষের কিছু দেখি না।

প্র ॥ কিন্তু চীন তো একটা ফ্যাক্টর?

উ ॥ চীন তো চায় ওই চুক্তি হোক–

প্র ॥ কিন্তু চীন ও আমেরিকা তো একটা ফ্যাক্টর এই অঞ্চলের রাজনীতির জন্য–

উ ॥ এই জন্যই তো বললাম, উই শুড বি উইথ চায়না অ্যান্ড আমেরিকা।

প্র ॥ সবার সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখার নিয়ম তো আগে মানা হতো?

উ ॥ না, না জিয়াউর রহমানের সময় যেটা ছিল 'ইনফরমাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং'– পাকিস্তান আর্মি, চাইনিজ আর্মি, বাংলাদেশ আর্মি। এরশাদ সৈন্য বাড়িয়েছে নিজের স্বার্থে। সে জন্যই, হাসিনা ফার্স্ট ওয়েন্ট টু চায়না, যে তারা কি চায়? এখন ভারত নিশ্চয়তা দিচ্ছে। ভারত বলছে তোমাদের কে আক্রমণ করবে? আক্রমণ করলে তো আমরাই করবো।

প্র ॥ কিন্তু এটা কি ফাইনাল গ্যারান্টি?

উ ॥ হাসিনা এটাকেই ফাইনাল গ্যারান্টি মনে করে। পদ্মার পানিচুক্তি, শান্তিচুক্তি এসব তো ওই কারণেই। এসব বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের উপর ভীষণ রকম একটা আঘাত। সুতরাং মধ্যবর্তী নির্বাচনে হাসিনার কমপ্লেক্স আছে। সি ডাজনট ট্রাস্ট এনিবডি।

প্র ॥ নামকরণ নিয়ে দেশে একটা হৈচৈ চলছে–

উ ॥ নাম পরিবর্তন নিয়ে সরকারের যে এত মাতামাতি তার কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। যমুনা সেতু-দ্যাটস দ্যা ন্যাচারাল নেম। অন্য কি নামের দরকার আছে। নামকরণ নিয়ে এত বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়। এই যে ফাদার অব দ্যা ন্যাশন। জাস্ট দু'একবার বলুক! প্রত্যেক সময় বলার কি দরকার। তাদের যখন একটা ইগো আছে দু'একবার বলতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক নিউজ আইটেমে ফাদার অব দ্যা নেশন, প্রত্যেক বক্তৃতায়, প্রত্যেক সেনটেন্সে, ... দে আর ডুয়িং টু মাচ অ্যান্ড দে আর ডুয়িং ডিসসার্ভিস টু শেখ মুজিব। দে আর ডুয়িং ডিসসার্ভিস টু লিবারেশন ওয়ার। দে শুড আন্ডারস্ট্যান্ড মাই ফ্রাঙ্ক এডভাইস দ্যাট দে আর ডেসট্রয়িং মুজিব।

প্র ॥ দেশের এই পরিস্থিতিতে বিরোধী দল তাদের ভূমিকা পালন করতে পারছে কি?

উ ॥ হ্যাঁ, চেষ্টা করছে আর কি? শাসনতান্ত্রিক চৌহদ্দীর মধ্যে এর চেয়ে বেশি আর কি করতে পারে বিএনপি?

www.pathagar.com

প্র ॥ সংসদ থেকে পদত্যাগের যে প্রশ্নটা এই ব্যাপারে কি করা উচিত?

উ ॥ আমার এডভাইস হলো, একটা জরুরি মধ্যবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠান। পদত্যাগের দরকার নেই। নতুন নির্বাচন প্রশ্নে হাসিনার সঙ্গে খালেদার সরাসরি আলোচনা হওয়া উচিত।

প্র ॥ বিরোধী দল যে সংসদ থেকে পদত্যাগের ইস্যুকে সামনে আনতে চাচ্ছে এটা কি ঠিক হচ্ছে? সংসদ থেকে কি কথাগুলো বলা যায় না?

উ ॥ আমার কথা হলো সংসদে থেকে বল, বাইরেও বল।

প্র ॥ বিএনপি'র দুই গ্রুপের যে দ্বন্দ্ব, এটা বিএনপিকে ভবিষ্যতে কোথায় নিয়ে যেতে পারে?

উ ॥ এটা জেনারেলি সব পার্টির মধ্যেই থাকে। বিএনপি আলটিমেটলি ভাঙবে না। দুই গ্রুপকেই খালেদা জিয়ার বোঝানো উচিত যে, তোমরা সংযত হও। ১ বছর বা ২ বছর পর আমরাই তো ক্ষমতায় আসবো।

প্র ॥ আপনি কিভাবে নিশ্চিত যে, বিএনপি ক্ষমতায় আসবে?

উ ॥ সরকার খুব আনপপুলার হয়ে গেলে নির্বাচনে কারচুপিও কিন্তু করা যায় না।

প্র ॥ আমাদের আর্মির ভূমিকা কি মনে হয়?

উ ॥ এই আর্মি কখনই ক্ষমতা দখল করবে বলে মনে হয় না। কারণ পার্শ্ববর্তী দেশের আর্মি হয়তো– কিন্তু বঙ্গবন্ধু মুজিব ওয়াজ সভরেইন। তিনি বাংলাদেশের সঙ্গেই তার পরিচিতি যুক্ত করেছিলেন। আমার চা, আমার পাট, আমার চাল, আমার দেশ, আমার মানুষ আমি সভরেইন। শেষ সময়, শেখ মুজিব প্রো বাংলাদেশী হয়েছিলেন।

প্র ॥ তার অর্থ–

উ ॥ হ্যাঁ ইন্দিরা গান্ধী তো লিখিত অর্ডার দিয়েছিলেন যে, শেখ মুজিবের মৃত্যুর পরে ভারত যেন শান্ত থাকে।

মুজিব জাতির জনক,স্বাধীনতা
ঘোষণা হয়েছিল তাঁর নামেই

প্র ॥ শেখ মুজিবকে জাতির পিতা বলা সম্পর্কে আপনার মত?

উ ॥ 'আমার ব্যক্তিগত মত হচ্ছে- এটা নিয়ে হৈচৈ করার দরকার নেই। এ নিয়ে সময় অনেক নষ্ট করেছি এবং এটা খুবই স্পর্শকাতর বিষয়। ইতিহাসই একদিন রায় দেবে। তবে 'আই অ্যাম রেডি টু কল হিম এজ অ্যা ফাউন্ডিং লিডার অব দ্যা নেশন।' এটা নিয়ে সমঝোতা হোক, এটা নিয়ে আর বাড়াবাড়ি করার দরকার নেই। দেশ বার বার বিভক্ত হচ্ছে, শেখ মুজিবকে 'ফাউন্ডিং লিডার' বলতে তো দোষ নেই, এটা তো কেউ অস্বীকার করে না। বিএনপিও না। মুজিব যেহেতু প্রথম নেতা, প্রথম আন্দোলন

www.pathagar.com

করেছেন সুতরাং তিনি ফাউন্ডিং লিডার, ইট ইজ অ্যা ফ্যাক্ট। আমি তাঁকে বঙ্গবন্ধুও বলতে পারি, শেখ মুজিবও বলতে পারি, ফাদার অব দ্যা নেশন বা জাতির জনকও বলতে পারি এবং এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, স্বাধীনতার ঘোষণা তো হয়েছিল তাঁর নামেই।

প্র ॥ কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী–

উ ॥ এই বুদ্ধিজীবীরা মুজিবকে পিতাও মানে না, কিছুই মানে না। মুজিবকে তারা যা ইচ্ছা করতে পারে, তারা আসলে পয়সা ছাড়া কিছু বোঝে না। এরা ভাইস চ্যান্সেলরশিপ, ডিনশিপ, প্রভোস্টশিপ, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানশিপ - এগুলো কিছু চায়।

প্র ॥ কিন্তু এদের তো একটা আলাদা অবস্থান আছে?

উ ॥ অবস্থান আছে, না থাকলে, অধ্যাপক কবীর চৌধুরী কিভাবে ন্যাশনাল প্রফেসর হলেন? শেক্সপিয়রের দুটি নাটক অনুবাদ করেছেন। আমি মনে করি জাতীয় অধ্যাপক হওয়া উচিত যে কোনো অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্বের।

প্র ॥ রুবেল হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষাপটে আপনার মূল্যায়ন কি?

উ ॥ পুলিশ বাহিনীকে স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে। দে শুড নট বি গাইডেড বাই দি পলিটিশিয়ানস। পলিটিশিয়ানস শুড নট মেক টেলিফোন কলস টু দ্যা পুলিশ ম্যান।

দৈনিক মানবজমিন, সাক্ষাৎকার, ৭ আগস্ট, ১৯৯৮

www.pathagar.com

১৪ জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে মধ্যবর্তী নির্বাচন অপরিহার্য

গত ১২ জুলাই থেকে ২০ জুলাই পর্যন্ত কলোম্বোতে Security Studies Center-এ Future Security of South Asia সেমিনারে যোগদান করে ফিরে এসেই সেদিনের পত্রিকাটা হাতে নিলাম। কলোম্বোতে কদিন যেসব পত্রিকা পড়ার সুযোগ পেয়েছি, তাতে বাংলাদেশ সম্বন্ধে তেমন কোনো সংবাদ দেখিনি। তাই বাংলাদেশের সংবাদের জন্য উদগ্রীব হয়ে বসেছিলাম। কোন পত্রিকায় প্রথম দেখেছি, তা মনে নেই। তবে তার প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম কলামে শিরোনাম দেখলাম, বঙ্গবন্ধু ও তাজউদ্দিনের মধ্যে সম্পর্ক ছিল 'রাম ও ভরতের মতো'। মন্তব্যটি করেছেন, আমাদের দেশের প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীন আহমদ। কলোম্বো সেমিনারে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান ও মালদ্বীপের কয়েকজন অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল, বিশিষ্ট কূটনীতিকবৃন্দ, আন্তর্জাতিক এবং সমরকৌশল বিষয়ে অনেক বিশেষজ্ঞ উপস্থিত ছিলেন। অতি সঙ্গত কারণে সেমিনারের মূল আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে বিজেপি'র হিন্দু জাতীয়তাবাদ এবং অখণ্ড ভারতের মতাদর্শ। সেমিনারে অনেকেই মন্তব্য করেন, ভারতের আণবিক বিস্ফোরণ বিজেপি'র অখণ্ড ভারতস্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করার প্রয়াস মাত্র। অবশ্য সেমিনারে এ বিষয়ে অনেক আলোচনা হয়। সেমিনারের শেষের দিকে আমি স্পষ্ট বুঝতে পারি, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল, মালদ্বীপ এইসব দেশের আন্তর্জাতিক ও সমরনীতি-কৌশল বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ ভারতকে তাদের স্ব স্ব দেশের স্বাধীনতার প্রতি হুমকিস্বরূপ মনে করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে স্বয়ং প্রেসিডেন্ট কর্তৃক শেখ মুজিব-তাজউদ্দিনের সঙ্গে রাম-ভরতের তুলনা করার সংবাদটি আমাকে বিশেষভাবে পীড়িত করলো। বুঝতে পারলাম, বাংলাদেশের ওপর ভারতীয় আগ্রাসন কোন পর্যায়ে এসেছে যে, স্বয়ং প্রেসিডেন্ট নিজেই 'রাম-ভরতের' গল্প শুরু করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে আমার এও মনে হলো, বর্তমান সরকারকে টিকিয়ে রাখা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য মোটেই নিরাপদ নয়। এ সরকারের অবসানের জন্য মধ্যবর্তী নির্বাচন অপরিহার্য।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে আমাদের অনেকেরই জানা আছে, শুধু নির্বাচিত হলেই সরকার গণতান্ত্রিক হয় না। গণতন্ত্রের জন্য অলিখিত কতগুলো শর্ত আছে। জাতীয় নিরাপত্তা সুরক্ষার জন্য কোনো পদক্ষেপ নিতে হলে গণতান্ত্রিক দেশে সরকারপ্রধান

www.pathagar.com

সাধারণত বিরোধীদলীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন। শেখ হাসিনার সরকার বিরোধী দলের সঙ্গে কোনো রকম আলোচনা ছাড়াই বাংলাদেশ-ভারত গঙ্গার পানি চুক্তি সম্পাদন করলো। এর পর পরই বিনা কারণে বিএনপি'র ৪ জন নেতাকে গ্রেফতার করলো। এই গ্রেফতার এত নির্যাতনমূলক ছিল যে, সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশন এই ৪ জন নেতাকে শুধু মুক্তির নির্দেশেই দিলেন না। উপরন্তু সরকারকে মিথ্যা মামলা দায়েরের জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে আদেশ করেন। তখন পর্যন্ত আমার বিশ্বাস ছিল, হাসিনা সরকারের এই অগণতান্ত্রিক কার্যাবলী স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবর্গের শাসনকার্যের পূর্ব অভিজ্ঞতার অভাবে সংঘটিত হয়েছে।

আমি অবশ্য প্রধানমন্ত্রীর দেশপ্রেমকে কখনো সন্দেহ করি না। তবে যেভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি হলো এবং পার্বত্য চট্টগ্রামকে বাংলাদেশের বাকি অংশ থেকে প্রায় বিচ্ছিন্নকরণের অনুকূলে যে আইন প্রণয়ন করা হলো, তাতে আমার এই প্রত্যয় দৃঢ় হতে থাকে যে কোনো কারণেই হোক প্রধানমন্ত্রী ও তার সহকর্মীরা অত্যন্ত নগ্নভাবে ভারতকে সর্বপ্রকার সুবিধা দেওয়ার জন্য সদা উদগ্রীব থাকেন।

ইতিমধ্যে ভারতীয় বিজেপি সরকার দিল্লীতে অনেকটা পাকাপোক্তভাবে ক্ষমতাসীন হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের ওপর নতুন করে আবার ট্রানজিট সুবিধার জন্য এবং চট্টগ্রাম বন্দর ভারতকে ব্যবহার করতে দিতে বাংলাদেশের ওপর নতুন করে চাপ দেওয়া শুরু করেছে। ভারতের পররাষ্ট্র সচিব রঘুনাথ তো স্পষ্ট ভাষায় এসব কথা ঢাকায় বলে গেছেন। কলিকাতা-ঢাকা বাস সার্ভিসও চালু হতে যাচ্ছে। হাসিনা সরকারের ওপর আরো অনেক ধরনের ভারতীয় চাপ আসতে শুরু করবে। অন্যদিকে টেলিভিশন-রেডিওতে ভারতীয় সংস্কৃতির আগ্রাসন তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে।

একথা সর্বজনবিদিত, 'তসবিহ' হাতে নিয়ে মাথায় বড় ঘোমটা দিয়ে 'বিসমিল্লাহ' বলে বক্তৃতা শুরু করে অন্য কথায় ইসলামী জাতীয়তাবাদের আবেদন জানিয়ে শেখ হাসিনার দল ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে সর্বোচ্চ সংখ্যক সংসদীয় আসন পায়। জনগণ অবশ্যই 'জয়বাংলা' নামে এবং 'ধর্মনিরপেক্ষতা' প্রীতির জন্য আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়নি। সুতরাং শেখ হাসিনা সরকার কর্তৃক এখন যে নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, তার জন্য তিনি জনগণের কোনো ম্যান্ডেট পাননি। এখানে আমি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই। এই চুক্তিকে আওয়ামী লীগ ও তার সরকার আয়ারল্যান্ডের শান্তিচুক্তির সঙ্গে তুলনা করে। কিন্তু অভিজ্ঞমহল পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অত্যন্ত অগণতান্ত্রিক ও আয়ারল্যান্ড চুক্তিকে অত্যন্ত গণতান্ত্রিক বলে মনে করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের আগে এর কোনো কপি বিরোধীদলীয় নেত্রীর কাছে পাঠানো হয়েছে বলে আমার জানা নেই। এ ব্যাপারে দেশবাসীকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রাখা হয়েছিল। দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে পরামর্শ তো দূরের কথা, পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য উপজাতীয় প্রতিনিধি বা বাংলাদেশী প্রতিনিধিদের সঙ্গেও আলোচনা করা হয়নি। একমাত্র চাকমা সন্ত্রাসীদের নেতা সন্তু লারমার সঙ্গে তড়িঘড়ি চুক্তি করে এবং সংসদে অগণতান্ত্রিক উপায়ে ৪টি বিল পাস করে দেশের এক-দশমাংশ সন্তু

www.pathagar.com

লারমার হাতে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হলো। অন্যদিকে আয়ারল্যান্ডের চুক্তির জন্য কয়েক বছর ধরে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর মধ্যে আলোচনা হয়েছে। এক পর্যায়ে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন মধ্যস্থতাও করেন। এরপর সকল পক্ষের সমঝোতার মাধ্যমে আয়ারল্যান্ড চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। শুধু তাই নয়, শান্তিচুক্তি সম্পাদনের পরে এই চুক্তির ওপর গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। এতে উত্তর আয়ারল্যান্ডে চুক্তির পক্ষে ৭০% এবং আইরিশ রিপাবলিকে ৯০% ভোট চুক্তির পক্ষে পড়ে। তাই পার্বত্য চুক্তি প্রণয়নের সঙ্গে আইরিশ শান্তিচুক্তির তুলনা সম্পূর্ণ ধোঁকাবাজি। একথা স্পষ্ট যে, ভারতীয় বিজেপি সরকার বাংলাদেশকে অধিকতর ভারতীয়করণের চেষ্টা চালাতে থাকবে। আমার ভয় হয়, শেখ হাসিনা তা প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হবেন। সুতরাং হাসিনা সরকারের উচিত হবে, জনগণের কাছে থেকে নতুন করে ম্যান্ডেট নেওয়া। এর জন্যই দেশের সর্বস্তরের জনগণ দাবি করছে শীঘ্র মধ্যবর্তী নির্বাচন দেওয়া হোক।

অবশ্য বর্তমান বন্যার জন্য অনতিবিলম্বে মধ্যবর্তী নির্বাচন কিছুটা বিলম্বিত করতে হবে। অক্টোবর-নভেম্বরের শুকনো মৌসুম শুরু হওয়া না পর্যন্ত নির্বাচন অনুষ্ঠান করা সম্ভব নয়। আমার মতে, এই আগামী কয়েক মাস জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোনো কাজ বা চুক্তি সম্পাদন থেকে হাসিনা সরকারের বিরত থাকা উচিত। জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থেই শুকনো মৌসুম আসার সঙ্গে সঙ্গে শাসনতান্ত্রিক বিধান মতে কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে মধ্যবর্তী নির্বাচনের ব্যবস্থা করা অতীব জরুরি। আমি আশা করি, প্রধানমন্ত্রী অন্তত আমার এই বক্তব্যকে একটু গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করবেন।

দৈনিক ইনকিলাব ২৯ জুলাই ১৯৯৮

www.pathagar.com

১৫ আওয়ামীলীগ গণতান্ত্রিক ভাবে শাসনকার্য পরিচালনায় চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে

প্রশ্ন ॥ গণতান্ত্রিক শাসনে একটি শাসক দলের কিংবা একটি দলীয় সরকারের সাফল্য ও ব্যর্থতার মূল মাপকাঠি কি হওয়া উচিত।

উত্তর ॥ গণতান্ত্রিক শাসনে একটি শাসক দল বা দলীয় সরকারের সাফল্য ও ব্যর্থতার মাপকাঠি দুটি। প্রথমত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষা করা এবং দ্বিতীয়ত সরকারের ফলপ্রসূ কার্য সম্পাদন (Effective Performance of the Government)। একটি সরকার নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় এলেই সে সরকারকে গণতান্ত্রিক সরকার বলা যায় না। সরকার তার শাসনামলে গণতন্ত্রের প্রতি কতটুকু সম্মান দেখিয়েছে বা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ কতটুকু রক্ষা করে চলেছে তা দেখতে হবে। অন্যের মতামতকে সম্মান দেওয়া, জনগণকে আস্থায় এনে কাজ করা, দল বা ব্যক্তির চেয়ে দেশের স্বার্থকে বড় করে দেখা, এসবের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সংরক্ষিত হয়ে থাকে। কিন্তু ক্ষমতায় এসে বিরোধী দলকে কথা বলার সুযোগ না দেওয়া, বিরোধী দলকে দমিয়ে রাখতে চেষ্টা করা, বিনা বিচারে আটকে রাখা, সবকিছু দলীয়করণ করতে চেষ্টা করা, পরমতে অসহিষ্ণু হওয়া বা ফ্যাসিস্টসুলভ আচরণ করা প্রভৃতি কারণে কেবল গণতান্ত্রিক মূল্যবোধই ক্ষুণ্ন হয় না, দলটির ক্ষমতায় আসার বৈধতাও নষ্ট হয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত সরকার কি কাজ করছে তা দেখতে হবে। শুধু ফাঁকা বুলি আওড়ালে চলবে না। আমরা এটা করতে চাই, ওটা করতে চাই, এসব না বলে সরকারকে কাজ করে দেখাতে হবে। দেশের উন্নয়নে সরকার কতটুকু প্রকৃত অবদান রাখতে পেরেছে তা দেখার বিষয়। শুধু উদ্বোধন-নামকরণ করলেই চলবে না। কোন সরকারের আমলে অবকাঠামো উন্নয়ন কি হয়েছে, অর্থনীতি কতটুকু সচল হয়েছে, আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নতি কতটুকু হয়েছে সর্বোপরি দেশের মানুষ আগের চেয়ে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারছে কি না, এসব হচ্ছে কোনো সরকারের সাফল্য ও ব্যর্থতার মাপকাঠি।

বর্তমান সরকারের সাফল্য ও ব্যর্থতার প্রশ্নে আসলে দু'ভাবেই তারা ব্যর্থ। তবে তারা এই দু'বছর ধরে যে সরকার কাঠামো বজায় রাখতে পেরেছে এবং দেশকে যে এখনো চরম নৈরাজ্যের মধ্যে ডুবিয়ে দেয়নি, এটাই সাফল্য বলা যায়। বর্তমান সরকার

www.pathagar.com

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সমুন্নত রেখে শাসনকার্য চালিয়ে যেতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এই সরকারের বিগত দু'বছরের শাসনামলে দেখা যায় অত্যাচার, নির্যাতনের মাত্রা বেড়েছে। ফ্যাসিস্টসুলভ আচরণের মাধ্যমে সরকার পরিচালনার একটি প্রবণতাও দেখা যায়। সর্বত্র দলীয়করণ চলছে। কাজের কাজ বাদ দিয়ে শুধু ফাঁকা বুলি ছাড়া হচ্ছে। আর যা হচ্ছে তা হলো বঙ্গবন্ধুর স্লোগান।

প্র ॥ আওয়ামী লীগের প্রথম শাসনামলের সঙ্গে বর্তমানের কি মিল খুঁজে পাচ্ছেন?

উ ॥ ৭৫-এর পটপরিবর্তনের মাত্র কয়েক মাস আগে সে সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ ও Disparity Theory'-র প্রথম প্রবক্তা, ঢাকা ইউনিভার্সিটির তৎকালীন এস এম হলের প্রভোস্ট ড. মাজহারুল হক বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করার সময় এক আবেগময় ভাষণে বলেছিলেন, দেশের সর্বত্র বিশৃংখলা, বিপর্যস্ত অর্থনীতি, পরিকল্পনাহীন দেশ পরিচালনা, এসবের মাঝে মুজিববাদ প্রতিষ্ঠার অর্থহীন স্লোগান দুর্যোগের অশনি সংকেত বলে মনে হচ্ছে। আজকে দেশে প্রায় অনুরূপ অবস্থা বিরাজ করলেও শাসক দল শুধু বঙ্গবন্ধুকে প্রতিষ্ঠা করার স্লোগান দিয়ে যাচ্ছে। তাদের এই স্লোগানসর্বস্ব রাজনীতি দেশকে আবারো ভয়াবহ পরিণতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

বর্তমান সরকারের লোকদের মধ্যে স্টেটসম্যানসুলভ গুণের উপস্থিতি বিন্দুমাত্রও নেই। আবার দেশ রক্ষার রাজনীতিও তাদের মধ্যে নেই। যে কোনোভাবে ক্ষমতায় এসে ক্ষমতায় টিকে থাকাই দলটির উদ্দেশ্য। জনগণ বা দেশের ভবিষ্যৎ যেন-তাদের দেখার বিষয় নয়। ইতিহাসে আমরা যাদের সত্যিকার দেশপ্রেমিক বা স্টেটসম্যান বলে থাকি, যেমন দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট বা বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল, তাদের দিকে তাকালে দেখবো তারা দেশের সুদূরপ্রসারী মঙ্গলের জন্য স্বপ্ন দেখেছেন। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে সকল প্রচেষ্টা নিয়োজিত করেছেন। ক্ষমতার মসনদে বসে ক্ষমতা দিয়ে সবকিছু করতে চাননি তারা। কোনো কাজের আগে, তারা তা জনগণকে সঙ্গে নিয়ে, জনগণকে আস্থায় এনে তবেই কাজটি করেছেন। হিটলারের মতো নির্দেশ দিয়ে, শুধু নির্দেশ পালন হচ্ছে কি না তা তারা দেখেননি। কোনো নির্দেশ দেবার আগে বিষয়টির ভালোমন্দ সম্পর্কে জনগণকে তারা বুঝিয়েছেন। কারণ তারা জানতেন, জনগণের মধ্যে আস্থা সৃষ্টি করতে না পারলে বিপর্যয় অনিবার্য। অথচ আজ আমরা এর সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র দেখতে পাচ্ছি। বর্তমান সরকার ব্যক্তি বা দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে উঠতে পারছে না। ফলে দেশে আজ বিপর্যয়ের অশনি সংকেত বেজে উঠছে। তৃতীয় বিশ্বের যেসব দেশ আজ অর্থনৈতিক পরাশক্তি, তাদের দিকে তাকালে দেখবো যে তারা উন্নত হয়েছে দেশপ্রেমের সমৃদ্ধ গঠনমূলক জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে। হিটলার বা মুসোলিনির মতো ধ্বংসাত্মক জাতীয়তাবাদ দিয়ে

www.pathagar.com

নয়। জাপানের দিকে তাকালে দেখবো সেখানে গঠনমূলক জাতীয়তাবাদ উন্নতির প্রধান চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। প্রতিটি জাপানি নিজের কোনো কাজকে জাপানের বা দেশের কাজ বলে মনে করে। যার জন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসস্তূপ থেকে তুলে তারা দেশকে আজ উন্নতি ও সাফল্যের চরম শিখরে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। আমাদের দেশে ওইরকম দেশপ্রেম চেতনার অভাব রয়েছে। আমরা বাংলাদেশের নাগরিক। এ দেশ আমাদের মাতৃভূমি। এর উন্নতি আমাদের সবার উন্নতি। আমরা সবাই যদি গঠনমূলক বাংলাদেশী জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করে যেতে পারি, তবেই দেশের মঙ্গল হবে।

দৈনিক সংগ্রাম ২৬ জুন ১৯৯৮
সাক্ষাৎকার গ্রহণ : মাসুম বিল্লাহ

www.pathagar.com

১৬ বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

'ইনকিলাবের' দ্বাদশ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে মূল কথাগুলো বলার আগেই একটি ঘটনার কথা মনে পড়লো। 'ইত্তেফাক' তখন সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল। এর সম্পাদক মানিক মিয়া। তাঁর নিজস্ব এবং আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার সমর্থনে অনেক জোরালো প্রবন্ধ লেখেন। সে সময় করাচি থেকে প্রকাশিত 'DAWN' পত্রিকায় একটি লেখা বেরিয়েছিল। লেখাটির মূল বক্তব্য ছিল, মানিক মিয়া বাংলাভাষার জন্য যে দাবি তুলে ধরছেন, তাতে তাকে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে-বাংলাভাষা যে কত দুর্বল মানিক মিয়া কি তা জানেন? 'ইত্তেফাক' কি বাংলা শব্দ? এটা তো আরবি শব্দ। সে প্রবন্ধ পড়ে মনে হয়েছিল, আসলে প্রবন্ধকার কতটা নির্বোধ!

'DAWN' ইংরেজি পত্রিকা। ইংরেজি পৃথিবীর অন্যতম, কেউ কেউ বলে শ্রেষ্ঠতম ভাষা। মানুষের চিন্তার প্রকাশ বাহন হিসেবে ইংরেজি ভাষার মাধুর্য ও আকর্ষণ অতুলনীয়। এই সেদিনও দেখলাম, ভারতীয় একজন লেখক লিখেছেন- ইংরেজি একটি Bastard language'। পৃথিবীর অন্য সকল ভাষা থেকে যত মধুময়, ছন্দময় এবং সাবলীল শব্দগুলো চুরি করে নিয়ে ইংরেজি ভাষা নিজেকে অপূর্ব, ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে তুলেছে; একইভাবে বাংলাভাষা অন্যান্য ভাষার বিভিন্ন শব্দে নিজকে অধিকতর শক্তিশালী ও বাঙময় করে তুলেছে। 'ইত্তেফাক' বাংলাভাষার এমনই একটি শব্দ। আমাদের দেশের অনেক বুদ্ধিজীবী ইনকিলাব শুনেই বলে ফেলবেন–এটা তো রাজাকারের ভাষা। কিন্তু আমার কাছে মনে হয় বিপ্লব, Revolution এবং ইনকিলাব-এ তিনটি শব্দের মধ্যে ইনকিলাব খুবই শ্রুতিমধুর এবং বাঙময় একটি শব্দ। তরুণ বয়সে 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' কথার স্লোগানটি আমার কাছে যত আকর্ষণীয় মনে হতো, 'বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক'-এ স্লোগানটি আমার মধ্যে ততটা উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে পারত না।

এবার ইনকিলাব বা বিপ্লবে ফিরে আসা যাক। ব্রিটেনের গৌরবোজ্জ্বল বিপ্লব (The Glorious Revoulution of Britain), মেক্সিকো বিপ্লব, বলশেভিক বিপ্লব, বাংলাদেশের বিপ্লব, ইরানের ইসলামিক বিপ্লব-এসব বিপ্লবের Romantic দিকগুলো পড়তে এখনো মনের গভীরে নাড়া দেয়। বিপ্লব প্রকৃতপক্ষে একটি স্বপ্নের বাস্তবায়ন। সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন থেকেই সৃষ্টি হয়েছে বিপ্লবের সূচনা। একমাত্র ইংল্যান্ডের Glorious Revolution ছাড়া

www.pathagar.com

অন্য সব বিপ্লবই হয়েছে রক্তাক্ত, কেড়ে নিয়েছে লক্ষ লক্ষ প্রাণ। কিন্তু এসব বিপ্লব কি এনে দিতে পেরেছে প্রত্যাশিত স্বপ্নের বাস্তবতা-যেখানে থাকবে সুখ, শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা? এদিক থেকে বিচার করতে গেলে সব বিপ্লবই আংশিকভাবে ব্যর্থ এবং আংশিকভাবে সফল। যুব বয়সে আমিও একসময় বিপ্লবের স্বপ্ন দেখতাম। হয়ত আমার বিশেষ সামাজিকিকরণের জন্য, আমি আকৃষ্ট হই ইকবাল এবং আবুল হাশিমের ইসলামিক বিপ্লবের তত্ত্বে। তখন ভাবতাম, ইসলামের সার্বজনীন মূল্যবোধ, ইসলামের অন্তর্নিহিত অনন্য আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর মহিমান্বিত জীবনধারা, খোলাফায়ে রাশেদীনের গৌরবময় শাসন- এ সবের পুনঃপ্রবর্তনের লক্ষ্যে আমিও নতুন ইসলামিক বিপ্লবের একজন ত্যাগী সৈনিক। সত্যি কথা বলতে, সেই তরুণ বয়সে আবদুল গফুর সম্পাদিত 'সৈনিক' পত্রিকার প্রতিটি লাইন তন্ময় চিত্তে পড়তাম।

পাকিস্তান আন্দোলন অবশ্যই এরূপ একটি ইসলামিক বিপ্লবের স্বপ্ন দেখিয়ে ভারত উপমহাদেশের সকল মুসলমানকে সর্বোচ্চ ত্যাগের বিনিময়ে পাকিস্তান অর্জনে উদ্দীপিত করে তুলেছিল। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, পাকিস্তানের নেতারা এ স্বপ্ন বাস্তবায়নে ব্যর্থ হন। অবশ্য এরই ফলে জন্ম নেয় আরেক বিপ্লব-১৯৭১ সালের 'বাংলাদেশ বিপ্লব'। এ বিপ্লবের জন্য বাংলাদেশের মানুষকে যে অতুলনীয় ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার এবং রক্ত দিতে হয়েছিল, তাকে কেবল সংখ্যার মধ্যে আবদ্ধ করা বাংলাদেশ বিপ্লবের প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শনেরই শামিল হবে। বোধ হয়, পৃথিবীর অন্য কোনো বিপ্লব সফল হবার জন্য এত বেশি রক্ত এবং জীবন দিতে হয় নি। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস প্রত্যেক বাংলাদেশীর জীবনে প্রতি মিনিটে একেকটি পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে। দল-মত নির্বিশেষে শিশু-কিশোর, যুব-বৃদ্ধেরও এ বিপ্লবে তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব অবদান রেখে গেছেন। এ দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধকালীন বাংলাদেশেই অবস্থান করেছি এবং আমার নিজস্ব ত্যাগ, তিতিক্ষা ও সীমাহীন বেদনাবোধ থেকে বুঝতে পেরেছি, এ বিপ্লবের দাবিদার বাংলাদেশের নির্যাতিত, নিপীড়িত সমগ্র জনগোষ্ঠী।

বিপ্লব করা সহজ নয়। বিপ্লবের জন্য অনেক মূল্য দিতে হয়। বিপ্লবকে সফলতার দিকে নিয়ে সুখী-সুন্দর স্বপ্নময় রাষ্ট্র সৃষ্টি করা আরো কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এর জন্য দরকার পড়ে সত্যিকার ঈমানদার দেশপ্রেমিক, নির্লোভ নেতা ও কর্মীবাহিনী। এর জন্য দরকার অনেক শিক্ষার। দরকার অনেক নৈতিকতা, বিভিন্ন জটিল সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সমস্যা সম্পাদনের জন্য দক্ষ বিপ্লবী সেনানীর। এর জন্য প্রয়োজন আধুনিক প্রযুক্তির অর্জন এবং এর যথাযথ প্রয়োগ। সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন এমন একটি জনগোষ্ঠী সৃষ্টি করা, যারা নিজের স্বার্থের চেয়ে দেশের এবং বিপ্লবের আদর্শকে বড় মনে করে। বিপ্লবের ধ্বংসস্তূপের উপর আরেক নতুন গতিশীল রাষ্ট্র সৃষ্টির জন্য যে মননশীলতা, চিন্তার বিশালতা ও প্রাজ্ঞ নেতৃত্বের প্রয়োজন, বাংলাদেশে সে সম্পর্কে কেউ কি কোনো গঠনমূলক চিন্তা করেন?

এখন বয়স হয়েছে। মনে হয়, সব বিপ্লবের মতোই বাংলাদেশের বিপ্লবও একটি অসমাপ্ত বিপ্লবই থেকে যাবে। স্বাধীনতা পেয়েছি। কিন্তু আমাদের আধ্যাত্মিক, মানসিক এবং সত্যিকার অর্থে জাগতিক উন্নতি কতটুকু হয়েছে?

www.pathagar.com

তবুও মানুষ স্বপ্ন দেখে যায়। 'ইনকিলাব' পত্রিকার মালিক কে, তা আমি জানি না। কিন্তু এ পত্রিকায় কাজ করেন এবং লেখেন-এমন অনেক বুদ্ধিজীবীকে আমি চিনি। টাকার লোভে তারা 'ইনকিলাবে' কাজ করেন না। তারা আজও হয়ত স্বপ্ন দেখেন একটি বিপ্লবের। 'ইনকিলাবে' লেখালেখির মধ্য দিয়ে তাঁরা একটি নতুন চিন্তাধারার জন্ম দেবার চেষ্টা করছেন, যে চিন্তাধারা একদিন একটি আদর্শের বিপ্লবে বিস্ফোরিত হয়ে উঠবে এবং বাংলাদেশকে সত্যিকারের সুখময়, স্বপ্নময় এবং ঐশ্বর্যময় করে তুলবে। তাঁদের এ সুন্দর স্বপ্ন কি সফল হবে? আমি এখন ষাটের প্রান্তে। মরে যাবার আগে একবার কি শুনতে পাব, সফল বিপ্লবের কথা? আমার স্বপ্ন আমাকে কিছুতেই ছাড়ে না। আমার মনে হয়, মরে যাবার আগেই একদিন শুনবো, বিপ্লব সফল হয়েছে। আমি যেন শুনতে পাচ্ছি 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ', 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ'।

অনুলিখন-নজরুল ইসলাম মিশা
দৈনিক ইনকিলাব ৪ জুন ১৯৯৮

www.pathagar.com

১৭ একবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কৌশল

পাকিস্তানের ৫টি পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ সম্পর্কে মন্তব্য করার সময় প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন গত রাতে বলেছেন, বিংশ শতাব্দীর শেষ পঞ্চাশ বছরে পাশ্চাত্য জগৎ যে ভুল করেছিল, একবিংশ শতাব্দীর প্রথম পঞ্চাশ বছরে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো সেই ভুলেরই পুনরাবৃত্তি করবে বলে মনে হচ্ছে। তার এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে অনেক প্রশ্নের উদয় হয়। মানুষের পরমাণু শক্তির আবিষ্কার বিশ্বের জন্য একটি আশীর্বাদ না অভিশাপ?

সন্দেহ নেই যে, পারমাণবিক আবিষ্কার মানবজাতির হাতে দিয়েছে প্রচণ্ড বিস্ময়কর এবং অভূতপূর্ব শক্তি। দুঃখজনক হলেও ঐতিহাসিক সত্য যে, মানুষ ব্যক্তিগত অথবা জাতিগত জীবনে শক্তির অধিকারী হলে সে শক্তি প্রদর্শনের লোভ সংবরণ করতে পারে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একেবারে শেষ পর্যায়ে, হিটলারের পরাজয় যখন ঘটেই গেল, তখন জাপানি সমরনায়কগণ জেনারেল ম্যাক আর্থারের কাছে আত্মসমর্পণ করার জন্য চিন্তা করছিল, সে সময় আমেরিকা পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হয়। চার্চিল লিখে গেছেন, এই বোমা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার তৎকালীন দুর্বলচিত্ত প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান বিশাল শক্তিধর রাষ্ট্রনায়কের আচরণ শুরু করলেন এবং অনেকটা পশ্চিমী মিত্র শক্তির অন্যান্য অংশীদারের মতামত প্রায় উপেক্ষা করে হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপের আদেশ দিলেন। হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে অকল্পনীয় ও বীভৎস ধ্বংসযজ্ঞ পাশ্চাত্যের সমরনায়কদের মধ্যে বিজয়ের গৌরব ধ্বংসযজ্ঞের প্রচণ্ডতায় সারা বিশ্বের মানুষ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এই শেষ পর্যায়ে, স্ট্যালিনের আদেশে সোভিয়েত কমিউনিস্ট আর্মি পূর্ব ইউরোপে একটির পর একটি দেশ গ্রাস করে চলছিল। অনেক বিশ্লেষকের মতে, আমেরিকানরা স্ট্যালিনকে ভয় দেখিয়ে, তার আগ্রাসী মনোভাবকে স্তব্ধ করার জন্য হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে

www.pathagar.com

বীভৎসতা ঘটায়। সোভিয়েত ইউনিয়নের তখন আণবিক অস্ত্র ছিল না। সোভিয়েত রাশিয়াকে আণবিক অস্ত্রের দ্বারা আমেরিকা ধ্বংস করতে পারে- এই ভয়ে স্ট্যালিন তার আগ্রাসন বন্ধ করে এবং পরবর্তীকালে জাতিসংঘের মাধ্যমে এক নতুন বিশ্বব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

শক্তির (Power) অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যই হলো, প্রতিশক্তির জন্ম দেওয়া। এর ফলে সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং এর অনেক পরে মাও সেতুং-এর গণচীন অনেক অর্থ ও প্রতিভা ব্যয় করে, আণবিক শক্তির অধিকারী হয়ে, পৃথিবীতে একটি শক্তিভীতির ভারসাম্য (Balance of terror) সৃষ্টি করে। এর ফলে গত ৫০ বছরে আণবিক যুদ্ধ সংঘটিত না হলেও পৃথিবীর মানুষ মানসিকভাবে চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে।

আলবার্ট আইনস্টাইন, বার্ট্রান্ড রাসেলসহ পৃথিবীর ১০ জন মহামনীষী পারমাণবিক শক্তির আবিষ্কারের পরপরই এ শক্তিকে পুনঃব্যবহার না করার জন্য বিপুল অর্থ ও সম্পদ ব্যয়ে এর উপরে আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা বন্ধের জন্য বিশ্ব নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান। কিন্তু শক্তি অর্জনের মধ্যে যে মাদকতা আছে, তার প্রভাব থেকে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ মুক্ত হতে পারেননি। আশির দশকে পারমাণবিক অস্ত্রের সম্ভার এমন ধ্বংসাত্মক পর্যায়ে পৌঁছে যে, দুটি পরাশক্তিই পরস্পরকে নিশ্চিতভাবে ধ্বংস (Mutual Assured Destruction) করে সারা পৃথিবী বিলুপ্ত করার পথ নিশ্চিত করে।

হয়তো মানব মনের বৈশিষ্ট্য এই যে, শক্তির মাদকতা ও শান্তি অনুসন্ধান পরস্পর সহাবস্থান করে। সে কারণে বোধ হয়, আশির দশকের শেষ থেকে পাশ্চাত্যের নেতাগণ পারমাণবিক শক্তি ধাপে ধাপে হ্রাস করার প্রচেষ্টা চালায়। এই পরিপ্রেক্ষিতেই Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) এবং Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT) দুইটিতে বিশ্বের প্রায় সকল রাষ্ট্রই (১৪৬) স্বাক্ষর করে।

শত শতাব্দীব্যাপী পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকার অভিজ্ঞতা নিয়ে ভারতের পক্ষে আণবিক মহাশক্তি অর্জনের মোহ সংবরণ করা অত্যন্ত পীড়াদায়ক। ভারতীয়রা দাবি করে, পৃথিবীর তদানীন্তন ৫টি পারমাণবিক শক্তি যদি কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সকল পরমাণু অস্ত্র ধ্বংস না করে, তাহলে ভারত পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ছেড়ে দিতে পারে না। ভারতীয়রা যুক্তি দেখায় যে, সারা পৃথিবীতে পারমাণবিক অস্ত্র ধ্বংস না হলে পাঁচটি আণবিক শক্তিধারী দেশ সারা পৃথিবীর ওপর তাদের শক্তির উন্মত্ততা দেখিয়েই চলবে। তাই তারা NPT ও CTBT-তে স্বাক্ষর করেনি। পাকিস্তানের চির শত্রু ভারত এই চুক্তিদ্বয়ে স্বাক্ষর না করাতে পাকিস্তানও স্বাক্ষর দানে বিরত থাকছে।

রাজনৈতিক বাস্তবতা এত কঠিন যে এবং শক্তির মোহ এত দুর্লংঘ যে, অহিংসবাদী মহাত্মা গান্ধীর দেশ ভারতের ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) তাদের অখণ্ড ভারত পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য এ মাসের প্রথম দিকে পর পর ৫টি পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটায় এবং কট্টর বিজেপি নেতৃবৃন্দের মধ্যে সবচেয়ে উদারপন্থী বলে

www.pathagar.com

খ্যাত অটল বিহারি বাজপেয়ী ঘোষণা করেন তারা (ভারতীয়রা) এখন একটি শক্তিশালী বোমার (Hydrogen Bomb?) অধিকারী এবং মহাপ্রলয় ঘটাতে সক্ষম এই বোমা ব্যবহার করতে ভারত কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগবে না।

পারমানবিক স্নায়ুযুদ্ধের সূচনা ঘটেছে মাত্র

আগেই বলেছি, শক্তি প্রতিশক্তি সৃষ্টি করে; তাই ৫টি পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পাকিস্তান তার নিরাপত্তাহীনতা দূর করার চেষ্টা করে। কিন্তু পাশ্চাত্যের গত ৫০ বছরের ইতিহাস প্রমাণ করে যে, ভারত ও পাকিস্তান কর্তৃক এই পারমাণবিক শক্তি প্রদর্শন উপমহাদেশে পারমাণবিক স্নায়ুযুদ্ধের সূচনা মাত্র। মনে হয়, এই দুই দেশের ভাগ্যে ভবিষ্যতে অনেক দুর্ভোগ রয়েছে।

উপমহাদেশের এই ভয়াবহ পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ স্বাধীন সত্তা নিয়ে বেঁচে থেকে উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে পারে কিভাবে? আগেই বলেছি, শক্তির মধ্যে একটা মাদকতা আছে এবং শক্তিধারীরা দুর্বল প্রতিবেশীর উপর তাদের শক্তির আধিপাত্য খাটায়। আমার মনে পড়ে, আইয়ুব খান যখন পাকিস্তানের ক্ষমতা গ্রহণ করেন, তখন ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সিন্ধু নদীর পানি বণ্টন নিয়ে আলোচনা হয়। আইয়ুব খান সেদিন ('৫৮-৫৯) বিশেষ জোর দিয়ে প্রকাশ্যে ঘোষণা দেন, If there is no water there will be war। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তান তখন সামরিক দিক থেকে ভারতের প্রায় সমপর্যায়ে ছিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, পাকিস্তানের সামরিক শক্তির জন্যই সেদিন ভারত সিন্ধু নদীর পানি নিয়ে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয় এবং সেটা বাস্তবায়ন হয়। একথা অস্বীকার করা যায় না যে, ভারতের সাহায্য ব্যতীত আমরা এত অল্প সময়ে স্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম হতাম না। কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতি তার নিজ গতিতেই চলে। স্বাধীনতা-উত্তরকালে আমাদের মতো ক্ষুদ্র একটি দেশের সঙ্গে ভারত দাম্ভিকতাপূর্ণ ব্যবহারই করে আসছে। ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে সুবিধা অর্জনের জন্য অখণ্ডতাবাদী ভারতীয় নেতারা যদি পারমাণবিক বিস্ফোরণের মতো ভয়াবহ ঘটনা সৃষ্টি করে জনগণের মধ্যে যুদ্ধংদেহি মনোভাব তৈরি করে, তবে এটাও ধরে নেওয়া যায় যে, পরে কোনো অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলাকে কেন্দ্র করে ভারতের শাসকবর্গ যে বাংলাদেশ আক্রমণ করে সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের চেষ্টা করবে না তার নিশ্চয়তা কোথায়? তাই বাংলাদেশীদের নিশ্চিত বা নির্বিঘ্ন থাকার কোনো অবকাশ নেই। তবে কি বাংলাদেশ 'ঘাস খেয়েই' আণবিক শক্তি অর্জন করবে?

বাংলাদেশকে গড়তে হবে মানববোমায়

আমার মনে হয়, বাংলাদেশের পক্ষে 'ঘাস খেয়ে' আণবিক বোমার অধিকারী হওয়া অত্যন্ত কষ্টকর হবে। তবে বাংলাদেশের সকল প্রাপ্ত বয়স্ক নারী-পুরুষের সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে বাংলাদেশের সকল জনবল নিয়ে এক বিশাল গণসামরিক বাহিনী গড়ে

www.pathagar.com

তোলা যায়। কোটি কোটি লোকের এই মানব বোমা ভারতের আণবিক শক্তির প্রতিবন্ধক (Deterrent) হিসেবে কাজ করবে। কারণ, বাংলাদেশকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করার পরে ভারতের জন্য লাভের কিছুই থাকবে না। অবশ্য এ রকম মানব বোমা সৃষ্টির জন্য মাও সেতুং ও হো চি মিনের মতো দক্ষ সংগঠক দরকার। তাছাড়া নিজ প্রতিরক্ষার জন্য বাংলাদেশের আরো একটি পথ খোলা আছে। সেটি হলো ভারতবিরোধী পারমাণবিক শক্তিসম্পন্ন অন্য কোনো পারমাণবিক মহাশক্তির সঙ্গে পারমাণবিক চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া। এই পৃথিবীর নিষ্ঠুর আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কোনো শক্তির দয়ার ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা নির্বুদ্ধিতার পরিচয়। তাই কোনো পারমাণবিক শক্তির সাহায্য নিতে আমাদের যদি কিছুটা মূল্য দিতে হয়, সেটা দিতেও রাজি থাকতে হবে। যাই হোক, প্রতিরক্ষার ব্যাপারে বাংলাদেশীদের হাত গুটিয়ে বসে থাকার সময় আর নেই।

দৈনিক ইনকিলাব, ৩১ মে ১৯৯৮

www.pathagar.com

১৮ ভারতের নবোত্থিত হিন্দু জাতীয়তাবাদের পরমাণু সজ্জা সকল প্রতিবেশীর স্বাধীনতা বিপন্ন করতে পারে

প্রশ্ন ॥ ভারত পাকিস্তানের পারমাণবিক বিস্ফোরণকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করছেন?

উত্তর ॥ পোখরানে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানোর পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারি বাজপেয়ীসহ অপরাপর নেতৃবৃন্দ যেসব দম্ভোক্তি করেছিলেন তাতে ভারতের নবোত্থিত হিন্দু জাতীয়তাবাদের উগ্র রূপই প্রকাশিত হয়েছে। এই উগ্র জাতীয়তাবাদের পরমাণু সজ্জা পাকিস্তান বাংলাদেশসহ সকল ক্ষুদ্র প্রতিবেশী দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন করতে পারে। ভারতের জবাবে চাগাইতে পাকিস্তানের বিস্ফোরণ ঘটানো ভারতের উগ্র জাতীয়তাবাদকে কিছুটা হলেও স্তব্ধ করেছে। এটা ঠিক যে, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে পরমাণু যুদ্ধ হলে কেউই জিততে পারবে না বরং উপমহাদেশ সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাবে। উভয় দেশের শাসকদের এ ব্যাপারে চৈতন্য উদয় হওয়া দরকার। ভারতীয় রাজনীতিকরা সবসময়ই অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন দেখে এসেছেন। একই সঙ্গে একধরনের গভীর হীনম্মন্যতাবোধেও তারা আক্রান্ত। অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন ও আত্মঅহংবোধ জাগ্রত করে হীনম্মন্যতা দূর করার লক্ষ্যেই তারা ভারতকে বৃহৎ পরাশক্তিতে পরিণত করতে চায়। ভারতের উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদের উত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিবেশী ক্ষুদ্র দেশগুলোর জন্য নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টির আশংকা অবশ্যই পড়ছে।

প্র ॥ বিজেপি ক্ষমতায় আসার পরপরই এই উপমহাদেশে উত্তেজনা শুরু হয়েছে। তারা পরমাণু অস্ত্র প্রতিযোগিতায় সূত্রপাত ঘটিয়েছে এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করছে। এ বিষয়ে আপনার অভিমত কি?

উ ॥ কংগ্রেস নেতা কুমিল্লার আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহর লাল নেহরুর কাছে চিঠি লিখে জানতে চেয়েছিলেন যে, তারা কেন পাকিস্তান তথা ভারত বিভক্তি মেনে নিলেন। তার জবাবে নেহরু লিখেছিলেন, আমরা এটা সাময়িকভাবে মেনে নিয়েছি। পাকিস্তান টিকবে না। বিশেষভাবে পূর্ব পাকিস্তান তো নয়ই। নেহরু এই কথাটি কখনোই জনসমক্ষে বলেননি। তবে কাশ্মিরে কখনোই গণভোট দেননি, গোয়া দখল করে নিয়েছেন। পাকিস্তানকে বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে হয়রানি করার চেষ্টা

www.pathagar.com

করেছেন। দিল্লীর শাসক মহলের মনে সবসময়ই অখণ্ড ভারত ফিরে পাবার আকাঙ্ক্ষা বিরাজ করেছে। এ ক্ষেত্রে বিজেপির বৈশিষ্ট্য এই যে, তারা এই আকাঙ্ক্ষার কথা প্রকাশ্যে নির্বাচনী ঘোষণাপত্রে উল্লেখ করেছে এবং বিজেপির ধর্মতাত্ত্বিক নেতা (থিয়োপলিটিশিয়ান) এল কে আদভানি নির্বাচনে জেতার আগেই প্রকাশ্যে বলেছেন, পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশের কনফেডারেশন হওয়া উচিত।

বিজেপি অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে হিন্দু জাতীয়তাবাদকে যুদ্ধংদেহী রূপ দানের জন্য প্রকাশ্য প্রচারণা চালিয়ে আসছে। অতীতের দিকে তাকিয়ে, মহাকবি ইকবালের একটি কথা মনে পড়ছে। তিনি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর কাছে এক চিঠি লিখেছিলেন যে, "কংগ্রেস সত্যিকারভাবে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করে না এবং তার স্থায়ীত্বও বেশিদিন থাকবে না। ভারতের আত্মার প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব করে 'হিন্দু মহাসভা"। উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদী দল 'হিন্দু মহাসভা'রই নবরূপ হচ্ছে বর্তমান ভারতীয় জনতা পার্টি বা বিজেপি। অর্ধশতাব্দী পরে আজ দেখা যাচ্ছে, সত্যিকারের রূপ নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে 'ভারতের আত্মা' বিজেপি।

'এই হিন্দুত্ববাদের সুস্পষ্ট রূপ দিয়েছেন টাইমস অব ইন্ডিয়া পত্রিকার সাবেক সম্পাদক গিরিলাল জৈন তার 'দি হিন্দু ফেনোমেনা' শীর্ষক গ্রন্থে। ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত এই বইটি এক বছরেই তিনবার মুদ্রিত হয় এবং লাখ লাখ কপি বিক্রি হয়। এই বইয়ের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, নেতৃত্বের দর্শন, মার্কসবাদ, জোটনিরপেক্ষতাবাদ ব্যর্থ হয়েছে। নতুন করে জেগে উঠেছে হিন্দুত্ব। ভাবতে অবাক লাগে, ইকবালের এত দূরদৃষ্টি ছিল যে, গিরিলালের মতো একজন তাত্ত্বিকের আবির্ভাবের কথা তিনি তখনই বলেছিলেন। আমার মনে হয়, ভারতের বিশেষ করে নতুন দিল্লীর বুদ্ধিজীবী ও শাসকগণ, তা তারা যে কোনো দলেরই হোন না কেন, একটি হীনমন্যতায় ভোগেন। তারা মনে করেন, পাশ্চাত্য তাদেরকে ডিঙ্গিয়ে গেছে। অহংকার করার মতো ভারতের আর কিছু নেই। রাম রাজত্বের কথা মুখে বললেও ভারতের ইতিহাসে, সর্বভারতীয় স্বাধীন হিন্দু রাষ্ট্র হিন্দুদের নেতৃত্বে কখনোই প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মুসলমানদের ৭শ' বছরের এবং ইংরেজদের ২শ' বছরের শাসন তাদের মনে এমন একটি ধারণার সৃষ্টি করে যে, ভারতকে মহাশক্তিতে পরিণত করে তারা ওই হীনম্মন্যতা দূর করবেন। অবশ্য এরূপ মনোভাব ভারতের উন্নতির সহায়ক শক্তি হতে পারে যদি এই হিন্দু জাতীয়তাবাদ, নাৎসিবাদ বা ফ্যাসিবাদের মতো উগ্র জাতীয়তাবাদে পরিণত না হয়।

বিজেপি যদি গঠনমূলকভাবে কাজ করে তবে তাদের অধীনে ভারতের উন্নতি সাধন সম্ভব। কিন্তু তাদের নেতৃত্বে নাৎসিবাদ-ফ্যাসিবাদের মতো উগ্র জাতীয়তাবাদের উত্থান ঘটালে তাদের আগ্রাসনের হাত থেকে পাকিস্তান বা বাংলাদেশ কেউই রেহাই পাবে না।

www.pathagar.com

প্রথম পারমাণবিক বিস্ফোরণের পর, ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী, আদভানি ও ফারনান্দেজ যেসব দম্ভোক্তি করেছিলেন, তাতে উগ্র জাতীয়তাবাদেরই প্রকাশ ঘটে। এতে পাকিস্তান, বাংলাদেশসহ প্রতিবেশী দেশগুলোরও স্বাধীনতা বিপন্ন হওয়ার আশংকা দেখা দেয়। যদিও ব্যক্তিগতভাবে আমি আণবিক পরাশক্তির জন্ম, বিকাশ ও বিস্তৃতি মানব সভ্যতার জন্য হুমকিস্বরূপ মনে করি, তবুও আমার মনে হয়, ভারতের বিপরীতে পাকিস্তানের পারমাণবিক বিস্ফোরণ ভারতীয় উগ্র জাতীয়তাবাদকে কিছুটা হলেও স্তব্ধ করে দিয়েছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে আশা করবো, দুই দেশই যখন পরমাণু শক্তিতে পরিণত হয়েছে, তখন তারা তাদের জাতীয় সম্পদ আর যেন প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় না করে, কোটি কোটি ক্ষুধার্ত, অশিক্ষিত, দুঃস্থ ও বঞ্চিত মানুষের কল্যাণে ব্যয় করে। ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশের শাসক দলেরই এখন চৈতন্যোদয় হওয়া দরকার যে, পারমাণবিক যুদ্ধে কেউই জয়লাভ করবে না। বরং এর ফলে পাক-ভারত উপমহাদেশ সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাবে।

প্র ॥ উপমহাদেশের পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতার সূত্রপাত ঘটানোর ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন বিশেষ উদ্দেশ্য থাকতে পারে বলে অনেকে মনে করেন। আপনার অভিমত কি?

উ ॥ আমেরিকা বা রাশিয়া কারো অনুরোধেই ভারত বিস্ফোরণ ঘটানো থেকে বিরত থাকতো না। কারণ আমি আগেই বলেছি, ভারত তার আত্মঅহংকারের ভূমিকায় ফিরে যেতে চায়। সে জন্য বৃহৎ শক্তিগুলোকে কোনো মূল্য দেয় না। এস পি হান্টিংটনের 'ক্ল্যাশ অব সিভিলাইজেশন' তত্ত্ব যদি সত্য হয় তাহলে ক্রুসেডের ইতিহাস পেছনে রেখে কোনো খৃস্টান শক্তিই ইসলামী কোনো দেশকে পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্র বানাতে চাইবে না।

আমি ব্যক্তিগতভাবে, আণবিক শক্তিবিরোধী হলেও, পাশ্চাত্য জগতের চিন্তাবিদদের ইসলামভীতি দেখে, পাকিস্তানের পারমাণবিক বিস্ফোরণ, সত্য বলতে কি, আমাকে খুশিই করেছে। তাছাড়াও, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বড় অস্ত্রের ভাণ্ডার যাদের হাতে আছে, তারা এর বিস্তৃতি চায় না। আমার মনে হয়, আমেরিকাসহ ৫টি পরমাণু শক্তিধর দেশের মনোভাব একই রকম যে, শুধু তারাই নিউক্লিয়ার ক্লাবের সদস্য থাকবে।

প্র ॥ ভারতের পক্ষে গোটা প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা কি সম্ভব?

উ ॥ ভারত আসলে সর্বদিক দিয়েই পরাশক্তিতে পরিণত হতে চায়। আমি মনে করি, এটা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। এ ধরনের প্রতিযোগিতায় যাওয়া হবে তাদের জন্য নির্বুদ্ধিতা। আমেরিকা ও রাশিয়ার কাছে যে পরিমাণ পারমাণবিক অস্ত্র আছে তা দিয়ে ৩শ' পৃথিবী ধ্বংস করা যায়। এই সুন্দর পৃথিবীর জন্য এটা অত্যন্ত দুঃসংবাদ।

www.pathagar.com

প্র ॥ দু'টি দেশের পারমাণবিক বিস্ফোরণের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের অবস্থান যথার্থ মনে করেন কি?

উ ॥ ভারতের প্রথম পারমাণবিক বিস্ফোরণের পরই বাংলাদেশ সরকারের নিন্দা জানানো উচিত ছিল। সরকারের বলা উচিত ছিল, ভারত এ কাজে অগ্রসর হতে থাকলে উপমহাদেশের অন্যান্য দেশও "ঘাস খেয়ে হলেও" পারমাণবিক বোমা তৈরি করবে। বর্তমান সরকার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেবে, যদি তাঁরা যত শিগগির সম্ভব পাকিস্তান ও ভারত ছাড়া অন্য কোনো পরাশক্তির সঙ্গে আত্মরক্ষামূলক আণবিক নিরাপত্তা জোট গঠন করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ও আমেরিকার মধ্যে সোফা (SOFA) চুক্তি সম্পাদনের যে কথাবার্তা চলছে তার প্রতি আমি জোরালো সমর্থন জানাই। প্রয়োজনে সোফা চুক্তির পরিবর্তে বঙ্গোপসাগরে আমাদের কোনো দ্বীপকে যদি মার্কিন পরমাণু উপস্থিতির জন্য ব্যবহার করতে দেওয়া হয় তাতেও আমার আপত্তি নেই। আমি বর্তমান সরকারের নতজানু ও ভারতমুখী একপেশে পররাষ্ট্র নীতির নিন্দা জানাই। ভারতের কাছে আমরা হাত জোড় করে থাকলে, গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্যা কোনোদিনই পাবো না, চুক্তি যেমনই হোক না কেন।

'একটি লাঙল ও একটি রাইফেল'

প্র ॥ বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা নীতি ও কৌশল কি হওয়া উচিত?

উ ॥ ভারতীয় নেতৃবৃন্দের বক্তব্য থেকে উগ্র জাতীয়তাবাদী মনোভাবের যে প্রকাশ ঘটেছে তাতে পাকিস্তান, বাংলাদেশসহ প্রতিবেশী দেশগুলোর স্বাধীনতা বিপন্ন হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে–একথা আগেই বলেছি। ভারতীয় নেতৃত্বের আগ্রাসী মনোভাবই বাংলাদেশের ভীতির কারণ। ভারতের মতো উগ্র আণবিক শক্তির মোকাবেলায় বাংলাদেশের পক্ষে কেবল ২টি কৌশলই গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রথমত প্রতিটি বয়স্ক নর-নারীকে বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়া। এ প্রসঙ্গে আমার একটি কথা মনে পড়ে, ৭০ এর দশকে স্বাধীনতার আন্দোলনের সময়, বর্তমান জাতীয় অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম "আপনারা যে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করতে চান, সে স্বাধীনতা রক্ষা করবেন কিভাবে" তিনি (আব্দুর রাজ্জাক) বলেছিলেন, "প্রত্যেক কৃষকের হাতে একটি লাঙ্গল ও একটি রাইফেল থাকবে।" এভাবে যদি বাংলাদেশের মানুষকে নিয়ে বিশাল প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তোলা যায় তাহলে পৃথিবীর কোনো শক্তিই বাংলাদেশকে আক্রমণ করে হজম করতে পারবে না। আক্রমণের সাহসও পাবে না। পাশ্চাত্য সমর কৌশলবিদদের ভাষায়, এটাকে বলে 'স্ট্র্যাটেজি অব টোটাল ডিফেন্স'। এই কৌশলই এখন আমাদের গ্রহণ করতে হবে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয়ত, যেহেতু 'ঘাস খেয়ে' আণবিক বোমা তৈরি করা বাংলাদেশের জন্য খুবই কষ্টকর হবে, সে কারণে আমরা যদি টোটাল ডিফেন্সের দিকে যেতে না পারি তাহলে আমাদের উচিত হবে অন্তত উপমহাদেশের বাইরে কোনো পারমাণবিক শক্তিধর দেশের সঙ্গে আত্মরক্ষামূলক চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া।

প্র ॥ ভারত জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য পদ লাভের আগ্রহ প্রকাশ করেছে। জাপান এবং জার্মানিও অনুরূপ সদস্য পদ চায়। ভারত ও পাকিস্তানের পরমাণু শক্তি অর্জনের পর এ ক্ষেত্রে কোনো গুণগত প্রশ্ন আসতে পারে কি?

উ ॥ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ৫০ বছর পার হয়ে গেছে। ৫০ বছর আগের প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘের অঙ্গ সংগঠনসমূহ গঠন করা হয়। একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে এসে অর্ধ শতাব্দী আগের জাতিসংঘ কাঠামোর পরিবর্তন দরকার। এ নিয়ে সংশ্লিষ্ট সকল দেশের রাষ্ট্রনায়ক ও চিন্তাবিদদের নতুন করে ভাবা উচিত।

দৈনিক সংগ্রাম ৩১ মে ১৯৯৮
সাক্ষাৎকার গ্রহণ : মুজতাহীদ ফারুকী/শহীদুল ইসলাম

www.pathagar.com

১৯ সেদিনই মনে হয় পাকিস্তান ধ্বংস হয়ে গেছে

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাত আমার জীবনের অবিস্মরণীয় দিন। তখন আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করি। সে সময় ভুট্টো, ইয়াহিয়া এবং মুজিবের আলোচনা চলছিল ঢাকায়। একদিন পত্রিকায় দেখলাম আলোচনার অগ্রগতি হয়েছে। এর মধ্যে আমার গাড়ি এসেছিল চট্টগ্রাম বন্দরে। অনেকদিন যাবত ঢাকায় আসার দরকার ছিল আমার। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের কারণে আসতে পারিনি। মনে করলাম যে, মুজিবের প্রধানমন্ত্রিত্ব গ্রহণ করাও দেখব আর আমার গাড়িও নিয়ে আসবো। এ উদ্দেশে ২৪ মার্চ ঢাকায় এলাম। আমার কলিগ সাইফুল্লাহ ভুঁইয়া তখন ইকবাল হলের (জহুরুল হক হল) হাউজ টিউটর। গাড়ি ছাড়িয়ে আনার জন্য একটা পারমিট আনতে গেলাম মধুমিতা সিনেমা হলের সামনে এক অফিসে। সেখানে এক বন্ধুর দেখা পেলাম এবং জহুরুল হক হলে উঠেছি বলে জানালাম। সে বললো, 'গাধা আজকে রাতেই মরে যেতে পারিস। আজ রাতেই ক্র্যাক ডাউন হতে পারে'। তখন আমার হাত-পা কাঁপা শুরু হলো। আমি এ অবস্থায় মনে করলাম যে, বন্ধুর বাসায় উঠে তারপর পালিয়ে যাব। যাওয়ার আগে ওকে একটু সাবধান করে যাওয়া উচিত। আমি বন্ধুর বাসায় গিয়ে বললাম, দেখ আজ রাতেই ক্র্যাক ডাউন হতে পারে বলে শুনলাম। তারা নাকি প্রথমেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় আক্রমণ চালাবে, আমার খুব ভয় হচ্ছে। আমি পালালাম, তুমিও পালাও। এই বলে আমি পথে দেখা পাওয়া বন্ধুর ওখানে চলে গেলাম। তাদের বাসায় গল্প করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লাম। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল বিকট শব্দে। বিকট শব্দ কান ফেটে যাওয়ার মতো।

কত রকমের যে শব্দ। অর্থাৎ যুদ্ধ কি জিনিস তা আমরা জানতাম না, বুঝতাম না। ওরা রকেট মারছে, কামান ছুড়তে ছুড়তে আসছে। রাত ১২টার পরের কথা এসব। আমি ভাবলাম, হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টে মনে হয় ওরা আঘাত হেনেছে। একটু পর জানালা ফাঁক করে দেখি ট্যাংক চলছে। এবার বুঝতে পারলাম প্রকৃত যুদ্ধ হবে। আমি, আমার বন্ধুর স্ত্রী এবং বন্ধু সালাহউদ্দিন এমপি সে রাতে একটি বাথরুমে লুকিয়ে ছিলাম।

www.pathagar.com

পরদিন সকাল থেকে কারফিউ। একটু সুযোগ বুঝে ঘরের বার হলাম। একজন বললেন, গুলিস্তান থেকে দু'একটা বাস চলাচল করে। তবে ভয় আছে। মেরে ফেলতে পারে, নিয়েও যেতে পারে। যা হোক আমি গুলিস্তানের কাছে এসে দেখি, ইনকিলাবের বর্তমান ফিচার সম্পাদক গফুর ভাইও এখানে এসে হাজির হয়েছেন। গফুর ভাইয়ের সঙ্গে আমার ছাত্র জীবন থেকেই সুসম্পর্ক। দু'জনেই সাহস করে বাসে উঠলাম। বাসে যেতে এদিক ওদিক তাকাতে গফুর ভাই আমাকে নিষেধ করেছিলেন। এভাবে মিরপুর ব্রিজ গিয়ে বাস থেকে নামলাম। ব্রিজের আশপাশে কিছু বিহারিকে দেখতে পেলাম। আমি তাদের দিকে তাকালে গফুর ভাই আবার আমাকে তাদের দিকে না তাকিয়ে সোজা হাঁটতে বললেন। ব্রিজের ওপরে ওঠে ব্রিজের নিচে তাকালাম। দেখলাম, অসংখ্য মৃতদেহ পানিতে ভাসছে। মৃত মানুষের লাশের এই দৃশ্য সেদিন দেখার পর আমি আর মৃতদেহ দেখতে পারি না। আমার নিকটাত্মীয় মারা গেলেও তাদের লাশ আমি আর দেখতে পারি না। এই যে গুলির বিকট শব্দ, দু'দিনের দৌড়াদৌড়ি, আর পানিতে ভাসমান লাশ দেখা-এটিই আমার জীবনের অবিস্মরণীয় বেদনা বিধূর স্মৃতি। আর সেদিনই আমার মনে হয় পাকিস্তান ধ্বংস হয়ে গেছে। এরপর থেকে আমার 'ওয়ার্ল্ড ডিজারমামেন্ট মুভমেন্ট' এ যোগ দেবার ইচ্ছা জাগলো। এর পরপরই 'মিলিটারি উইথড্রোল ফ্রম পলিটিক্স' বইটি রচনা করি আমি।

দৈনিক ইনকিলাব ২৩ মে ১৯৯৮

www.pathagar.com

২০ চিন্তার স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র বাংলাদেশ পরিস্থিতি

গণতান্ত্রিক তাত্ত্বিকরা এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় যেসব বিশ্ব নেতার ভূমিকা রয়েছে তারা সকলেই চিন্তার স্বাধীনতা ও স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকারের ওপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন। এমনকি অনেক সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন, যে কোনো প্রকারেই হোক পাশ্চাত্য জগৎ এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করতে পেরেছিল, যে পরিবেশ এই চিন্তার স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের অনুকূল ছিল। ফলে শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের রাজ্যে পাশ্চাত্য জগৎ নেতৃত্বের ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছিল। পক্ষান্তরে প্রাচ্য সামাজিক ব্যবস্থায় মুক্তচিন্তার পরিমণ্ডলের অভাবে প্রাচ্য দেশগুলো দর্শন ও জ্ঞান বিজ্ঞানে নেতৃত্বের ভূমিকায় আসতে সক্ষম হয়নি। বিংশ শতাব্দীর এই শেষ প্রান্তে যখন পাশ্চাত্যের কোনো কোনো দেশ চাঁদে বসবাসের চিন্তা করছে এবং বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড জয় করার চেষ্টা করছে, তখন আমাদের মতো পশ্চাৎপদ দেশে লক্ষ লক্ষ শিশু খাদ্যের অভাবে মৃত্যুবরণ করছে। উন্নয়ন অগ্রগতিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই যে বিরাট বৈষম্য তা বুঝতে হলে এর অন্তর্নিহিত সত্যকে বুঝতে হবে। আমার মনে হয় পাশ্চাত্য সমাজে যে ফ্রি স্প্রিরিট এবং অনুসন্ধিৎসু মনোভাব SPIRIT OF FREE ENQUIRY গড়ে উঠতে পেরেছিল, তার ফলে তারা উচ্চ হতে উচ্চতর জ্ঞানের স্বর্গে আরোহণ করতে পেরেছে। পাশ্চাত্যের এই জ্ঞান স্পৃহাকেই মূলত সেক্যুলার স্প্রিরিট বলা যায়। আমার মনে হয় আমাদের দেশের অনেক সম্মানিত বুদ্ধিজীবী পাশ্চাত্য জগতের এই 'সেক্যুলারিজমের' মূল তত্ত্বটা বুঝতে পারেননি তাই ধর্মের বিরুদ্ধে বলা, নৈতিকতার বিরুদ্ধে বলা, বাংলাদেশের স্বার্থের প্রতিকূলে কথা বলা, ভারতের মতো উচ্চাকাঙ্ক্ষী রাষ্ট্রের আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে কথা না বলা, এই সবই হলো আমাদের দেশের একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর কাছে সেক্যুলারিজমের প্রধান বৈশিষ্ট্য। যে কোনো কারণেই হোক, সেক্যুলারিজম সম্পর্কে আমাদের এই শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর মতামত আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে, তাদের চিন্তা ধারার অস্পষ্টতা এবং অস্বচ্ছতারই লক্ষণ বলে মনে হয়। সেক্যুলারিজম মুক্তচিন্তা, তারা গুটিকতক শব্দের মধ্যেই বন্দি করে ফেলেছে। যেমন ইসলামের নাম

www.pathagar.com

শুনলেই তারা সেখানে রাজাকারের ধুঁয়া তোলেন। বাংলাদেশের অখণ্ডতার পক্ষে কথা বললে, তারা নব্য রাজাকারের গন্ধ পান। ইসলাম ও মৌলবাদকে তারা এক করে দেখেন। অশ্লীলতাকে তারা প্রগতিশীল মনে করেন। উচ্ছৃংখলতাকে তারা আধুনিকতা মনে করেন। বিশ্বমানে যাওয়ার জন্য না বুঝেই পাশ্চাত্যের আনুষ্ঠানিকতাগুলোর অন্ধ অনুকরণ করেন। তাদের মতামতের সঙ্গে একমত হলেই একজন সেক্যুলার বা লিবারেল হয়ে যায়। ভিন্নমত পোষণকারীরা হন তাদের গালাগালির পাত্র। সেক্যুলারিজমের নামে তারা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে ফ্যাসিস্ট দর্শন লালন করেন। এক্ষেত্রে রেডিও, টেলিভিশন এবং তাদের মতবাদীয় পত্র-পত্রিকায় একটি বিশেষ দর্শনের একটানা প্রচার তাদের এই সংকীর্ণ মনোভাবেরই বহিঃপ্রকাশ।

ক্ষমতাসীন দল তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে টেলিভিশন ও রেডিও'র পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এ জন্য তারা পৃথিবীর সবচেয়ে স্বাধীন টেলিভিশন বিবিসি কিভাবে চলে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য একটি প্রতিনিধি দলও পাঠায়। আমি পত্রিকায় দেখেছি এই প্রতিনিধি দল ফিরে এসে রেডিও, টিভির স্বায়ত্তশাসনের জন্য কতগুলো সুপারিশ সরকারের কাছে উপস্থাপন করে। সেই সুপারিশমালা বাস্তবায়নের জন্য সরকার এ পর্যন্ত কোনো পদক্ষেপই নেয়নি। বরং রেডিও, টেলিভিশনকে সরকারিভাবে কঠোর নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। যা তথ্য সন্ত্রাসের সমতুল্য। তথ্য সন্ত্রাস, ভিন্নমত প্রকাশের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করা এবং বুদ্ধিজীবীদের সত্যিকার অর্থে মুক্তবুদ্ধি চর্চা প্রতিহত করা, এর নামই কি সেক্যুলারিজম? নাকি এটাই গণতন্ত্রের চর্চা?

২৬ মার্চ দৈনিক ইনকিলাব ১৯৯৮

www.pathagar.com

২১ সরকারি সন্ত্রাস ও মানবাধিকার লংঘন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের, মানবাধিকারের ওপর বাংলাদেশ কান্ট্রি রিপোর্ট নিয়ে দেশের বুদ্ধিজীবীরা পত্র-পত্রিকায় অনেক লিখছেন। কিন্তু বাংলাদেশের বর্তমান মানবাধিকার অবস্থা জানার জন্য মার্কিন সরকার প্রণীত কান্ট্রি রিপোর্ট পড়ার প্রয়োজন পড়ে না। গত ১৩ ফেব্রুয়ারি আমাকে যখন সেন্টার ফর রিসার্স অ্যান্ড এনালাইসিসের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের মানবাধিকারের বর্তমান অবস্থার ওপর বক্তৃতার জন্য টেলিফোনে অনুরোধ করা হচ্ছিল, তখন আমার হাতে ছিল সেদিনের হলিডে পত্রিকা। সেখানে অন্যতম প্রধান প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল 'গ্যাং টর্চার ইন পুলিশ কাস্টডি'। প্রসঙ্গটি পরিষ্কার হওয়ার জন্য ওই প্রতিবেদনের মূল বক্তব্য সংক্ষেপে উল্লেখ করা প্রয়োজন। ওই প্রতিবেদনে লেখা হয় যে, ২০ জানুয়ারি রাতে একজন মন্ত্রীর ছেলে এবং তার মামা ২৫/৩০ জন তরুণকে সঙ্গে নিয়ে ধানমন্ডি পুলিশ স্টেশনে ঢুকে কাস্টডি সেল ভেঙে থানা হাজতে রক্ষিত ২ জন যুবক সুজন ও কাওসারকে নির্দয়ভাবে প্রহার করে অবচেতন করে ফেলে। এই অমানুষিক বর্বরতা ঘটে পুলিশের সামনেই এবং পুলিশ নিষ্ক্রিয় ও অসহায়ভাবে এই নিষ্ঠুর আচরণ নীরবে প্রত্যক্ষ করে। এর আগে অন্যান্য পত্রিকাতেও আমি এই কাহিনীর একই রকম বিবরণ পড়েছি। সরকারের তরফ থেকে এর কোনো প্রতিবাদলিপিও প্রকাশিত হয়নি। যারা মানবাধিকার সম্পর্কে এতটুকু সচেতন, বাংলাদেশের মানবাধিকার লংঘন সম্পর্কে তাদের কি এই হৃদয়বিদারক ঘটনার চেয়ে বড় কিছু প্রমাণ দরকার আছে? আমি একটু লজ্জাবোধ করছি এজন্য যে, মন্ত্রী মহোদয়ের ছেলে 'তন্ময়' এই ঘটনার নায়ক। তিনি আমাদের নির্বাচনী এলাকা কাজীপুরের নির্বাচিত সংসদ সদস্য।

এভাবে পুলিশের সামনে সরকার 'লালিত বাহিনী'র দ্বারা সাধারণ মানুষের ওপর নির্যাতনের কাহিনী প্রায় প্রতিদিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। কোনো সভ্য সমাজে কেউ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগলে পুলিশের আশ্রয় পায় এবং এই আশ্রয়ই কোনো সভ্য দেশে সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়। আমরা সংবাদপত্রে পড়ি যে, 'সন্ত্রাসী' বা কোনো 'অপরাধীকে' পুলিশ রিমান্ডে পাঠানো হয়। পুলিশ রিমান্ডে থাকাকালীন এবং মামলা শুরু হওয়ার আগ

www.pathagar.com

পর্যন্ত পুলিশের নৈতিক ও আইনগত দায়িত্ব হলো, পুলিশের রিমান্ডে আশ্রিত ব্যক্তির সার্বিক নিরাপত্তা বিধান করা। কিন্তু পুলিশ রিমান্ডে রক্ষিত নারী পর্যন্ত পুলিশের অমানবিক নির্যাতনের শিকার হয় এবং অনেকে মৃত্যুও বরণ করে। এই মাত্র কয়দিন আগে, প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে প্রবেশের দায়ে জনৈক ব্যক্তিকে পুলিশ প্রহার করে মেরেই ফেলেছে। এসব ঘটনায় আমরা অতি শংকিতভাবে লক্ষ্য করছি, সরকার এসব ক্ষেত্রে পুলিশকে নির্দোষ প্রমাণ করার চেষ্টা করছে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আমরা প্রায়ই আলোচনা করি, রাজনৈতিক উন্নয়নের মাপকাঠিগুলো কি কি হতে পারে। এ নিয়ে পাশ্চাত্যের বড় বড় পণ্ডিত অনেক বড় বড় তত্ত্ব তৈরি করেছেন। এসব তত্ত্বের মধ্যে না গিয়েও বলা যায়, একটি দেশের পুলিশের আচার-আচরণ ও কার্যকলাপ সেই দেশের রাজনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান মাপকাঠি। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখেছি লন্ডন, ওয়াশিংটন, স্টকহোম, টোকিওতে এমনকি শিকাগো-নিউইয়র্কেও পুলিশ হলো জনগণের প্রকৃত বন্ধু। যে কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হলে নাগরিকরা পুলিশকে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ প্রতিষ্ঠান বলে মনে করেন।

এখন প্রশ্ন উঠে, আমাদের দেশের পুলিশ বাহিনী জনসাধারণের সঙ্গে কেন এত নির্দয় এবং নিষ্ঠুর আচরণ করেন এবং রক্ষকের ভূমিকা পালন না করে ভক্ষকের ভূমিকা পালন করেন? অনেক সমাজবিজ্ঞানী এ ব্যাপারে একটি তত্ত্ব দিয়ে থাকেন। তত্ত্বটি হলো, এটা সমাজের আধুনিকীকরণের অন্যতম চিহ্ন। বলা হয়, উন্নয়নকামী দেশগুলোতে প্রথমে প্রবল আশা-আকাঙ্ক্ষার বিপ্লব ঘটে, কিন্তু উন্নয়নের গতি এতই শ্লথ হয় যে, কোন সরকারই জনগণকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারে না। এর ফলে, হতাশার বিপ্লবের বিস্ফোরণ ঘটে। অনেকেই নিরাশাগ্রস্ত হয়ে বেআইনি ও অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়। এই অবস্থা পুলিশের জন্য বিনা কারণে অত্যাচার এবং উৎকোচ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে। বলা হয়, উপনিবেশিক আমল থেকে এই উপমহাদেশের পুলিশকে এমনভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং সামাজিকীকরণ করা হয়, পুলিশ যেন ভেবেই নেয় যে, জনগণ ও সরকার মুখোমুখি শত্রু। জনগণের ওপর অত্যাচার করাই পুলিশের প্রধান কর্তব্য এবং জনগণের ওপর অত্যাচার করলে কোনো শাস্তি তো হবেই না, বরং সরকার তাদের রক্ষায় এগিয়ে আসবে। ক্ষমতা প্রদর্শনের মনোভাবই (POWER ORIENTATION) আমাদের পুলিশ বাহিনীর মুখ্য কাজ। আর জনগণের সেবার (SERVICE ORIENTATION) প্রশ্নটি গৌণ।

আমার মনে হয়, শুধু আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়া এবং উপনিবেশিক ঐতিহ্য পুলিশ বাহিনীর অশুভ মানবাধিকারবিরোধী কার্যকলাপের জন্য দায়ী নয়। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, আমাদের দেশের অনির্বাচিত অথবা নির্বাচিত উভয় ধরনের সরকারের মধ্যেও সেবা দেওয়ার চেয়ে ক্ষমতা প্রদর্শনের (POWER ORIENTATION) মানসিকতা প্রচণ্ডভাবে লক্ষণীয়। তাই সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের আনুগত্য দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে যায়।

www.pathagar.com

আমাদের দেশের নেতারা গণতন্ত্র, মানবাধিকার এসব কথা বক্তৃতায় বললেও বাস্তব ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার নীতিমালা অনুসরণ না করে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসকে শাসন পরিচালনার কৌশল হিসেবে ব্যবহার করে এবং পুলিশকে সরকার সমর্থিত দল ও গ্রুপের বেআইনি কাজে সাহায্য করার জন্য উৎসাহিত ও নিয়োজিত করা হয়। তাই আমরা দেখি যে, কোনো সরকার পরিবর্তন হলেই সরকার সমর্থিত সন্ত্রাসী ছাত্র গ্রুপ এবং পুলিশের সহায়তায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের এবং কলেজের অধ্যক্ষদের (সরকার সমর্থিত না হলে ভয়-ভীতি ও চাপ প্রয়োগ করে) অফিস থেকে জোর করে বের করে দেওয়া হয় এবং তাদের স্থলে, সরকার সমর্থিত ব্যক্তিদের নানা কৌশলে এনে বসানো হয়। এরকম আইনবহির্ভূত কার্যকলাপ পরিচালনার জন্য আমাদের দেশের প্রধান দলগুলো অস্ত্রসজ্জিত সন্ত্রাসী গ্রুপ লালন ও পালন করে। ইউনিভার্সিটি ও কলেজের সাধারণ শিক্ষক ও ছাত্র সমাজ এই সন্ত্রাসী গ্রুপগুলোর তাণ্ডব নৃত্যের ফলে, নিতান্ত অসহায় এবং শংকিত অবস্থায়, কোনো রকমে তাদের কাজকর্ম চালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। আমাদের সাবেক ছাত্র-ছাত্রীরা যারা বিভিন্ন সরকারি কাজে উচ্চ পর্যায়ে নিয়োজিত আছেন, তাদের কাছেও শুনতে পাই যে, সকল ক্ষমতাসীন সরকারের লালিত সন্ত্রাসী গ্রুপের ভয়ে ও অত্যাচারে সরকারি কাজও তারা আইনানুগভাবে সমাধান করতে পারে না। এ অবস্থার ফলে, নির্বাচিত সরকারও ILLIBERAL DEMOCRACY তে পরিণত হয় এবং বিশেষ ক্ষমতা আইনের মতো কালো আইনগুলো ব্যবহার করে দেশ পরিচালনা শুরু করে। আমার মনে হয়, এই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস উচ্ছেদ করতে না পারলে, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা শূন্য স্লোগান হয়েই থাকবে।

রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসেরও বিভিন্ন রূপ আছে। শুধু পুলিশের অত্যাচারই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের একমাত্র নমুনা নয়। মহান ২১ ফেব্রুয়ারিতে শহীদ মিনারকে কেন্দ্র করে সরকার যা করেছে, তাকেও অনেকে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মধ্যে ফেলতে চান। টাকা-পয়সার ও মন্ত্রিত্বের লোভ দেখিয়ে বিরোধী দল থেকে এমপিদের নিজের দলে ভাগিয়ে আনার প্রবণতাও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের আর এক রূপ। সম্প্রতি দু'জন বিএনপি দলীয় এমপিকে মন্ত্রিত্ব (এবং অনেকের মতে বিপুল অর্থের বিনিময়ে) দিয়ে সরকারি দলে নিয়ে আসার অনৈতিক ও অগণতান্ত্রিক প্রবণতা রাজনৈতিক সচেতন মহলে দারুণ উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করেছে। ১৯৫৪-৫৮ সালে এ 'ঘোড়া বিক্রির' (HORSE TRADING) রাজনীতির ফলে তখনকার রাজনৈতিক অবস্থা কলুষিত হয়ে উঠে। সে অভিজ্ঞতা মনে রেখে, শেখ মুজিবুর রহমান নিজ উদ্যোগে ১৯৭২ সালে সংবিধানে ৭০ ধারা সংযুক্ত করেন। ১৯৯১ সালের দ্বাদশ সংশোধনীতে এই ধারাটি পুনরুজ্জীবীত করা হয় এবং অধিকতর শক্তিশালী ভাষায়, দল ত্যাগ কিংবা দলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভোটের কারণে সংসদ সদস্যের পদ শূন্য করার

www.pathagar.com

কথা সন্নিবেশিত করা হয়। বর্তমান সরকার ৭০ ধারার ভুল ব্যাখ্যা করে, সংসদে 'ঘোড়া বিক্রি' শুরুর প্রবণতা একথাই প্রমাণ করে যে, আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের গণতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য শুধু মৌখিক। তাদের রাজনৈতিক ব্যবহার ও কার্যকলাপ সত্যিকারের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিপন্থী। শাসকদলের কথা ও কাজে এই যে বিরাট ব্যবধান–সেটাই হলো আমাদের দেশের গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা।

শাসকদলের অনেকেই এখন সুশীল সমাজের তত্ত্ব প্রচার করে থাকেন। শাসক দল নিজেই সুশীল না হলে, সুশীল সমাজ সৃষ্টি করা কি সম্ভব?

দৈনিক ইনকিলাব ৫ মার্চ ১৯৯৮

www.pathagar.com

২২ চারদলীয় জোট ভারতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ

প্রশ্ন ॥ জনগণ মনে করছে দেশে এখন রাজনৈতিক সংকট চলছে। এই সংকটকে আপনি কিভাবে দেখছেন?

উত্তর ॥ দেশে সংকট তো চলছেই। বিরোধী দলগুলো এক হয়েছে এবং শাসক দল তাদের উপর মারমুখী হয়ে উঠছে। প্রতিদিন হরতাল এবং মিছিলে পুলিশ ও সন্ত্রাসীদের সঙ্গে সংঘাত হচ্ছে। দেশের জন্য তো এটা ক্রান্তিকাল বটেই।

প্র ॥ একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হিসেবে জাতীয় সংসদের কার্যক্রম সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কি?

উ ॥ সংবাদপত্রে দেখলাম বিচারপতি লতিফুর রহমান বলেছেন, সংসদ কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না। সকলকে দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে হবে। আমি মহামান্য বিচারপতির সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। স্পিকারের পক্ষপাতিত্ব এবং শাসক দলের বিরোধী দলকে সহ্য করার গুণ না থাকার জন্য সংসদ কার্যত অচল হয়ে গেছে। সুতরাং এই সংসদকে ভেঙে দেওয়াই ভালো।

প্র ॥ সরকার কি সংবিধান সমুন্নত রাখতে পারছে?

উ ॥ না। বিশেষ করে সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ ভঙ্গ করে তারা বিএনপির এমপি আলাউদ্দিন ও স্বপনকে দলে নিয়েছেন। এটা স্পষ্ট সংবিধান বিরোধী। তবে সংবিধান ছাড়াও কতগুলো গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ থাকে সেগুলো ছাড়া গণতন্ত্র অচল হয়ে পড়ে। রাজনীতিবিদদের মধ্যে শিষ্টাচারের অভাব থাকা, পরস্পরের বিরুদ্ধে বিষোদগার করা। কিংবা বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করা এসবই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিপন্থী। পত্রিকায় দেখেছি বিরোধী দলের ৭০ হাজার কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। তাদের হাজার হাজার কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এটা আইনের শাসনের লংঘন।

প্র ॥ উপনির্বাচন যেভাবে হলো, এরপর আগামী নির্বাচন কি সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে হতে পারবে?

www.pathagar.com

উ ॥ কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে হলে মোটামুটি সুষ্ঠু হবে। কিন্তু এই সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচন সুষ্ঠু হবে না। তা সিটি করপোরেশন কিংবা উপনির্বাচন হোক না কেন।

প্র ॥ বর্তমানের বিতর্কিত নির্বাচন কমিশন শক্তিশালী করতে আপনার কোনো পরামর্শ আছে কি?

উ ॥ সংবিধান অনুযায়ী তো নির্বাচন কমিশন খুব শক্তিশালী। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ইচ্ছে করে যদি তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে না চান তাহলে তো করার কিছুই নেই। যে কোনো কারণেই হোক বর্তমান প্রধান নির্বাচন কমিশনার যেহেতু বিতর্কিত হয়ে পড়েছেন, আমার মনে হয় যে, সৌজন্যমূলক কাজ হবে যদি তিনি নিজেই চলে যান এবং উভয় পক্ষ মিলে (সরকারি ও বিরোধী দল) একটা নতুন নির্বাচন কমিশন গঠন করে।

প্র ॥ জাতীয় প্রেক্ষাপটে চার নেতার সাম্প্রতিক শীর্ষ সম্মেলনের গুরুত্ব কতখানি?

উ ॥ এটাকে আমি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করি এবং তারা যে কর্মসূচি প্রকাশ করেছে সেটাকে আমি সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করি। এই নতুন জোট বিসমিল্লাহির রাহমানের রাহিমের আদর্শ, মহান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও ন্যায় বিচার বিশিষ্ট সত্যিকার বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের সফল বাস্তবায়নে সক্ষম হবে। এ জন্য আমি খুব খুশি। বর্তমান জাতীয় প্রেক্ষাপটে এটি আরো গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শক্তিগুলোর সমন্বয়ের ফলে ভারত কর্তৃক আমাদের দেশকে নানাভাবে ভয় দেখানো, বা পানির ন্যায্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত করা, সীমান্তে বারবার হামলা চালানো কিংবা সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে এটি একটি বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। আমি আশা করি জনগণ তাদের কার্যক্রমকে জোর সমর্থন দেবে।

দৈনিক সংগ্রাম, সাক্ষাৎকার, ২৮ ডিসেম্বর, ১৯৯৯
সাক্ষাতকার গ্রহণ : আলফাজ আনাম

www.pathagar.com

২৩ শেখ হাসিনা তাঁর বাবার মতো একজন খাঁটি ন্যাশনালিস্ট।

প্রশ্ন ॥ বাংলাদেশ রাজনীতির বর্তমান ধারা সম্পর্কে মন্তব্য করুন।

উত্তর ॥ আগামী সাধারণ নির্বাচন বাংলাদেশের ভাগ্য নির্ধারণ করবে। লড়াই হবে স্বকিয়তা আর নিজস্বতা রক্ষার। বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপর নানামুখী চাপ বাড়ছে। তিনি না চাইলেও তাঁকে দলের দিকে তাকিয়ে সব হজম করতে হচ্ছে। বঙ্গবন্ধুকেও এমনটা করতে হয়েছিল। দেশের অর্থনীতি ও সংস্কৃতিতে ভারতকে ডেকে এনেছে সরকারি ও বিরোধী দল। অথচ ভারতীয় গণতন্ত্রের নমনীয়তা ও উদারতা থেকে শিক্ষা নিতে আমাদের রাজনীতিবিদরা ব্যর্থ হয়েছেন। রাজনীতিবিদদের ব্যর্থতার বড় রকমের মূল্য দিতে হবে জনগণকে।

প্র ॥ দেশের মানুষ এখন কতটা স্বস্তিতে আছেন বলে আপনি মনে করছেন?

উ ॥ মানুষ কিছুটা অস্বস্তিতে আছে এটা ঠিক। তবে অস্বস্তির কিছুটা মাত্রা আছে। মানুষের স্বস্তি-অস্বস্তির অনেকটাই নির্ভর করে রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর। আবার রাজনীতিবিদদের কেউই ফেরেশতা নন। বর্তমান পরিস্থিতিতে আমি একটি ইতিবাচক দিক-নির্দেশনা পাচ্ছি। রাজনৈতিক অঙ্গনে একটি গ্রুপ চাচ্ছে ভারতের সহযোগিতা নিয়ে দেশ চালাতে। আরেকটি গ্রুপের মতে, ভারতের উপর এতখানি নির্ভরতা ঠিক নয়। কারণ, অতীতে ভারত কখনো আমাদের মঙ্গল চায়নি। স্বকিয়তা বজায় রাখতে গিয়েই, বঙ্গবন্ধু, জিয়া, এরশাদ এরা কেউই ভারতের রোষানল থেকে মুক্তি পাননি। ভারতকে কেন্দ্র করে আমাদের রাজনীতিতে এখন দু'টি ধারা স্পষ্ট। আগামী নির্বাচনে এ ব্যাপারে একটি দিক-নির্দেশনা আসবে এটা আমার বিশ্বাস। যদি সে নির্বাচন অবাধ এবং নিরপেক্ষ হয়। আমার ধারণা, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও দেশের অর্থনীতি ও রাজনীতিতে ভারতের প্রভাব-প্রতিপত্তি চান না। আক্ষরিক অর্থেই তিনি তাঁর বাবার মতো একজন খাঁটি ন্যাশনালিস্ট। কিন্তু পরিস্থিতি সম্ভবত তাঁর নিয়ন্ত্রণে নেই। ঘরে-বাইরে তিনি ভারতের চাপের মুখে পড়েছেন।

www.pathagar.com

মধ্যপ্রাচ্য থেকে আমাদের ধর্ম চর্চা অনেক বেশি উদার

প্র ॥ সাংস্কৃতিক অঙ্গনে এখন প্রায়ই একটি কথা শোনা যায় যে, আমরা একটি ঐতিহ্যহীন জাতি, এটা কি সত্যি?

উ ॥ সত্য নয়। 'ঐতিহ্য' মানে যে কোনো জাতির সংখ্যাগরিষ্ঠের ঐতিহ্য। ঐতিহ্য ক্রমাগত গড়ে ওঠে। যে কোনো জাতির ঐতিহ্যের মধ্যে ধর্মীয় মূল্যবোধ একটি বড় বিষয়। আমাদের এখানে যে ইসলাম ধর্মের চর্চা করা হয়, সেটা মধ্যপ্রাচ্যের ইসলাম থেকে অনেক বেশি নমনীয়। পাশ্চাত্যের ধর্ম চর্চা থেকে আমাদের ধর্ম চর্চা আরো বেশি উদার। সে হিসেবে কোনো জাতিই ঐতিহ্যহীন নয়। 'মাইনরিটি রাইটস্' আমাদের ধর্মের মধ্যেই আছে। এখানে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন অবান্তর। ইসলাম নিজেই অসাম্প্রদায়িক ধর্ম। সেক্যুলারিজম আমাদের কাছে নতুন কিছু নয়। সুতরাং আমাদের ঐতিহ্য নেই, যারা বলে তারা আসলে মূর্খ। আমাদের রবীন্দ্রনাথ আছেন, নজরুল আছেন, আছেন ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। 'সবার উপরে আছে আমাদের স্বাধীনতা' এর চেয়ে বড় ঐতিহ্য আর কি হতে পারে। এই ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে আমরা অগ্রসর হতে পারলে আমাদের রাষ্ট্রীয় ভিত্তি আরো মজবুত হবে।

প্র ॥ 'ভারতকে কেন্দ্র করে আমাদের রাজনীতিতে এখন দু'টি ধারা স্পষ্ট'-এ মন্তব্য থেকে আপনি কি বোঝাতে চেয়েছেন?

উ ॥ একেবারে স্পষ্ট। কারণ, একদিকে চারদলীয় জোট বিস্‌মিল্লাহ, আল্লাহর উপর বিশ্বাস ও দেশের স্বাধীনতাকে আদর্শের ভিত্তি হিসেবে দাঁড় করিয়েছে। এরা ভারতের বিরুদ্ধে মধ্যপ্রাচ্য ও চীনের সমন্বয়ে একটি কাউন্টার ব্লক সৃষ্টি করতে চায়। আর অন্যদিকে রয়েছে ভারতের প্রতি নতজানু নীতি। যার একটি সাংস্কৃতিক ভিত্তিভূমিও রচিত হয়েছে। আমার মনে হয় এবার একটি ফয়সালা হয়ে যাবে।

প্র ॥ আপনি কি মনে করেন এখানে আমেরিকার কোনো ভূমিকা নেই?

উ ॥ হ্যাঁ অবশ্যই আছে। তারা সজাগ গ্যাস এবং তেলের স্বার্থে। তবে চীনের সঙ্গে সখ্যের কারণে আমেরিকাকে এক্ষেত্রে 'মন্যুভারিং' করা সহজ হবে। চীনের সঙ্গে সখ্য খুবই প্রয়োজন। কিন্তু ভারতের সঙ্গে মাত্রাতিরিক্ত সখ্যের কারণে আমেরিকাই লাভবান হবে। প্রধানমন্ত্রী না চাইলেও ভারতে গ্যাস বিক্রির সিদ্ধান্ত তাঁকে নিতে হতে পারে। যা আমাদের জন্যে খুবই আত্মঘাতী হবে বলে আমি মনে করি।

প্র ॥ কিন্তু মানুষ তো মনে করে ভারতকে খুশি করার প্রতিযোগিতায় আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি দু'টি দলই সমান প্রতিদ্বন্দ্বী?

উ ॥ ঢালাওভাবে কথাটি ঠিক নয়। বিএনপি আবার এলে ভারতের প্রভাব-প্রতিপত্তি কিছুটা কমবে। বিশেষত সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক চাপ থেকে মানুষ মুক্ত হবে।

www.pathagar.com

বিএনপি আমলে অর্থনীতি একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়

প্র ॥ এ বিষয়টি কে না জানে যে, বিএনপি আমলে সাইফুর রহমান বাংলাদেশের অর্থনীতি ভারতের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। যার কুফল বর্তমান সরকারকেও বইতে হচ্ছে?

উ ॥ বিএনপির পাঁচ বছরের শাসনামলে অন্তত সাংস্কৃতিক দিকটি রক্ষা পেয়েছিল। তবে অর্থনীতিকে সাইফুর রহমান ভারতের কাছে উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন এটা একশ' ভাগ সত্য। তিনি সেটা করেছেন বিশ্বব্যাংকের পরামর্শে। এক বছরের জন্য বিশ্বব্যাংকের চেয়ারম্যানশিপ পেয়ে আনন্দে গদ গদ হয়ে তিনি এ অপকর্ম করেছেন। এতে অর্থনীতি একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়। আমার ধারণা বিএনপি আবার ক্ষমতায় এলে সাইফুর রহমান আর অর্থমন্ত্রী হতে পারবেন না। আমাদের জাতীয় স্বকীয়তা প্রস্ফুটিত হলে ভারতও আমাদেরকে সম্মান দেবে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার পরামর্শে প্রতারিত হয়ে বিএনপি ভারতকে অনেক সহযোগিতা দিয়েছে। তখন ভারতও আমাদের কাছ থেকে বেশকিছু সুবিধা নিয়েছে। আমার মনে হয় এটা খালেদা জিয়ার অজ্ঞতার কারণেই হয়েছিল।

প্র ॥ বর্তমান সরকারের আমলে ভারতকে সুবিধা দেওয়ার কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য দিতে পারবেন কি?

উ ॥ হ্যাঁ, যেমন গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তিতে কোনো আরবিট্রেশনের ব্যবস্থা নেই। এক পক্ষ চুক্তি লঙ্ঘন করলে আরেক পক্ষ আন্তর্জাতিক আদালতে যেতে পারবে না। এছাড়া সর্বনিম্ন পানি প্রাপ্তির কোনো 'গ্যারান্টি ক্লজ'ও নেই। আমি শুনেছি, বাংলাদেশের আমলারা প্রথম এ চুক্তিতে রাজি ছিলেন না। তারা চুক্তি না মানতে চাইলে ভারত নাকি স্পষ্ট করে বলেছিল, এটা না মানলে বাড়িতে চলে যান। কিন্তু আমার মনে হয়, চুক্তি না মেনে তাদের চলে আসাই ভালো ছিল।

প্র ॥ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কি?

উ ॥ বঙ্গবন্ধুকে আমি সার্থক মনে করি বাংলাদেশের একজন স্থপতি হিসেবে। একজন স্থপতি এবং ফাউন্ডার লিডার। কিন্তু তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন বাংলাদেশকে নির্মাণ করতে। তাঁকে প্রকৃত অর্থে 'ফাদার অব দ্যা নেশন' বলা যায় না। কারণ ফাদার হতে হলে অনেক বড় মাপের মানুষ হতে হয়। যেমনটা হয়েছিলেন নেলসন ম্যান্ডেলা, গান্ধী। স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ছেড়েছেন নেলসন ম্যান্ডেলা। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের গুণাবলী বাংলাদেশের স্বাধীনতা এনে দিয়েছিল। তিনি সোহরাওয়ার্দীর মতো একজন সাংবিধানিক ব্যক্তি ছিলেন। ক্ষমতায় এসে এডহক ভিত্তিতে দেশ চালিয়েছিলেন। কোনো সিস্টেম ছিল না। সারাজীবন আন্দোলন করে গেছেন। মানুষকে দয়া দেখিয়েছেন। তাঁর কাছে সিস্টেম আশা করাও উচিত নয়।

www.pathagar.com

প্র ॥ আগামী জাতীয় নির্বাচনকে কিভাবে মূল্যায়ন করছেন?

উ ॥ আমাদের সামনের নির্বাচনটি খুবই জটিল হবে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, ১৯৭৫ সালে রক্তপাতের মাধ্যমে আদর্শের লড়াই হয়েছিল। এবার হবে ভোটের মাধ্যমে। আমাদের দু'নেত্রীর পরীক্ষা হবে এখানেই। আমি আশা করি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং বিরোধীদলীয় নেত্রী খালেদা জিয়া তাঁদের যোগ্যতার প্রমাণ রাখবেন। আগামী নির্বাচনটি একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্ব পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের অবস্থান নির্ধারণ করবে। আমার মনে হয় গণতান্ত্রিকভাবে দেশের আদর্শও নির্ধারিত হয়ে যাবে।

প্র ॥ বর্তমান বিরোধীদলীয় জোট সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?

উ ॥ আমার মনে হয় আগামী জাতীয় নির্বাচনে জিততে না পারার আশংকা থেকেই খালেদা জিয়া এরশাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। এটা খুবই সময়োপযোগী হয়েছে তাঁর জন্য। তবে এ জোটে লাভবান হয়েছেন এরশাদ। জাতীয়তাবাদী শক্তির ভোট যাতে ভাগাভাগি না হয় এ জন্যই জোট গঠন। তদুপরি সেনাবাহিনীর সাধারণ সৈন্যদের মধ্যে এরশাদের জনপ্রিয়তা এখনো বেশি। যদিও অফিসার পর্যায়ে তেমন জনপ্রিয়তা নেই।

প্র ॥ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বর্তমানে আমাদের অবস্থান কি?

উ ॥ ভারতের লেজুড়বৃত্তি করার কারণে আমাদের আন্তর্জাতিক কোনো সম্মান নেই। তবে হঠাৎ করে তেল-গ্যাস প্রাপ্তিতে আমাদের কদর বেড়েছে। ক্লিনটনও আসতে চান। এদের আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য বাংলাদেশের ওপর চাপ প্রয়োগ করা। ভারতের কাছ থেকে এবং বাইরে থেকেও শেখ হাসিনার উপর নানামুখী চাপ বাড়ছে।

বঙ্গবন্ধু হত্যায় জিয়া, খালেদ শফিউল্লাহ খুশী হয়েছিলেন

প্র ॥ শেখ হাসিনার সঙ্গে খালেদা জিয়ার দূরত্বের প্রধান কারণ কি মনে হয়?

উ ॥ শেখ হাসিনার ধারণা, বঙ্গবন্ধু হত্যার সঙ্গে জিয়াউর রহমান জড়িত। আসলে এটা মিথ্যা। কারণ, সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যাও ছিল বিশেষ ধরনের একটি ক্যু। ১৯৫৮ সালে ইরাকের আমেরিকাপন্থী প্রধানমন্ত্রী নূরুস সাঈদকেও অনুরূপভাবে হত্যা করা হয়েছিল। কিছু সৈন্য ভেবেছিল তাঁকে হত্যা করলেই বুঝি সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড কিছু সৈন্যের দ্বারা সংঘটিত হলেও শুধু জিয়া নয়, দুর্ভাগ্যজনকভাবে খালেদ মোশাররফ এবং জেনারেল শফিউল্লাহও খুশি হয়েছিলেন। কারণ, তখন ক্ষমতার মালিক বনে যায় ক্যান্টনমেন্ট। যদিও জিয়া ছাড়া আর কেউই এই ক্ষমতা উপভোগ করতে পারেননি। সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যা ছিল অনেকটা অপরিকল্পিত, পাগলের কাজ। ক্যু হতোই। তবে সে ক্যু'র জনক হতো খালেদ মোশাররফ। খালেদ মোশাররফ খুবই উচ্চাকাঙ্ক্ষী এক সেনা অফিসার ছিলেন। জিয়া ও শফিউল্লাহ এতোটা নন।

www.pathagar.com

প্র ॥ আমরা এখন রাজনীতির প্রতি মানুষের আস্থাহীনতা দেখি। এর কারণ কি?

উ ॥ রাজনীতিবিদদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা কম-বেশি সব দেশেই আছে। তথাপি ঘুরে-ফিরে রাজনীতির কাছেই আমাদের ফিরে যেতে হয়। ভারত, যুক্তরাষ্ট্র সব দেশেই রাজনীতিবিদদের সম্পর্কে মানুষের আস্থাহীনতা আছে। আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি। আমি কানাডায় পড়তে গেছি। বেড়াতে এসেছি নিউইয়র্কে। একটি হোটেলে বসে এক আমেরিকানের সঙ্গে কথা বলছিলাম। জিজ্ঞেস করলো আমি কি পড়ছি। উত্তরে বলেছিলাম, আমি রাজনীতি বিজ্ঞান পড়ছি। লোকটি তখন উত্তেজিত হয়ে আমাকে গালিগালাজ করে বললো, কেন তুমি ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছো না। যুক্তরাষ্ট্রের যে কোনো শহরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ডাক্তার। তারপর শিল্পপতি, প্রকৌশলী। চতুর্থ স্থানে রাজনীতিবিদ। আমাদের এখানে আস্থাহীনতা একটু বেশি হবার কারণ বোধহয় এখানে রাজনীতিবিদরা স্বপ্ন দেখায় বেহেশতের। নিয়ে যায় দোযখে। আসলে ইংরেজিতে একটি কথা আছে Politicians are necessary evils. আমার মনে হয় সবখানেই এ কথাটি খাটে। আমেরিকার লোকেরা যেমন বলে সবাই খারাপ, শুধু প্রেসিডেন্ট ভালো। যুক্তরাজ্যে বলে রাণী এবং প্রধানমন্ত্রী ছাড়া আর সবাই খারাপ। ভারতেও যেমন বাজপেয়ীকে তার ঘোর শত্রুরাও বলে Right man in Wrong Party.

ভারতের গণতন্ত্র থেকে শিক্ষা নিয়ে রাজনিতিকরা ব্যর্থ হয়েছেন

প্র ॥ গণতন্ত্র নিয়ে আমাদের দেশে সংজ্ঞার শেষ নেই। বিশেষত সরকারি দলের কাছে এক রকম, বিরোধী দলের কাছে আরেক রকম। আসলে গণতন্ত্রের কোনো মডেল কি আমরা উপস্থাপন করতে পারি?

উ ॥ একশ' ভাগ গণতন্ত্রের দেশ পৃথিবীর কোথাও নেই। আমাদের বিবেচনায় যেমন যুক্তরাষ্ট্রে ৮০ ভাগ, যুক্তরাজ্যে ৮৫ ভাগ, ভারতে ৬০ ভাগ গণতান্ত্রিক রীতি পদ্ধতি চর্চা করা হয়। বাংলাদেশে এ ক্ষেত্রে ৩০ ভাগ। নিজেদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কে ব্রিটিশরা যে কতটা গর্বিত তার প্রমাণ আমি পেয়েছিলাম বহু আগে। ১৯৬৩ সালে প্রথম আমি লন্ডনে বেড়াতে যাই। ভাবলাম এসেছিই যখন 'হাউজ অব কমন্স' না দেখে যাই কি করে। পাতাল রেলে চড়ে স্টেশনে নেমে এক সাধারণ গোছের লোককে জিজ্ঞেস করলাম, ভাই হাউজ অব কমন্সে কি করে যাবো? লোকটি শুধু পথ দেখিয়েই ক্ষান্ত হলো না, নিজে আমাকে হেঁটে হাউজ অব কমন্সের সামনে নিয়ে এলো। কি গর্ব ভরেই না সে আমাকে বললো, এই যে দেখো আমাদের হাউজ অব কমন্স। সারা বিশ্বকে আমরা এখান

www.pathagar.com

থেকে গণতন্ত্র শিখিয়েছি। মাদার অব অল পার্লামেন্টস। আমার ধারণা, এই বোধ ব্রিটিশ জাতিকে আরো শক্তি যুগিয়েছে। এখন ভারতও এই বোধ থেকে শক্তি পাচ্ছে। ভারতের দারিদ্র্য চীনের চেয়ে বেশি। কিন্তু গণতন্ত্রের গর্ব তাদের আছে। গণতন্ত্র রক্ষা করা তাদের জন্য চ্যালেঞ্জ। ওরা সহজে সেটা নষ্ট করবে - তাদের এই বোধ থেকে আমাদের শিক্ষনীয় আছে। ভারত থেকে শিক্ষণীয় এটাই . কিন্তু ভারতীয় গণতন্ত্রের নমনীয়তা ও উদারতা থেকে শিক্ষা নিতে আমাদের রাজনীতিবিদরা ব্যর্থ হয়েছেন। ভারতের টেকনোলজি এখনো থার্ড গ্রেডে রয়ে গেছে। আমাদের তা গ্রহণ করা ঠিক হবে না। অবশ্য গণতন্ত্র ছাড়া তাদের গর্ব করার মতো আর আছে লতা মুঙ্গেশকর।

প্র ॥ ভারতে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকতা পাবার কারণ কি বলে আপনি মনে করেন?

উ ॥ ভারতে মধ্যবিত্তের সংখ্যা বেশি। অনেক ট্যালেন্টেড লোক আছে। ব্রিটিশ শিক্ষায় শিক্ষিত। গণতন্ত্রের শুভবুদ্ধি ভারতীয় রাজনৈতিক নেতাদের আছে। তারা জাতীয় স্বার্থে সরকার ও বিরোধী দল মিলে একত্রে . থা বলতে পারে। ভারতীয় ঐক্যের ব্যাপারে তারা সবাই একমত। জ্যোতি বসু মনে করেন না যে, বাংলা ভেঙে তিনি ওখানকার রাজা হবেন। ভারত জুড়েই সেন্ট্রাল সরকারের অবস্থান এখন অনেক শক্তিশালী। একদিন তারাও নিশ্চয় অনেক উপরে উঠবে। তথাপি গত ৫০ বছরে ওদের সুপার পাওয়ার হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু হতে পারেনি। এখনো ত্রিশটি গরিব দেশের কাতারে তাদের নাম রয়ে গেছে।

আওয়ামীলীগ খুবই নিষ্ঠুর
বিএনপি কম নিষ্ঠুর

প্র ॥ আমাদের দেশে রাজনৈতিক কোন্দল মেটাতে প্রেসিডেন্টের ভূমিকা সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কি?

উ ॥ আমাদের প্রেসিডেন্ট খুবই ভালো ব্যক্তি। তিনি জানেন তাঁর ক্ষমতা খুব কম। আমার ধারণা তিনি সরকারপ্রধানকে ভালো বুদ্ধিই দেন। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান হয়ে তিনি যে আদর্শ স্থাপন করেছিলেন, প্রেসিডেন্ট হয়ে তার সবটাই ম্লান করে দিয়েছেন। তাঁর ব্যক্তিত্বকে পুঁজি করে লাভবান হয়েছেন হাসিনা।

প্র ॥ আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখতে পান কি?

উ ॥ আওয়ামী লীগ খুবই নিষ্ঠুর দল। সে তুলনায় বিএনপি কম নিষ্ঠুর। জাতীয় পার্টির উপজেলা পদ্ধতির মতো বেশকিছু পদক্ষেপকে আমি সমর্থন করি।

প্র ॥ নাগরিক জীবনের সমস্যা আপনাকে পীড়া দেয় কি না?

www.pathagar.com

উ ॥ আমাদের ঢাকা এখন ব্যাংককের চেয়ে খারাপ হয়ে গেছে। এক সময় কলকাতাও খুবই বিশৃংখল ছিল। এখন তারা তাদের নগরীকে অনেক বেশি বাসযোগ্য করে ফেলেছে। আর আমরা পিছিয়ে পড়েছি। আইনের প্রতি আমাদের এখানে নাগরিকদের শ্রদ্ধাবোধ নেই। হানিফ শুরু করেছিলেন মন্দ না। কিন্তু দলতো পারলে তার চামড়া ছিলে খায়।

প্র ॥ আগামী শতাব্দীর সূচনালগ্নে কেমন প্রধানমন্ত্রী চান?

উ ॥ এমন একজন প্রধানমন্ত্রী চাই, যিনি নিজের বুদ্ধিতে চলবেন। কোনো চাপের কাছে নতি স্বীকার করবেন না। কেউ যদি তাঁকে চাপ দেয়, যুক্তিতে তাঁকে জিততে হবে। দেশের মঙ্গলের কথা তাঁকে বলতে হবে। তাঁর কাছে প্রথম ও শেষ কথা হবে বাংলাদেশ। দূরদর্শিতা তো থাকতেই হবে। এই গুণ সোহরাওয়ার্দী সাহেবের ছিল। ১৯৫৬ সালে বাঙালিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও, তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে ৫০-৫০ ক্ষমতার ভাগাভাগি মেনে নিয়েছিলেন। তখন পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনসংখ্যা অনুপাত ছিল যথাক্রমে ৫৬ শতাংশ ও ৪৪ শতাংশ। কট্টরপন্থী মুসলিম লীগের নাজিমউদ্দীনও সেটা মেনে নেন নি। কিন্তু সোহরাওয়ার্দী যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে, সংবিধান প্রণয়নের স্বার্থে এটা মেনে নেয়া উচিত এবং রসচ্ছলে বলেছিলেন, সেদিন বেশি দূরে নয়, পশ্চিম পাকিস্তান জনসংখ্যার দিক দিয়ে আমাদের ছাড়িয়ে যাবে। সত্যিই এখন পাকিস্তানের জনসংখ্যা আমাদের চেয়ে বেশি।

প্র ॥ নতুন প্রজন্মের জন্য কি কথা রেখে যাচ্ছেন?

উ ॥ আমরা স্বাধীনতা এনেছি। অনেক কষ্টের মধ্যেও স্বাধীনতা আমরা টিকিয়ে রেখেছি। সার্বভৌমত্ব বজায় রেখেছি। অথচ বিশ্বে এমন দেশও আছে, যেমন, কঙ্গো, জায়ারে, সোমালিয়া এসব দেশ গৃহযুদ্ধে একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেছে। আমরা টিকে গেছি স্বাধীন জাতির স্বকিয়তা ও মর্যাদা নিয়ে। খুব সাফল্য লাভ করতে পারি নি। আবার খুব খারাপও করি নি। কোনো সম্পদ নেই। চারপাশে একটি শক্তিশালী বৃহৎ দেশ। আমাদের টিকে থাকা একেবারে কম কথা নয়। এ জন্যই আমাদের স্বাধীনতা রক্ষা করতে হবে। দেশটা যে আমাদের কত বড় সম্পদ, তা বাইরে না গেলে উপলব্ধি হয় না। একদিন ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ে আছি সিঙ্গাপুর বিমান বন্দরে। পকেটে তেমন টাকাও নেই। কিন্তু বিমানবন্দরে বাংলাদেশের পতাকা দেখে আমার ক্ষুধা সত্যিই চলে গেল।

www.pathagar.com

প্র ॥ বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কোনো বাড়াবাড়ি হচ্ছে বলে কি আপনার মনে হয়?

উ ॥ আমার তো মনে হয়, বাড়াবাড়ি করে তাঁর দ্বিতীয় মৃত্যু ডেকে আনা হচ্ছে। যে বঙ্গবন্ধু এ দেশের স্বাধীনতার জনক, তাঁকে সামনে রেখে কিছু সুবিধাভোগী লোক আখের গোছাচ্ছেন। জাতীয় জীবনের সংকটের মুখোমুখি দাঁড় করাচ্ছেন একটিমাত্র ব্যক্তিকে। আমি আশা করবো তারা সেটা করবেন না।

বাংলাবাজার পত্রিকা, ডিসেম্বর ২৭, ১৯৯৯
সাক্ষাৎকার গ্রহণ : চৌধুরী জহিরুল ইসলাম

www.pathagar.com

২৪ গ্যাস রফতানির সিদ্ধান্ত হবে দেশদ্রোহিতার শামিল

প্রশ্ন ॥ বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সংকট কোথায় এবং এর সম্ভাবনা কতটুকু?

উত্তর ॥ উন্নয়নশীল দেশে নিরপেক্ষ নির্বাচন করা কঠিন ব্যাপার। সুতরাং গণতন্ত্রের ভিত্তি হিসেবে এমন ব্যবস্থা থাকা দরকার যেখানে নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত হবে। তারপর নির্বাচিত সরকার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধগুলো মেনে চলবে। যদিও আজকাল বলা হয়ে থাকে যে, আশির দশক থেকে মিলিটারি রুল শেষ হয়ে যাওয়ার পর গণতন্ত্রের যুগ এসেছে। কিন্তু এই যুগের নির্বাচিত সরকারগুলোর কার্যাবলী পর্যালোচনা করে অনেক সমাজ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এখন একটা নতুন ক্যাটাগরি সৃষ্টি করেছেন। এটাকে তারা অভিহিত করেছেন 'ইললিবারাল' ডেমোক্রেসি হিসেবে। অর্থাৎ নির্বাচিত সরকারগুলো গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হয়ে স্বৈরাচার হয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশেও আমরা এই ক্যাটাগরির গণতন্ত্র দেখতে পাচ্ছি। এসবের তাৎপর্য হচ্ছে এই যে– গণতন্ত্র একদিনে হয় না। এজন্য জনসাধারণকে সব সময় সচেতন থাকতে হয়। তার কারণ হচ্ছে, উন্নয়নশীল দেশে একজন ক্ষমতা পেলে তা যে কোনো প্রকারেই হোক না কেন, সে ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়। সুতরাং গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম একটি চিরন্তন সংগ্রাম। এ সংগ্রাম চলতেই থাকে।

প্র ॥ আজকাল অনেকেই বলে থাকে উন্নয়নের একমাত্র শর্ত হচ্ছে গণতন্ত্র। এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

উ ॥ এটা একপেশে কথা। উন্নয়নের জন্য দরকার প্রাকৃতিক প্রাচুর্য, প্রযুক্তি ও শিক্ষার হার। এগুলো থাকলে গণতন্ত্র এমনিতেই এগিয়ে যায়।

প্র ॥ বর্তমানে বাংলাদেশে যে গণতন্ত্রের চর্চা চলছে তার ভবিষ্যৎ কি?

উ ॥ বাংলাদেশের বর্তমান রাজনীতিতে আমি দু'টি ধারা লক্ষ্য করছি। এর একটি ধারা হচ্ছে- ভারতের সাহায্য ও বন্ধুত্বের মাধ্যমে দেশের উন্নতি সাধন করতে চাওয়া। আর অন্য ধারায় যারা আছেন, তারা মনে করেন, ভারত এই বন্ধুত্বের নামে আমাদের ওপর পরিবেশগত, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চালাচ্ছে। যেমন, বাংলাদেশের

www.pathagar.com

জনগণের ন্যায্য পানির অধিকার থেকে ভারত বঞ্চিত করেছে। এছাড়া যেমন আওয়ামী বুদ্ধিজীবীদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বুলি যা আমাদের ভারতীয় সাংস্কৃতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের সামনের কিছু মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কর্মকাণ্ডের কথা বলতে চাই। সলিমুল্লাহ মুসলিম হল তৎকালীন মুসলমানদের প্রেরণার উৎস ছিল। অথচ আজ সেই সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের পাশে একটি বিরাট চত্বরে বিরাট স্তম্ভ তৈরি করে শেখ মুজিবুর রহমানের মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। এতে আমি অবাক হইনি। তবে সেখানে ছোট ছোট নানা রকমের অসংখ্য যে মূর্তি বসানো হয়েছে তা আমাদের আরব দেশের জাহেলিয়াত যুগের তিনশ মূর্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এছাড়া বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি অনুষ্ঠানে ধূপধুনো, উলুধ্বনি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এর মাধ্যমে যে কৌশলে আমাদের ইসলামী মূল্যবোধকে ধ্বংস করা হচ্ছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বাংলাদেশের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে ইসলামী মূল্যবোধ ও চেতনাকে জাগিয়ে রাখতে হবে। কারণ, ইসলামী মূল্যবোধই হচ্ছে আমাদের রক্ষাকবচ। এসব কথা বলার জন্য কেউ হয়তো আমাকে 'সাম্প্রদায়িক' বলতে চাইবে। তবে এর উত্তরে আমি বলবো, ইসলাম ধর্মই হচ্ছে অসাম্প্রদায়িক।

সংখ্যালঘুদের অধিকার নিশ্চিত হয়
সংখ্যাগরিষ্ঠের দৃষ্টিভঙ্গির ওপর

আমি এ কথা এ কারণেই বলছি যে, পাশ্চাত্যে গণতন্ত্রের গর্ব হচ্ছে তারা সংখ্যালঘুদের অধিকার স্বীকার ও মান্য করে। আর এই সংখ্যালঘুদের অধিকার প্রথম স্বীকৃতি দেন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)। রাসূল (সাঃ)-এর ঐতিহাসিক মদিনা সনদে সংখ্যালঘুদের এই অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। তাই ইসলামী মূল্যবোধ থাকলে সংখ্যালঘুরা প্রটেক্টেড থাকবে। আর এটা তো সত্যি যে, সংখ্যালঘুদের অধিকার নিশ্চিত হয় মূলত সংখ্যাগরিষ্ঠের দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। আমরা যখন ইসলামী জাতীয়তাবাদের কথা বলি, তখন সাম্প্রদায়িকতার কথা বলি না। ইসলাম হচ্ছে সার্বজনীন ধর্ম, সকল ধর্ম ও বর্ণের স্বার্থ রক্ষা করে ইসলাম। আর ওইসব কারণেই সম্প্রতি চার নেতার যে শীর্ষ বৈঠক ও ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাকে স্বাগত জানাই। কারণ জাতির এই ক্রান্তিকালে যেসব ইসলামী মূল্যবোধসম্পন্ন দলগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়েছে তারা বিগত নির্বাচনের হিসাবে শতকরা ৬৭ ভাগ ভোটের প্রতিনিধিত্ব করছে। আগামীতে কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে নির্বাচন হলে এসব দল বিপুলভাবে বিজয়ী হবে বলে আমি মনে করি।

প্র ॥ পানি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি এবং প্রস্তাবিত ট্রানজিট সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কি?

www.pathagar.com

উ ॥ গঙ্গার পানি এবং তথাকথিত পার্বত্য শান্তিচুক্তি, প্রস্তাবিত ট্রানজিট ও চট্টগ্রাম বন্দর ভারতকে ব্যবহার করতে দেওয়ার প্রস্তাব- এগুলো আওয়ামী লীগের '৯৬-এর নির্বাচনী ইশতেহারে ছিল না। তাই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ দাবি করে এসব বিষয়ে জনগণের কাছ থেকে নতুনভাবে ম্যান্ডেট নেওয়া। এক্ষেত্রে মধ্যবর্তী নির্বাচনই এই সঙ্কট উত্তরণের একমাত্র পথ।

প্র ॥ কোন ধরনের নিরাপত্তা নীতি হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?

উ ॥ একটি দেশের নিরাপত্তা চূড়ান্ত পর্যায়ে নির্ভর করে দেশবাসীর নিখাদ দেশপ্রেমের ওপর। বর্তমানে যে যুদ্ধ হয়; সেটা হয় সর্বাত্মক যুদ্ধ (Total war) অর্থাৎ একদিকে অস্ত্রের যুদ্ধ; অন্যদিকে আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও প্রোপাগান্ডা যুদ্ধ। এ ধরনের যুদ্ধের ক্ষেত্রে দেশকে রক্ষা করতে পারে প্রচণ্ড দেশপ্রেম। এ ধরনের দেশপ্রেম দেখিয়েছেন ভিয়েতনামিরা আমেরিকার বিরুদ্ধে; আফগানরা রাশিয়ার বিরুদ্ধে। আমেরিকার পেটের মধ্যে কিউবা এখনো টিকে আছে, সে দেশের জনগণ অসাধারণ দেশপ্রেম প্রদর্শন করে। সুতরাং বাংলাদেশের নিরাপত্তা বা প্রতিরক্ষার মূল হাতিয়ার হচ্ছে ইসলামী চেতনাবোধে উদ্বুদ্ধ বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ। অর্থাৎ আমরা বাংলাদেশীরা কেবল পশ্চিমবঙ্গ ও ভারত নয়, পৃথিবীর সব দেশ থেকেই স্বতন্ত্র। আমাদের ভৌগোলিক সীমানা, আমাদের নদ-নদী, আমাদের দেশের উর্বর মাটি, দেশের সাধারণ মানুষের প্রচণ্ড ইসলামী মূল্যবোধ, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস- এসব মিলিয়েই আমাদের বাংলাদেশী চেতনাবোধ। এই চেতনাবোধ অনন্য। এই অনন্যতাই আমাদের গৌরব, আমাদের অহংকার।

বাঙালিরাই পৃথিবী সবচেয়ে
বিশৃঙ্খল জাতি তাই মিলিটারি
ট্রেনিং অপরিহার্য

আমরা বাংলাদেশী জাতি হিসেবে এই পৃথিবীর বুকে আদর্শবাদী উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হবো- এটাই আমাদের দেশের রাজনীতির মূল লক্ষ্য। তাই রাজনীতিকে এমন হতে হবে যে, তাতে আমাদের স্বাতন্ত্র্য থাকবে। এ ধরনের স্বতন্ত্রবোধ, জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেম আমি দেখেছি জাপান, কানাডা, আমেরিকাসহ বহু দেশে। অন্য কোনো আদর্শের চেয়ে জাতীয়তাবাদই এসব দেশকে সমৃদ্ধশালী করার ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। এই দেশপ্রেমের কারণেই এসব দেশের জনগণকে দেশগড়ার কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে দেখা গেছে। দেশের কোনো ক্ষতি হোক এমন কোনো কাজ তারা করেন না। তাই আমরা যে মতেই বিশ্বাস করি না কেন, বাংলাদেশের ক্ষতি হোক এটা যদি করা না হয়; তাহলে এটাই হবে আমাদের গ্যারান্টি। যে দেশের জনগণের এ ধরনের দেশপ্রেম থাকে- সে দেশকে আক্রমণ করতে সহজেই কেউ সাহস পায় না। এ রকম দেশকে অধীনস্থ করতে চাইলে যে কোনো বিশাল শক্তিকেও অনেক দিন ধরে যুদ্ধ করতে হয়। তাই আমাদের দেশরক্ষার নীতি হবে বাংলাদেশীদের দেশপ্রেম। আর আমি ব্যক্তিগতভাবে

www.pathagar.com

মনে করি, বাংলাদেশকে রক্ষা করার দ্বিতীয় পদক্ষেপ হতে হবে সকল নাগরিককে জীবনের এক পর্যায়ে বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া। সত্যি কথা বলতে কি, আমার মনে হয়, বাঙালিরাই পৃথিবীর সবচেয়ে বিশৃঙ্খল জাতি। আমাদের শৃঙ্খলা শেখানোর জন্য সকলের জীবনে একটি পর্যায়ে মিলিটারি ট্রেনিং অপরিহার্য। পাশ্চাত্য দেশগুলোতে উন্নতির এক পর্যায়ে সামরিক ট্রেনিং বাধ্যতামূলক ছিল। এই সামরিক ট্রেনিংই দেশের নাগরিকদের শৃঙ্খলাবোধ, দেশপ্রেম, কর্তব্যপরায়ণতা জাগিয়ে তুলবে।

এটা ছাড়াও যেহেতু বর্তমানে সামরিক সরঞ্জাম দ্রুতগতিতে উন্নত থেকে উন্নততর হচ্ছে, আমাদের একটি আধুনিক ও শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী থাকতে হবে। অন্তত যতক্ষণ পর্যন্ত জনযুদ্ধ সূচনা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত বহিঃশত্রুর হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার মতো শক্তিশালী সেনাবাহিনী থাকতে হবে।

অন্যদিকে প্রতিরক্ষা কৌশলের প্রথম লাইন অব ডিফেন্স হচ্ছে বৈদেশিক নীতি। আমার মতে, ভারতনির্ভর বৈদেশিক নীতি বাংলাদেশকে ধীরে ধীরে ভুটানের স্তরে নিয়ে যাবে। আমাদের উচিত হবে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করে চীন ও মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক গড়ে তোলা। আমাদের ভৌগোলিক অবস্থান সামরিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চীন এবং ভারতের সম্ভাব্য কোনো যুদ্ধে ভারত আমাদের ভূমির ওপর দিয়ে তার সৈন্যবাহিনী চালাতে দ্বিধা করবে না। এক্ষেত্রে আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রক্ষায় চীনের একটা স্বার্থ রয়েছে। তাই চীন ও বাংলাদেশের মধ্যে বন্ধুত্ব দৃঢ় করতে হবে। আমাদের সেনাবাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র আগে চীন থেকে আনা হতো, সে নীতি আমাদের অনুসরণ করতে হবে। বর্তমান সরকার যে মিগ-২৯ ক্রয় করছে, তা মূলত আমাদের বিমান বাহিনীকে ভারতীয় বিমান বাহিনীর পরিপূরক করার চেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়। সামরিক কৌশলের দিক থেকে এটা অত্যন্ত ক্ষতিকর।

প্র ॥ মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মুহাম্মদ বলেছিলেন যে, বাজার অর্থনীতি একটি নতুন উপনিবেশ সৃষ্টির নীতি। এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

'কেয়ার ট্রেড, নট ফ্রি ট্রেড'

উ ॥ আমি মাহাথির মুহাম্মদের সঙ্গে মোটামুটি একমত। আমার স্লোগান হচ্ছে 'কেয়ার ট্রেড, নট ফ্রি ট্রেড'। আর পশ্চিমা বিশ্ব যদি বিশ্বায়ন চায় তাহলে তাদের কর্তব্য হবে উন্নয়নশীল দেশে সহজ শর্তে প্রযুক্তি হস্তান্তর করা।

প্র ॥ বর্তমানে বাংলাদেশের গ্যাস, তেল, বিদ্যুৎ নিয়ে ষড়যন্ত্র চলছে, সে সম্পর্কে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি কি?

উ ॥ এখানে আমরা কোন স্ট্র্যাটেজিতে অর্থনীতির উন্নতি করবো সেটা আগে আমাদের নির্ধারণ করতে হবে। এটা আজ প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, বহুজাতিক কোম্পানিগুলো তাদের নিজেদের স্বার্থে আমাদের সম্পদ লুটে নিতে চায়। সুতরাং তারা যদি আন্তরিকভাবে আমাদের উন্নতি চায়, তাহলে তাদের উচিত আগে আমাদের উন্নততর প্রযুক্তি দেওয়া। আমাদের মতো করে সে প্রযুক্তি ব্যবহার করবো। আমি আমাদের গ্যাস রফতানির যে কোনো সিদ্ধান্ত মানি না। এটা যদি আমরা করি, তাহলে ভবিষ্যৎ

www.pathagar.com

বংশধররা আমাদের ক্ষমা করবে না। নাইজেরিয়া যেভাবে তেলশূন্য হয়েছে, আমরা সেভাবে বাংলাদেশকে গ্যাসশূন্য হতে দেবো না। এটা রফতানি করার উদ্যোগ হবে দেশদ্রোহিতার শামিল।

প্র ॥ মুসলমানদের মৌলবাদী আখ্যায়িত করা এবং আমেরিকার প্রফেসর হান্টিংটন যেমন বলেছেন যে, একবিংশ শতাব্দী হবে মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে খ্রিস্টীয় জগতের লড়াই- এ সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কি?

উ ॥ আমি মূলত প্রফেসর হান্টিংটনের সঙ্গে একমত। কারণ, ক্রুশেড এখনো শেষ হয়নি। এটা চলতে থাকবে। আর এই ক্রুশেড মোকাবেলায় মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষায় ব্যাপক উন্নতি ঘটাতে হবে। শুধু পাশ্চাত্য ও আমেরিকার বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়ে লাভ নেই, মুসলিম শক্তিগুলো যদি নিজেদের উন্নত করতে পারে, তাহলে পশ্চিমী শক্তি ভয় পাবে। শক্তি না থাকলে কেউ দাম দেয় না। আর জ্ঞানই হচ্ছে শক্তি। তাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি না ঘটিয়ে সন্ত্রাসবাদের পথে পা বাড়িয়ে কোনো লাভ হবে না। শুধু মুখে আল্লাহু আকবার বললেও চলবে না। মুখে মুখে জেহাদ হয় না। মুখে মুখে জেহাদ করলে, সে জেহাদে আমরা হেরে যাবো। স্বয়ং আল্লাহপাক বলেছেন, 'যে জাতি নিজের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটায় না; আল্লাহ সে জাতির জন্য ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটান না।'

প্র ॥ বাংলাদেশে এনজিও তৎপরতা সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?

উ ॥ এনজিওরা আমাদের আধামরা করে রাখতে চায়। এগুলো হচ্ছে- ভিক্ষা করার অর্থনীতি। ড. ইউনূস ও ফজলে হোসেন আবেদের অর্থনীতি দিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতির উন্নতি হবে না। হয়তো আমাদের জনগণ মানবিক সাহায্য পায়; কিন্তু এনজিও প্রবৃদ্ধির কৌশল হতে পারে না। শিল্পায়ন, আধুনিক প্রযুক্তি, কৃষি বিজ্ঞানের বিকাশ ও উন্নততর শিক্ষা গ্রহণই হবে আমাদের উন্নতির মূল লক্ষ্য। মৌলিক শিল্প গড়ে তুলতে হবে।

পূর্ণিমা, সাক্ষাৎকার, ২২ ডিসেম্বর, ১৯৯৯

www.pathagar.com

২৫ সে যুদ্ধ বার বার গণতন্ত্রকে হত্যা করে

দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে উন্নয়নশীল দেশের রাজনৈতিক পরিবর্তন এবং রাজনৈতিক উন্নয়ন (Political Development) তত্ত্বের ওপর গবেষণা এবং অধ্যাপনা করে আমি একটি ছোট উপতত্ত্ব (Pre-Theory) দাঁড় করার প্রচেষ্টা নিয়েছি। এই তত্ত্বটি হলো : In developing countries politics tends to be war without bar. On the other hand politics tends to be a game played under some rules and regulations in developed nations. Problem of political development essentially hinges on the question of how to transform this 'politics of war' into a 'politics of game.' উন্নয়নশীল দেশগুলোতে রাজনীতির প্রবণতা হচ্ছে বাধাহীনভাবে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া। অন্যদিকে উন্নত দেশে রাজনীতি খেলাবিশেষ হিসেবে নিয়ন্ত্রিত হয় কতগুলো বিধি-নিষেধের আওতায়। রাজনৈতিক উন্নয়ন সমস্যার মূলসূত্র হচ্ছে কিভাবে 'যুদ্ধের রাজনীতি'কে 'খেলার রাজনীতিতে' রূপান্তর ঘটানো যায়।

এই উপতত্ত্বটি যদি কিছুটা সত্য হয় তবে প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে যে, উন্নয়নশীল দেশের রাজনীতি কেন আইন-কানুন বিহীন এক যুদ্ধের মতো? প্রখ্যাত বিজ্ঞানী এডওয়ার্ড শিলস্-এর চিরায়ত (Classic) প্রবন্ধ "The Concentration and Dispersion of Charisma" (World Politics, Vol. XI, 1958-59) এই জিজ্ঞাসা প্রশমনে কিছুটা সাহায্য করে। শিলস লিখেছেন যে, উন্নয়নশীল দেশসমূহে জনগণের সকল ভক্তি, মহিমা ও উৎসাহ রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে উৎসারিত। এর কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন অতীতের সীমাহীন ক্ষমতাধরদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহারের ইতিহাস এবং নিকট অতীতের ঔপনিবেশিক রাজাদের মহিমার সর্বব্যাপী ব্যবহার। তাই উন্নয়নশীল দেশসমূহে শুধু রাজনৈতিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরাই সকল শ্রদ্ধার পাত্র। উন্নত দেশে জনগণের শ্রদ্ধা ভক্তির ক্ষেত্র ব্যাপক বিস্তৃত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আমেরিকায় Lincoln, Wilson, Roosevelt, Kennedy যেমনভাবে সম্মান ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন Ford, Rockfeller, Carnegie, Dupont-এর মতো শিল্পপতিরাও ঠিক তেমনভাবেই

www.pathagar.com

বরণীয়। সম্মোহনী ব্যক্তিত্বের অধিকারীদের মধ্যে আরো রয়েছেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী, সামাজিক ও রাজনৈতিক গবেষক, মহাশূন্যচারী, খেলাধুলা ও চলচ্চিত্র জগতের তারকাগণ। শ্রদ্ধা ও ক্ষমতার ক্ষেত্রের এমন বিস্তৃতির ফলে সেসব দেশে বহু আকর্ষণীয় বস্তুর মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা শুধু একটি। অপরপক্ষে উন্নয়নগামী দেশে রাজনৈতিক ক্ষমতাই সকল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু বলে রাজনীতিবিদরা রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্য যে কোনো পন্থা অবলম্বনে কুণ্ঠিত হয় না।

উন্নয়নশীল দেশে উন্নত দেশের তুল্য সুযোগ-সুবিধার অপ্রতুলতার জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশ্বমানের মর্যাদাশীল এবং নামী ব্যক্তিত্বের বিকাশ খুব একটা ঘটে না। যাওবা হয় তাদেরও দেশে তেমন মর্যাদা দেওয়া হয় না। এটা ঘটে ঔপনিবেশিক মানসিকতার কারণে। রবীন্দ্রনাথও নোবেল পুরস্কার বিজয়ের আগে দেশে তেমন মর্যাদা পাননি। তাকেও বলা হতো– 'ঠাকুর বাড়ির রবি, সেও আবার কবি।' কিছুদিন আগে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি বক্তব্য পড়লাম যাতে তিনি বলেছেন যে, সাহিত্যের যে মানে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় তাতে অন্তত ভারতে ১২ জন এই পুরস্কার বিজয়ী হতে পারেন। কিন্তু ভারতে এমন গুণীজনেরা অখ্যাতই রয়ে গেছেন। এ সমস্ত দেশে মানমর্যাদায় যে সমস্ত ব্যক্তি তালিকার প্রথম সারিতে চলে আসে তারা প্রায় সবাই রাজনৈতিক আশীর্বাদপুষ্ট এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে পুরস্কৃত। আর যে সমস্ত যোগ্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই রাজনৈতিক যোগাযোগ সম্ভব হয় না তারা পর্দার আড়ালেই থেকে যায়। এভাবে সুশীল সমাজের কিছু যোগ্য ব্যক্তিত্ব তাদের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাকে রাজনৈতিক উন্নয়নে বা গণতন্ত্রায়নে কাজে লাগাতে সক্ষম হয় না।

উন্নয়নশীল বিশ্বে সরকারি সহযোগিতা ছাড়া কোনো প্রকার সম্মোহনী ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটিয়ে মর্যাদাবান হওয়া প্রায় অসম্ভব। ধনতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক, মিশ্র অর্থনীতি, এমনকি অধুনা আলোচিত Private Sector বা Development Oriented Government যাই হোক না কেন যে কোনো ব্যবস্থার অধীনেই ব্যক্তি উদ্যোক্তাদের অর্থনৈতিক সাফল্যের জন্য রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা অপরিহার্য। কারণ, এসব দেশে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা সামাজিক পরিবর্তনের মূল চালিকাশক্তিই (Prime Mover of Social change) হলো রাষ্ট্র। দেশের বুর্জোয়া শ্রেণীর কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করলেই এটা স্পষ্ট হয়ে যায়।

পাশ্চাত্যের বুর্জোয়া বিপ্লব গড়ে ওঠে নিম্ন ধাপ থেকে। চাপা উত্তেজনাপূর্ণ সমাজে বিভিন্ন সৃজনশীল ক্ষমতার উদ্ভবের ফলে সেখানে বিপ্লব ঘটে থাকে। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের বুর্জোয়া শ্রেণী রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া কৃত্রিম বিপ্লবের জন্ম দেয়। ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং ব্যবসায়ীদের ঝুঁকিপূর্ণ প্রয়াসের (entrepreneurship) চেয়ে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা (state patronage) তৃতীয় বিশ্বের শিল্পায়নের প্রধান উপাদান। বিশেষ করে 'মুক্ত' পৃথিবীর (free world) অন্তর্ভুক্ত তৃতীয় বিশ্বের সামরিক ও

www.pathagar.com

বেসামরিক নেতারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার করে দেশীয় সনাতন ব্যবসায়ী, বিদেশের কোম্পানির এজেন্ট, অন্যের সম্পত্তি অবৈধ গ্রাসকারী, লুণ্ঠনকারী, শাসককুলের আত্মীয়স্বজন ও দলের সমর্থকদের মধ্যে নানারকম সুবিধা বণ্টন করে একটা বুর্জোয়া শ্রেণী গড়ে তোলে। এসব সুবিধার মধ্যে রয়েছে শিল্পোদ্যোক্তাদের রাষ্ট্র পরিচালিত বা নিয়ন্ত্রিত ব্যাংক থেকে সহজ শর্তে মূলধন দেওয়া, অল্প মূল্যে জমি অধিগ্রহণে সহযোগিতাকরণ, শিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ আমদানিতে সহজ শর্তে অনুদান দেওয়া, শিল্প প্রতিষ্ঠার পর প্রথম কয়েক বছর শিল্প পণ্যের ওপর কর আরোপ না করা, পরিত্যক্ত শিল্পকারখানা স্বল্প মূল্যে দলীয় কর্মী বা সমর্থকদের মধ্যে বিতরণ। এছাড়াও আমদানি-রফতানির জন্য লাইসেন্স দেওয়া, বিদেশী অর্থ সাহায্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন এবং রাস্তাঘাট নির্মাণ ও অন্যান্য শিল্প অবকাঠামো তৈরীর ঠিকাদারী দিয়ে এক শ্রেণীর দুর্নীতিপরায়ণ ধনিক শ্রেণী তৈরি করা হয়। এই নব্য শিল্পপতি ও ধনী ব্যক্তিরা তাদের ধন সম্পদ অর্জন ও রক্ষা করার প্রয়োজনে রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে অবৈধ অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং অনেকে সরাসরি রাজনীতিতে নেমে পড়ে। এই তথাকথিত শিল্প মালিক ও ধনিক শ্রেণী ব্যবসায়িক স্বার্থ অনুকূল রাখার জন্য তাদের সহজলব্ধ ধনসম্পদ দ্বারা আমলাদের সঙ্গেও আঁতাত গড়ে তোলে। এভাবে তারা সন্ত্রাসীদের লালন-পালন করতেও রাজনীতিবিদদের অর্থ সাহায্য করে থাকে। রাজনৈতিক সমর্থন ও রাজনীতির মধ্য দিয়ে ধনী হওয়ার এই প্রক্রিয়া রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যায় যে, রাজনীতি ও অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব অনেকটা যুদ্ধক্ষেত্র তুল্য হয়ে ওঠে। সকল রাজনৈতিক মূল্যবোধ ধ্বংস হয়ে যায়। সন্ত্রাস ও পেশী শক্তির মূল্য অনেক বেড়ে যায়। এ কারণেই হয়তো 'ভোট ডাকাতি', অথবা 'মিডিয়া ক্যু' (রাষ্ট্রীয় প্রচারযন্ত্র কর্তৃক নির্বাচনের ফলাফলের মিথ্যা প্রচার) ঘটে থাকে। যদিও সামরিক শাসক অথবা সেনাবাহিনী সমর্থিত শাসকেরা এ ব্যাপারে বিশেষ পারদর্শী তবে দেশের এই অর্থনৈতিক উন্নতির পদ্ধতি বেসামরিক রাজনৈতিক দল ও বেসামরিক শাসনামলকে 'ভোট চুরির' খেলায় প্রলুব্ধ করে। এর ফলে সামরিক শাসন অবসানের পরও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান কষ্টকর হয়ে ওঠে। তখন 'পরাজিত', 'অপরাজিত' উভয় দলই পরস্পরকে ভোট চুরির অপবাদ দিতে থকে। ফলে নির্বাচিত সরকারের বৈধতা জনদৃষ্টিতে নিম্নমানের পর্যায়ে থাকে এবং সাধারণভাবে দেশে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। রাজনৈতিক নেতা, আমলা, সামরিক বাহিনী, রাজনীতিতে সম্পৃক্ত জনগণ (Politically relevant people) স্বাভাবিকভাবে সকল প্রকার সততার প্রতি সন্দেহ (cynicism) প্রকাশ করতে থাকে।

এই cynicism-এর অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হয় সর্বস্তরে দুর্নীতির প্রসার। আর দুর্নীতির প্রসার যতই বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে cynicism-এর মাত্রাও ততই বাড়তে থাকে। রাজনীতি হয়ে পড়ে একেবারে ক্লেদযুক্ত। অর্থনৈতিক পথে রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ,

www.pathagar.com

পেশী শক্তির ব্যবহার আর সর্বগ্রাসী দুর্নীতির দুষ্ট চক্র (vicious circle) সমস্ত উন্নয়নশীল দেশকেই গ্রাস করে ফেলে। ফলে গণতন্ত্রের সুষ্ঠু বিকাশ সম্ভব হয় না। পরিবর্তে হয় সামরিক শাসন না হয় 'Illiberal Democracy' আবির্ভাব ঘটছে। জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে অগণতান্ত্রিক পন্থায় সরকার পরিচালিত হয়। স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ত্যাগের জন্য 'ম্যান্ডেলা' দৃষ্টান্ত সত্যিই দুর্লভ। যেহেতু রাজনীতিই সকল ক্ষমতার উৎস তাই ষড়যন্ত্র, স্বৈরাচার আর দুর্নীতির মাধ্যমে রাজনীতিবিদরা পাকাপোক্তভাবে ক্ষমতায় টিকে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। রাজনীতি কেবল যুদ্ধের খেলায় পরিণত হয়। যে খেলায় কোনো নিয়মনীতি নেই। সে যুদ্ধ বার বার গণতন্ত্রের অপমৃত্যু ঘটায়।

(এই প্রবন্ধটি লেখকের আগামী বই : "Reflections on Political Development : A South Asian Perspective"-এর অংশ বিশেষের বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ করেছেন ড. ইউ এ বি রাজিয়া আকতার বানু)

দৈনিক মানব জমিন ৩১ অক্টোবর ১৯৯৯

www.pathagar.com

২৬ কাঁচি দিয়ে কেটে কেটে কিছু ভূখণ্ড নেবার প্রবণতা ভারতের সব সময়ই আছে

বাংলাদেশকে সব সময়ে ভারতের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ আগ্রাসনের বিষয়ে খুবই সতর্ক থাকতে হবে। কারণ বড় প্রতিবেশী হিসেবে ভারত তার দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা অনুযায়ী বাংলাদেশকে গ্রাস করতে চায়। সীমান্তে বাংলাদেশের ভূমি দখল করে প্রত্যক্ষ আগ্রাসন যেমন আছে, ঠিক তেমনি পণ্য বাজার দখল করে পরোক্ষ আগ্রাসনও তাদের টার্গেট। দুই ভাবেই বাংলাদেশ তার স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব হারাতে পারে। পণ্য বাজারে আগ্রাসন চলছে গ্লোবালাইজেশনের নামে। সব চেকপোস্ট খোলা। বর্ডার ওপেন। তা নইলে চিনিতে তো আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ। এটাও ভারতীয়। কোনো বাছাই করার বালাই পর্যন্ত নেই। আসলে অতীতের সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীরা যা করেছে, বর্তমান সরকারের মন্ত্রীরাও সেটাই অনুসরণ করছে। সেই মন্ত্রী আর এই মন্ত্রীতে এখন গলায় গলায় ভাব।

বহু ত্যাগের বিনিময়ে স্বাধীনতা পাবার পর পরাধীনতা আমাদের কাম্য হতে পারে না। সীমান্ত আগ্রাসন সম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে কাঁচি দিয়ে কেটে কেটে কিছু কিছু ভূখণ্ড নিয়ে যাবার প্রবণতা ভারতের সব সময়ই রয়েছে। সাম্প্রতিক আগ্রাসন তা থেকে ব্যতিক্রম কিছু নয়। তবে ভারতের নির্বাচনের কারণে আগ্রাসনের মাত্রা বেড়েছে। বাজপেয়ী হয়তো সে দেশের জনগণকে দেখাতে চায় যে, তারা খুব স্ট্রং গভর্নমেন্ট। তাই দাপট দেখাচ্ছে। মনে করে, বাংলাদেশের সঙ্গে বড় ভাই ছোট ভাই সম্পর্ক। আসলে তাদের লং টার্ম টার্গেট বাংলাদেশকে গ্রাস করা। বিশেষ করে চট্টগ্রাম তাদের দখলে নেওয়া। তাই কোনো কিছুই বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এতে ভারত সরকারের ইনস্ট্রাকশন আছে। নির্বাচনই হোক আর যাই হোক ছাড় দেওয়া যাবে না। ছাড় দিলে ওদের লোভ বেড়ে যাবে।

সীমান্ত সংঘর্ষে ক'দিন আগে বাংলাদেশের দু'জন বিডিআর জোয়ান রকিব ও লক্ষণ প্রাণ দিয়েছে। তাদেরকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা উচিত ছিল। পাকিস্তান আমলে কুমিল্লা সীমান্তে মেজর তোফায়েল সম্ভবত নাম, যুদ্ধ করে জীবন দিয়েছেন। তারাই প্রকৃতপক্ষে 'হিরো অব দ্য নেশন।'

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ভারত ইচ্ছে করলে ১৯৭১ সালে যখন মিত্র বাহিনী এসেছিল তখনই বাংলাদেশ দখল করতে পারতো। আমার মতে এটা

www.pathagar.com

প্রধানমন্ত্রীর অবিবেচনা প্রসূত বক্তব্য। উই লাভ ইন্ডিপেনডেন্স। বাংলাদেশ কাশ্মির নয়। বাঙালি যুদ্ধ জানে। যুদ্ধ হলে দে উইল নেভার উইন। বড় প্রতিবেশীর উপর নির্ভরশীল হলে এ রকম কথা বলতে পারে। প্রধানমন্ত্রী এটা একটা খুব বাজে কথা বলেছেন।

সামরিক বাহিনীকে আধুনিকায়নের নামে সরকার ভারতের বন্ধু রাশিয়ার কাছ থেকে মিগ-২৯ ক্রয় করেছে। এটা সরকারের ভুল সিদ্ধান্ত। রাশিয়ান মিগ-২৯ যুদ্ধ বিমান হলো আক্রমণাত্মক। আমরা কখনো ভারত কিংবা অন্য কোনো দেশকে আক্রমণ করবো না। আমাদের দরকার আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ বিমান। মিগ-২৯ দিয়ে আসলে ভারতকে সহায়তা দেওয়া হবে। আমাদের ডিফেন্স কেন মিগ কেনা অনুমোদন করলো আমি বুঝি না।

বাংলাবাজার পত্রিকা, সাক্ষাৎকার, অক্টোবর ৫, ১৯৯৯

www.pathagar.com

২৭ সুপ্রিমকোর্টের উপর কি ডেমোক্লিসির তরবারি?

বর্তমানে আমাদের সংবাদপত্রগুলোতে শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর বস্তুনিষ্ঠ কোনো লেখা খুব কমই চোখে পড়ে। এরকমই ব্যতিক্রমধর্মী একটি লেখা আমার নজরে পড়ল সেদিন। আর লেখক হচ্ছেন আমাদের খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ (যাকে আমি বুদ্ধিজীবী হিসেবে উল্লেখ করা থেকে সচেতনভাবে বিরত থাকলাম) প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী। কয়েকদিন আগে একটি জাতীয় দৈনিকে ওই লেখাটি প্রকাশিত হয় এবং লেখাটির শিরোনাম ছিল 'বঙ্গবন্ধু যেখানে সকল বিতর্কের উর্ধ্বে'। আমি যতদূর বুঝতে পেরেছি ওই নিবন্ধে প্রফেসর সিদ্দিকী যা বলতে চেয়েছেন, তা হচ্ছে যুদ্ধ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানকে একটি জাতি হিসেবে উদ্দীপ্ত করে তোলার সকল কৃতিত্ব বঙ্গবন্ধুর। তিনি বলেছেন, স্বাধীন বাংলাদেশের প্রশাসনের ক্ষেত্রে শীর্ষ ব্যক্তি হিসেবে বঙ্গবন্ধুর পরবর্তী সময়ে কোনো কোনো সিদ্ধান্ত বিতর্কিত হলেও, সেগুলোর পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি থাকতে পারে। আমাদের শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপকের মতামতের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একজন ছাত্র হিসেবে আমি মনে করি, সবচেয়ে বিপর্যয়কারী যে ভুলটি শেখ মুজিবুর রহমান করেছিলেন, সেটি হচ্ছে- ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশ সংবিধানের চতুর্থ সংশোধন সাধন। ওই চতুর্থ সংশোধনী আইন পাসের কাহিনী সবারই ভালোভাবে জানা আছে। সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ বলে অনাবশ্যক দ্রুততার সঙ্গে সংশোধনী আইনটি পাস করা হয়েছিল। আমার মতে, চতুর্থ সংশোধনীর ভয়ংকর দিকটি ছিল- বাংলাদেশের বিচার বিভাগের স্বাধীনতা হরণ। ওই সংশোধনীতে বিধান রাখা হয়েছিল যে, প্রেসিডেন্ট সুপ্রিম কোর্টের বিচারকগণের নিয়োগ দান করবেন এবং বিচারকগণ প্রেসিডেন্টের সন্তুষ্টি মোতাবেকই তাদের পদে বহাল থাকবেন। বিচার বিভাগকে সেদিন পুরোপুরি নির্বাহী ক্ষমতার অধীনস্থ করে ফেলা হয়।

আইনের শাসনের ভিত্তিই হচ্ছে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা। আইনের শাসন ব্যবস্থায় নাগরিক এবং সরকার উভয়েই নিরাপদ থাকতে পারে। সরকার যদি আইনের শাসন লংঘন করে বসে, তাহলে একটি নির্বাচিত সরকারের বৈধতা ধ্বংস হয়ে যায়। দেশ তখন একটি জংলি আইনের কবলে পড়ে যায়, যেখানে সবাই সবার সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে

www.pathagar.com

পড়ে এবং সরকার নিজেও অবৈধ শক্তির কাছে নতজানু হয়ে পড়ে। চতুর্থ সংশোধনী দেশের জন্য এমন এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করেছিল যে, ওই পরিস্থিতিতেই ১৯৭৫ সালের আগস্ট ও নভেম্বরের মর্মান্তিক ঘটনাগুলো ঘটতে পেরেছিল।

আমি আমার প্রিয় বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাম্প্রতিক কিছু বিবৃতিতে শঙ্কিত হয়ে পড়েছি। তিনি বিচার বিভাগের নিন্দায় তার বক্তব্যকে সমর্থন করার কসরত করে যাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী দণ্ডবিধির ৫৪ ধারা ও বিশেষ ক্ষমতা আইনে গ্রেফতারকৃত কিছু ব্যক্তিকে জামিন দেয়ার ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তে বিরক্ত হয়েছেন। জানা যায়, সত্তরের দশকের প্রথম দিকে একই পরিস্থিতিতে শেখ মুজিবুর রহমান সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারপতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ওই বিচারক গ্রেফতারকৃত 'সন্ত্রাসীদের' জামিন দিচ্ছিলেন। তাজউদ্দীন আহমেদ ও ড. কামাল হোসেনের পরামর্শে শেখ মুজিবুর রহমান তখন ওই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছিলেন। তারা তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, এ ধরনের সিদ্ধান্তে খারাপ নজির সৃষ্টি হবে।

১৯৭৫ সালের জানুয়ারি নাগাদ যখন চতুর্থ সংশোধনী আইন পাস হয় তখন তাজউদ্দীন আহমেদ মন্ত্রিসভায় ছিলেন না এবং 'পলায়নকারী' পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন অক্সফোর্ডে গবেষণা কাজে ব্যস্ত ছিলেন। কিছু গরম মাথা এবং শেখ মুজিবুর রহমানের কিছু ক্ষমতাপাগল তরুণ সহকর্মীর প্রভাবে এবং মস্কোপন্থী ন্যাপ নেতাদের প্ররোচনায় শেখ মুজিবুর রহমান সেদিন বিচার বিভাগকে নির্বাহী ক্ষমতার অধীনস্থ করার মতো আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং এভাবেই সেদিন আইনের শাসন ভেঙে পড়েছিল। এ থেকেই কিছু লোক আইন হাতে তুলে নেওয়ার দুঃসাহস পেয়ে ১৯৭৫ সালের আগস্ট ও নভেম্বরের নিষ্ঠুর ঘটনাবলী ঘটাতে পেরেছিল।

আমি প্রধানমন্ত্রীকে দেশের আইনের শাসনের ব্যবস্থা ধ্বংস করার বিপজ্জনক পথে না চলার জন্য আকুল আবেদন জানাচ্ছি। অন্যথায়, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে। দেশের সচেতন ও দায়িত্বশীল নাগরিকদের উচিত আওয়ামী লীগকে এ মর্মে বিরত রাখা- যাতে আওয়ামী লীগ তার নিজের ধ্বংস এবং বাংলাদেশের জনগণের সীমাহীন দুর্ভোগ ডেকে না আনে।

দৈনিক ইনকিলাব, ২৯ আগস্ট ১৯৯৯

www.pathagar.com

২৮ সাংস্কৃতিক আগ্রাসন সামরিক আক্রমণের চেয়ে ভয়াবহ

এ বিষয়ে লিখতে গিয়ে প্রথমেই আমার একটা স্মরণীয় স্মৃতি মনে পড়ল। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এন্ড স্ট্রাটেজিক স্টাডিজ বিআইআইএসএস-এ একটা আলোচনা হচ্ছিল বাংলাদেশের নিরাপত্তা সম্পর্কে। সেখানে প্রেসিডেন্ট জিয়া স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। এবং সকলের সাথে আলোচনায় অত্যন্ত মনোযোগ ও আগ্রহের সঙ্গে অংশ নেন। আমার যতদূর মনে পড়ে তৎকালীন সেনা প্রধান লেঃ জেনারেল হোসাইন মোহাম্মদ এরশাদ ও তৎকালীন পররাষ্ট্র সচিব এস এ এম এস কিবরিয়া উপস্থিত ছিলেন। আলোচনাক্রমে ফারাক্কা সমস্যা এসে গেল। সে সময়কার ভারতের সরকার গঙ্গা নদীতে পানি বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশের উপর প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করছিল। তারা ফর্মূলা দেয়, ফারাক্কার ফলে গঙ্গায় যে পানি কমে গেছে তা পূরণের জন্য যমুনা থেকে গঙ্গা পর্যন্ত একটা খাল কাটা যেতে পারে। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট জিয়া বলেন, এই খাল কাটার পরিকল্পনা পানি সমস্যা সমাধানের জন্য ভারত বলছে না বরং তারা এর মাধ্যমে বাংলাদেশের নিরাপত্তার জন্য একটা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। তিনি বললেন যে, যমুনা থেকে খাল কেটে গঙ্গায় পানি আনলে সেই খালে বাংলাদেশ দ্বি-খন্ডিত হয়ে যাবে অর্থাৎ উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে। ফলে বাংলাদেশের সৈন্য চলাচল ও সামরিক প্রতিরক্ষা কার্যক্রম যথেস্ট ব্যাহত হবে। সুতরাং গঙ্গা যমুনা খাল খনন পরিকল্পনা বাংলাদেশ কখনো গ্রহণ করতে পারে না।

উপরোক্ত ঘটনার বর্ণনা দিলাম একারণে যে, এখন ট্রানজিট ও বাংলাদেশের নিরাপত্তা নিয়ে যে ভারতীয় চক্রান্ত চলছে, সেটা কোনো নতুন ঘটনা নয়। বাংলাদেশকে ধীরে ধীরে কিভাবে নিরাপত্তাহীন করা যায়, দিল্লীর এই সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনারই একটা অংশ হলো– এই ট্রানজিট বা করিডোর। আন্তর্জাতিক খোলসে এটাকে ট্রানজিট, করিডোর বা ট্রান্সশিপমেন্ট যা-ই বলা হোক না কেন, প্রকৃতপক্ষে ভারত বাংলাদেশের সঙ্গে একটা দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি করার চেষ্টা করছে। যার ফলে শিলিগুড়ির 'চিকেন নেক' না ঘুরে সোজাসুজি ভারতীয় যানবাহন উত্তর-পূর্ব ভারতে সহজে যেতে পারে। যেহেতু

www.pathagar.com

এখানে বলা হচ্ছে ভারতীয় পণ্য সীলড অবস্থায় নেয়া হবে, তাতে কি থাকবে কারো জানা থাকবে না। আসল কথা ঐ কন্টেইনারের উপর বাংলাদেশের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। প্রয়োজনে ভারত ট্রান্সশিপমেন্ট বা করিডোরকে ভারতের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে সামরিক সরঞ্জাম নিয়ে যাবার ক্ষেত্রে ব্যবহার করবে। বলা বাহুল্য, এরকম একটি ব্যবস্থা বাংলাদেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে নাজুক করে তুলবে। এমনকি এ ব্যবস্থায় ভারতীয় সৈন্যও বাংলাদেশে নেমে যেতে পারে। অর্থাৎ ট্রান্সশিপমেন্ট তথা করিডোর দিয়ে বাংলাদেশ শুধু খাল কেটে কুমির আনবে। আমার বিস্ময় লাগে, বাংলাদেশের বর্তমান সরকার এরকম রাষ্ট্রঘাতী ব্যবস্থায় কিভাবে সম্মত হতে পারল!

প্রধানমন্ত্রী ট্রান্সশিপমেন্ট-এর কর হিসাবে ৪শ' কোটি ডলার বা বিশ হাজার কোটি টাকা পাবেন বলে যে প্রচারণা চালাচ্ছেন তা আরব্য উপন্যাসের দৈত্যের মণিমুক্তা আহরণের চেয়েও অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। ভৌগলিক দিক থেকে ভারত একটি বিরাট রাষ্ট্র হলেও অর্থনৈতিকভাবে ভারত বিশ্বের ৩০টি দরিদ্রতম দেশের অন্যতম। ভারত বহির্বিশ্বে ষাট থেকে সত্তর বিলিয়ন ডলার ঋণ গ্রহীতা। ভারতের প্রবৃদ্ধির হার চীনের চেয়ে অনেক কম। এরকম একটা গরীব রাষ্ট্র বাংলাদেশকে বিশ হাজার কোটি টাকার রাজস্ব দিবে একথা কোনো দায়িত্বশীল লোক বললে তা শিশুসুলভই মনে হয়। বরং সেভেন সিস্টারস'-এর সঙ্গে আমাদের বিদ্যমান রফতানী বাণিজ্যের আয় আর থাকবেই না বললে চলে। আরও ভয়াবহ ব্যাপার হচ্ছে, ট্রান্সশিপমেন্ট পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারত যৌক্তিকভাবেই চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারের অনুমতি চাইবে। কলকাতা বন্দর নাব্যতা হারানোর ফলে প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলোর সঙ্গে বাণিজ্যের জন্য চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার ভারতের জন্য ব্যাপক লাভজনক হবে এবং ভারতীয় শাসকরা চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার বা দখলের লোভ ইতিমধ্যে অনেকবারই প্রকাশ করেছেন। বলা হয় চট্টগ্রাম বন্দর ভারতকে ব্যবহার করতে দিলে তারা বন্দরের উন্নয়ন করবে। চট্টগ্রাম বন্দর উন্নয়ন করতে চাইলে প্রকৃতপক্ষে উন্নত দেশ আমেরিকা জাপান, জার্মানি- এদের সহায়তা নিতে পারি। ভারতের মতো একটা সেকেন্ড ক্লাস টেকনোলজিক্যাল কান্ট্রির সাহায্য আমরা কেন নিতে যাব? ট্রানজিটের সাথে ভারত, বাংলাদেশ ও চীনের সম্পর্কও জড়িত। যেহেতু ভারতের সাথে চিনের সীমান্ত দ্বন্দ্ব এখনও আছে ভবিষ্যতে চিন ভারতের যুদ্ধ উড়িয়ে দেয়া যায় না। ভারতকে এই ট্রান্সশিপমেন্ট বা করিডোর অধিকার দিলে সম্ভাব্য ওই যুদ্ধের সময় ভারত তার সেনা বাহিনী সোজা বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে পূর্ব ভারতে নিয়ে যাবে।

ভারত ট্রানজিট বিতর্ক তুলে আওয়ামী লীগ সরকারের মাধ্যমে সুকৌশলে বাংলাদেশকে যেভাবে হিন্দুকরণ করছে তা আমরা অনেকেই অগ্রাহ্য করে যাচ্ছি। মনে

www.pathagar.com

রাখতে হবে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন সামরিক আক্রমণের চেয়েও বিপদজনক। সেদিন বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন রাস্তা দিয়ে আমি শাহবাগের দিকে যাচ্ছিলাম। মনে পড়ল এই মসজিদের পাশেই তো আমাদের জাতীয় কবি নজরুল ইসলামের সমাধি। সেখানে দাঁড়িয়ে আল্লাহর কাছে মোনাজাত করব বলে নজরুলের কবরের দিকে দৃষ্টিপাত করলাম। নজরুলকে যখন সেখানে কবর দেয়া হয় তখন "মসজিদেরই পাশে আমায় কবর দিও ভাই। গোর হতে আমি যেন আজান শুনতে পাই।" এ রকমে একটি ফলক ছিল। আমি অত্যন্ত দুঃখিত হলাম নজরুলের সেই বিখ্যাত পংক্তি খচিত প্রস্তর খন্ড এখন আর সেখানে নেই। এখন একটা নতুন প্রস্তর তৈরি করা হয়েছে। সেখানে উদ্ধৃত করা হয়েছে নিম্নলিখিত কবিতাটি "তোমাদের পানে চাহিয়া বন্ধু আর আমি জাগিব না। কোলাহল করি সারাদিনমান কারো ধ্যান ভাঙিব না, নিশ্চল-নিশ্চুপ/ আপনার মনে পুড়িব একাকী গন্ধবিধূর ধুপ।" নতুন স্তম্ভটিতে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। নজরুল জন্ম শতবার্ষিকী ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৬ যে কোনো পাঠকই বুঝতে পারে মুসলিম জাগরণের নায়ক কবি নজরুল ইসলামকে বাঙালি হিন্দু নজরুল ইসলামে পরিণত করার এটা একটা প্রচেষ্টা।

এ প্রসঙ্গে আমার আর একটা কাহিনী মনে পড়লো। কিছুদিন আগে বাংলাদেশ গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রির প্রতিষ্ঠাতা নুরুল কাদের খান ইন্তিকাল করেন। তাঁর মৃত্যুতে শোক পালনের জন্য একটি 'নাগরিক কমিটি' গঠিত হয়। ওই নাগরিক কমিটি জাতীয় জাদুঘর মিলনায়তনে একটা শোকসভা আয়োজন করে। এই শোকসভায় সভাপতিত্ব (পৌরহিত্য!) করেন কবি শামসুর রাহমান। এর কিছুদিন আগেই বাংলাদেশ গার্মেন্টস শিল্পে অবদানের জন্য নুরুল কাদেরকে স্মরণ করে আমি একটি প্রবন্ধ লিখি। বোধ হয় সে কারণেই নূরুল কাদেরের পরিবার থেকে আমাকে একটা আমন্ত্রণপত্র পাঠানো হয়। নূরুল কাদের খান ছাত্রজীবনে বামপন্থী ছাত্র রাজনীতিতে জড়িত থাকলেও শিল্পপতি হবার পর তিনি কয়েকবার হজ ও ওমরাহ পালন করেন। আমি আশা করেছিলাম, যেহেতু নূরুল কাদের খান একজন মুসলমান ছিলেন তাই তার শোকসভা শুরু হবে কোরআন তেলাওয়াত দিয়ে। কিন্তু শোকসভায় ঢুকেই আমি ধুপ জ্বালানোর গন্ধ পেলাম। 'পুরোহিতের' আসন গ্রহণ করেই কবি শামসুর রাহমান ঘোষণা দিলেন, যদিও নূরুল কাদেরের জীবন ছিল বহুমুখী। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা হিসেবেই তার উপর আলোচনা করা যাবে, অন্য কোনো বিষয়ে নয়। আমি আশ্চর্য হলাম, যে গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি বাংলাদেশকে বাঁচিয়ে রাখছে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে আর নূরুল কাদেরই যখন সেই শিল্পের পথিকৃৎ তখন সেই প্রতিভাশীল শিল্পপতির শিল্পজীবন কেন আলোচনা করা যাবে না, তা আমার বোধগম্য হলো না। আমি আরও আশ্চর্য হলাম, সভাপতি যখন

www.pathagar.com

ঘোষণা করলেন, ঋষি'র (কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) গান দিয়ে আজকের সভা শুরু হবে। শুরু হল গান, "জীবনে আছে দুঃখ--- আছে আনন্দ---"। সমগ্র অনুষ্ঠানটি আমার মনে হলো একজন হিন্দু লোকের স্মরণসভা। বলা বাহুল্য, দু' একজনের আলোচনা শেষে আমি সভাস্থল ত্যাগ করি।

যে কোনো সুস্থ জ্ঞানবান লোকের বুঝতে কষ্ট হয় না, আওয়ামী লীগ সরকার আসার পর থেকেই বাংলাদেশী সংস্কৃতিকে 'বাঙালি' তথা হিন্দু সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

বিটিভিতে হিন্দু সংস্কৃতির চর্চা অবিরাম চলছে। বোধ হয় শুধুমাত্র জনতার রুদ্ররোষ ঠেকাতে যতদ্রুত সম্ভব সময়ে আজান প্রচার করা হয়। আওয়ামী শাসকরা 'নব্য আওয়ামী বুদ্ধিজীবীদের' সহায়তায় (যারা একসময় শেখ মুজিবকে 'সিআইএ'র দালাল' বলে অভিহিত করেছেন) এবং প্রধানত কমিউনিস্ট পার্টি এবং ন্যাপ থেকে ১৯৭০ সালে নৌকার উপর ভর চাপিয়েছিলেন তারা শেখ মুজিবকে একটা মহামানবরূপে এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালিরূপে চিত্রিত করতে একযোগে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তারা ভুলে গেছেন পাকিস্তানের কারাগার থেকে ফিরে এসে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে প্রদত্ত ভাষণে শেখ মুজিব বলেছিলেন,' "আমি মুসলমান। আমি জানি, মুসলমান মাত্র একবারই মরে।" (দ্রষ্টব্য ঃ বাংলাদেশের সমাজ বিপ্লবে বঙ্গবন্ধুর দর্শন সম্পাদনায় খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, প্রকাশক বঙ্গবন্ধু পরিষদ, ১৫ আগস্ট, ১৯৭৯ পৃষ্টা- ৩৯)।

যদিও রাজনৈতিক কারণে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হওয়া পর্যন্ত বাঙালিত্বের ওপর তিনি জোর দিয়েছেন, কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে তাঁর বক্তৃতাগুলোর ওপর চোখ বুলালে বুঝা যায়, তিনি শুধু বাঙালি ছিলেন না, তিনি একজন খাঁটি মুসলমানও ছিলেন। শেখ সাহেবের এসব বক্তৃতামালার মধ্য দিয়ে তিনি যে দর্শন সৃষ্টি করতে চেয়েছেন, আমার মনে হয় শহীদ জিয়া পরবর্তীতে সেটাকেই বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ (বাঙালী+ইসলাম) হিসেবে একটি দর্শন উপহার দেন। শহীদ জিয়ার বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ বাংলাদেশী জনগণের সকল আকাঙ্ক্ষার প্রকৃত প্রতিফলন ঘটায়। বাংলাদেশ এবং ইসলাম এটাই বাংলাদেশীদের শেষ ঠিকানা।

এই বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে ধ্বংস করার জন্য ভারতীয় শাসকরা যে দীর্ঘ পরিকল্পনা করেছেন তারই বহি:প্রকাশ হচ্ছে আওয়ামী লীগের ভারত প্রেম, উপ-আঞ্চলিক জোট গঠনের প্রচেষ্টা এবং বাংলাদেশের বুক চিরে ভারতকে করিডোর দেয়া। দিল্লীর শাসকদের এই দুরভিসন্ধি সম্পর্কে নতুন করে সতর্ক হওয়ার জন্যই হয়তো এসেছে-এই করিডোর প্রস্তাবনা। বাংলাদেশকে স্বাধীন রাখতে হলে এ প্রস্তাব

www.pathagar.com

আমাদেরকে রুখে দাঁড়াতে হবে। তাই আমি সকল বাংলাদেশীর সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলছি "জান দেব, তবু ট্রানজিট দেব না।"

বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে থেকে উদ্ভূত এক সময়ের অপরিচিত সত্যিকার বাংলাদেশী কবি মনিরুজ্জামানের গানের দু'টি লাইনের মধ্যেই বাংলাদেশের সকল মানুষের আত্মার প্রতিচ্ছবি ফুটে আছে। বিপুলভাবে জনপ্রিয় সেই কবিতার লাইন দু'টি দিয়ে আমি আমার লেখা শেষ করছি– "প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ, জীবন বাংলাদেশ আমার মরণ বাংলাদেশ।"

দৈনিক দিনকাল, ১২ আগস্ট ১৯৯৯

www.pathagar.com

২৯ ট্রানজিট : ধীরে ধীরে ভারত কর্তৃক বাংলাদেশ গিলে খাওয়ার নীতি

প্র ॥ ট্রানজিট নিয়ে সরকারের তাড়াহুড়োর কারণ কি বলে আপনি মনে করেন?

উ ॥ আমার মতে ট্রানজিট হলো নমনীয় এবং দুর্বল হাসিনা সরকারকে ফাঁকি দিয়ে ভারত কর্তৃক বাংলাদেশ গিলে খাওয়ার বুদ্ধি। আমার মনে হয় প্রথম থেকেই ভারত হাসিনা সরকারের উপর চাপ দিচ্ছিল। কিন্তু জোরালো পাবলিক অপিনিয়নের কারণে সরকার এটা করতে সাহস পায়নি। বাংলাদেশের মধ্যদিয়ে ট্রানজিট নিয়ে বাজপেয়ী নির্বাচনে ফায়দা নিতে চায় এবং আমার ধারণা সেই চাপ দেওয়ার জন্য বাজপেয়ী এত ব্যস্ততার মধ্যেও বাংলাদেশ সফর করে ট্রানজিট সুবিধা আদায় করে নিয়েছেন।

প্র ॥ জাতীয় সংসদে আলোচনা ও জাতীয় বিতর্ক ছাড়া এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ঠিক হয়েছে কি না?

উ ॥ মোটেই না। বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের ও অর্থনৈতিক অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত কোনো সমস্যা দেখা দিলে সরকার সেক্ষেত্রে গণভোটের ব্যবস্থা করে এবং সেই গণভোট অনুযায়ী পার্লামেন্ট যথাযথ আইন প্রণয়ন করে। যেমন গ্রেট ব্রিটেন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে যোগ দেবে কি না সে প্রশ্নের সমাধানের জন্য তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী গণভোটের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং গণভোটে হ্যাঁ (Yes) হবার পর তারা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে জয়েনের ব্যবস্থা করে। তেমনিভাবে ইদানীং আইরিশ শান্তিচুক্তি করার আগে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এবং আয়ারল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী উত্তর ও দক্ষিণ আয়ারল্যান্ডে গণভোটের ব্যবস্থা করেন। দুঃখজনক ব্যাপার হলো পার্বত্য শান্তিচুক্তির মতো একটা জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে হাসিনা চুক্তি স্বাক্ষরের আগে গণভোট কিংবা পার্লামেন্টেও আলোচনা করেনি। সেই একইভাবে জনগণ ও পার্লামেন্টের সঙ্গে পরামর্শ না করে হাসিনা সরকার এককভাবে ভারতের সমর্থন লাভের জন্য অনেকটা গোপন

www.pathagar.com

চুক্তির মতো ট্রানজিট চুক্তি স্বীকার করে নিয়েছে। এ চুক্তিকে পার্লামেন্ট অনুমোদন দিলেও তার মূল্য নেই। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে তারা হয়তো ঠিকই পাস করিয়ে নেবে। সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দলীয় কেউ এর বিরুদ্ধে ভোট দিলে তার সদস্য পদ বাতিল হবে।

প্র ॥ ইউরোপে ট্রানজিট চালু আছে অথচ বাংলাদেশের রাজনীতিবিদ এবং জনগণ এর ঘোর বিরোধী। এর কারণ কি বলে মনে করেন?

উ ॥ দেশের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ভর করে উন্নয়ন স্তর (Level of Development)-এর উপর। ইউরোপের সব দেশের ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট একই স্তরের এবং উন্নত। সংশ্লিষ্ট দেশসমূহ অর্থনৈতিক উন্নয়নের অভিন্ন স্তরে পৌঁছলে ট্রানজিট সবার পক্ষে উপকারী হয়। কিন্তু বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে পার্থক্য শুধু আয়তনগত নয়, সবদিক দিয়ে। ভারত সামরিক-অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনেকটা উন্নত পর্যায়ে। এ রকম অসম অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনীতি শাস্ত্র (Science of Economics) অনুযায়ীই ভারতের অঙ্গীভূত হয়ে বাংলাদেশ অবশেষে রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব হারাবে। বাংলাদেশের সচেতন দেশপ্রেমিক এবং দায়িত্বশীল জনগোষ্ঠী এ কারণেই ট্রানজিটের প্রবল বিরোধী ।

প্র ॥ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কোনো সংকট দেখা দেবে বলে মনে করেন কি না?

উ ॥ যদিও ট্রানজিটকে ভারত অর্থনৈতিক বিষয় হিসেবে দেখাচ্ছে। ভারতের মূল উদ্দেশ্য সামরিক কৌশলগত (Strategic)। পূর্ব-উত্তর ভারতের ৭টি রাজ্যের বিদ্রোহ দমনে এবং ভবিষ্যতে চীনের সঙ্গে কোনো যুদ্ধের সম্ভাবনার সময় ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে দ্রুত সামরিক সরঞ্জাম এবং সৈন্য পাঠানোর জন্য ট্রানজিট তথা করিডর নিচ্ছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক লাভ হবে বলে প্রধানমন্ত্রী যে আজগুবি (২ হাজার কোটি টাকা) পরিসংখ্যান দিচ্ছেন তা আরব্য উপন্যাসের দৈত্যের কাহিনীকেও হার মানায়। ভারত "পৃথিবীর সবচেয়ে অনুন্নত ৩০টি দেশের অন্যতম"। ভারত কর্তৃক বাংলাদেশকে এই রাজস্ব দেওয়া দৈত্যের টাকা নিয়ে আসার মতো। চীনের সঙ্গে ভারতের কখনো যুদ্ধ শুরু হলে কিংবা ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ৭টি প্রদেশের বিচ্ছিন্নতা পরিপূর্ণতা লাভের দিকে গেলে ভারত বাংলাদেশের অনুমতি না নিয়েই ট্রানজিট নামের এই করিডর ব্যবহার করবে। এখানে ঐতিহাসিক উদাহরণ, দ্বিতীয়

www.pathagar.com

বিশ্বযুদ্ধের আগে হিটলারের আক্রমণের ভয়ে ফ্রান্স তার জার্মানির সীমান্তে অপ্রতিরোধ্য দুর্গ (Maginot line) তৈরি করে। সমর বিশারদ হিটলার ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধে না জড়িয়ে সহজে ফ্রান্স দখলের জন্য বেলজিয়ামের মধ্য দিয়ে ফ্রান্স দখল করে। ওই দুর্গ কোনো কাজে আসেনি। চীনের সঙ্গে ভারতও সম্ভাব্য যুদ্ধে একই পদ্ধতি অবলম্বন করবে। এমনকি আওয়ামী লীগ সরকারকে সামরিক সহযোগিতা দেওয়ার প্রশ্নেও ভারত কর্তৃক এই ট্রানজিট সুবিধা কাজে লাগানোর সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেয়া যায় না।

প্র ॥ ট্রানজিটের ফলে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে বলে বলা হচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশের রাস্তা সংস্কার এবং অবকাঠামোগত যে ব্যয় হবে তাতে কি বাংলাদেশ লাভবান হবে?

উ ॥ আমি তো আগেই বলেছি অর্থনৈতিক দিক থেকে ট্রানজিটের ফলে বাংলাদেশের লাভবান হওয়া আরব্য উপন্যাসের দৈত্যের অলৌকিকভাবে ধন আহরণের মতো ব্যাপার। এর ফলে বাংলাদেশের অবকাঠামো (Infrastructure) ধ্বংস হয়ে যাবে। বলা হচ্ছে ভারত অবকাঠামোর জন্য কিছু টাকা দেবে। আসলে ভারতের মতো দেশ তা দেবে কি না বা দিতে পারবে কি না আমার সন্দেহ আছে। এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে ভারত কর্তৃক প্রদত্ত ওয়াদাসমূহ যেমন : বেরুবাড়ি হস্তান্তর প্রায় ৩০ বছরেও কিন্তু পূরণ হয়নি।

এখানে উল্লেখযোগ্য ভৌগোলিকভাবে এবং সামরিকভাবে বড় শক্তি হলেও অর্থনৈতিক দিক থেকে ভারত উন্নত দেশ নয়। ভারতের নিজেরই বৈদেশিক ঋণ ৬০ থেকে ৭০ বিলিয়ন ডলার।

প্র ॥ ট্রানজিটের সঙ্গে আস্থার প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। ভারতের উপর আস্থা রাখা যায় না কেন?

উ ॥ ভারত ও বাংলাদেশের ইতিহাস (Track Record) থেকে প্রমাণিত হয় বাংলাদেশকে দেয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার নৈতিক দায়িত্বের কোনো তোয়াক্কাই করে না ভারত (যেমন : গঙ্গার পানি বণ্টন, সীমান্ত চুক্তির রেটিফিকেশন ও বেরুবাড়ি হস্তান্তর)। ইতিহাসের সাক্ষ্য হলো : যে কোনো বৃহত্তর রাষ্ট্র তার সীমান্তবর্তী ছোট দেশকে ঠকাতে বা গ্রাস করতে কুণ্ঠিত হয় না। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পর্যন্ত মেক্সিকোর উত্তরাংশকে

www.pathagar.com

দখল করে নিয়েছে। যেটা বর্তমানে নিউ মেক্সিকো প্রদেশ হিসেবে পরিচিত। অস্ট্রো-হাঙ্গেরি এবং জার্মানি দ্বারা পরিবেষ্টিত পোল্যান্ডকে ৩ বার স্বাধীনতা হারাতে হয়েছে। কিন্তু দেশপ্রেমিক পোলিশরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ঘোড়া দিয়ে জার্মান ট্যাংক বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। পোলিশদের মতো দেশপ্রেম থাকলেই একটি ছোট রাষ্ট্র বৃহৎ রাষ্ট্রের পাশেও দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারে।

প্র ॥ ভারত নিরাপত্তার কারণে নেপালকে ট্রানজিট দেয়নি। বাংলাদেশ দিলে নিরাপত্তা ক্ষুণ্ন হবে কিনা?

উ ॥ ভারত যখন নেপালের মতো ছোট রাষ্ট্রকে বৃহৎ রাষ্ট্র হয়েও ১৫/২০ মাইল ট্রানজিট দেয়নি সেখানে বাংলাদেশ কেন ৫০০ মাইল ট্রানজিট দেবে?

দৈনিক সংগ্রাম, সাক্ষাৎকার, ৬ আগস্ট ১৯৯৯
সাক্ষাতকার গ্রহণ : আলফাজ আনাম ও তৌফিকুর রহমান

www.pathagar.com

৩০ ট্রানজিট : দিল্লীর চমকে বিভ্রান্ত হলে চলবে না

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর থেকেই ভারতীয় শাসকরা (যারা নিজেদেরকে হিন্দুস্তানি বলতেই পছন্দ করে) 'গিলে খাওয়ার' নীতি অনুসরণ করেন। যাতে করে সাবেক ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যান্য অংশকে ধীরে ধীরে করায়ত্ত করা যায় সে লক্ষ্যেই তাদের এই নীতি প্রণয়ন। দেশভাগের পরপরই ভারত জোরপূর্বক প্রথমে দখল করে হায়দারাবাদ। এ এমন একটি সময় ছিল যখন ভারতের চেয়ে সামরিক দিক থেকে বেশ ছোট ও দুর্বল ছিল পাকিস্তান। ভারতের সম্প্রসারণবাদী নীতিকে প্রতিহত করার মতো অন্য কোনো শক্তিও ছিল না। হায়দারাবাদের জনগণের অধিকাংশ হিন্দু ছিল- এই যুক্তিতে ভারত হায়দারাবাদ দখলে নেয়। এরপরই তাদের চোখ পড়ে জুনাগড়ের দিকে। এবারের যুক্তি হলো : জুনাগড়ের রাজা হিন্দু তাই এটা তাদের হতে হবে। এখানে যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল মুসলমান। একই সময়ে নেহরুর দক্ষিণ হস্ত হিসেবে পরিচিত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সরদার প্যাটেল একের পর এক দখল করে নিতে সক্ষম হন শত শত ক্ষুদ্র করদ রাজ্য (Princely states)। নেহরু ষড়যন্ত্রে মাতেন কাশ্মির দখলে। এখানেও সেই জুনাগড় তত্ত্ব। কাশ্মিরের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যা মুসলমান, তাতে কি। কাশ্মিরি মহারাজা তো হিন্দু। সুতরাং কাশ্মিরকেও ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ হতে হবে। কিন্তু এবার স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। স্বাধীনতাকামী কাশ্মিরিদের প্রবল প্রতিরোধের মুখে নেহরু 'ধীরে চলো' নীতি অনুসরণে বাধ্য হন। ইতিহাসে তিনিই প্রথমবারের মতো কাশ্মির ইস্যুকে নিয়ে যান নিরাপত্তা পরিষদে এবং সেখানে সিদ্ধান্ত হয় গণভোটের। কাশ্মিরি জনগণ একটি গণভোটের মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই নির্ধারণ করবেন। কিন্তু কূটকৌশলে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত গণভোট অনুষ্ঠান ঠেকিয়ে দেন নেহরু। তিনি এ পর্যায়ে নতুন অজুহাত খাড়া করেন। বলেন, পাকিস্তান যেহেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্য পশ্চিমী দেশের সঙ্গে সামরিক চুক্তি করেছে তাই উপমহাদেশের রণকৌশলগত ভারসাম্য বদলে গেছে। আর সে কারণে নিরাপত্তা পরিষদের সেই সিদ্ধান্ত হয়ে পড়েছে অপ্রাসঙ্গিক। এ সময়টাতেই কাশ্মিরের হিন্দু রাজা আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দেন ভারতে। আর ভারতের ভাষ্যমতে, সেই থেকে কাশ্মির হলো কিনা তাদের দেশের অবিচ্ছেদ্য

www.pathagar.com

অঙ্গ। কিন্তু স্বাধীনতাকামী সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান কাশ্মিরের এই দখলদারিত্ব মেনে নেয় নি। মূলত সেই থেকে তারা ভারতীয় দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করছে। গোড়াতে তারা ধীরে অথচ দৃঢ়তার সঙ্গে, শান্তিপূর্ণভাবে এবং শেষ পর্যন্ত আশির দশক থেকে তারা সামরিকভাবে ভারতীয় বাহিনীকে প্রতিরোধ করছে। ভারতীয় দখলদার বাহিনীর হাতে এ পর্যন্ত ২০ হাজারের বেশি কাশ্মিরি মুক্তিযোদ্ধা প্রাণ হারিয়েছে। এটা উল্লেখযোগ্য যে, স্বাধীনতার সময় নেহরু ঘোষণা করেছিলেন, কংগ্রেস দেশভাগকে সাময়িকভাবে মেনে নিয়েছে। পাকিস্তানের অখণ্ডতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে এবং হিন্দুস্তান আবার ঐক্যবদ্ধ হবে।

আমার দশ বছরের শ্রমসাধ্য গবেষণার মধ্য দিয়ে আমার এই উপলব্ধি হয়েছে যে, ১৯৪৮-৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের স্বায়ত্তশাসন, ১৯৬৬ সালের ৬ দফা ও ১৯৭১ সালের মার্চের স্বাধীনতা আন্দোলন- এর সবই স্বদেশজাত এবং স্বতন্ত্র অস্তিত্বের জন্য বাংলাদেশীদের অভ্যন্তরীণ সংগ্রাম। যথাযথ কর্তৃপক্ষীয় সূত্রগুলোর মতে, ১৯৭১ সালের ৮ মার্চে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সম্ভাব্য ক্রাকডাউনের আশংকায় ভারতের সাহায্য সেদিন যিনি চেয়েছিলেন তিনি তাজউদ্দিন আহমেদ। শেখ মুজিবুর রহমান নন।

জেকব, দীক্ষিত, সুব্রামিনিয়ামের মতো ভারতীয় লেখকদের মতে, ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের পরপরই ভারত সরকার বাংলাদেশকে অধিকারে নিতে চেয়েছিল। কিন্তু ১৯৬২ সালের 'বাড়াবাড়ির' কারণে চীনের কাছে পরাস্ত ভারতীয় জেনারেলরা ছিলেন সতর্ক। তারা ভারত সরকারকে পরামর্শ দিলেন। বললেন, এখনই এভাবে হজম করা ঠিক হবে না। প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি শেষেই তবে বাংলাদেশকে দখল করতে হবে। এই রণকৌশলের তিনটি দিক ছিল। প্রথমত স্বাধীনতার চেতনায় টগবগ করে ফুটতে থাকা তরুণদেরকে গেরিলা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে সহায়তা করা। ভেতর থেকে যাতে তারা একটি বাংলাদেশ লিবারেশন আর্মি গড়ে তুলতে পারে। অন্যদিকে তো বাংলাদেশী জনগণ অস্ত্রসস্ত্র নিয়ে পাকিস্তানের প্রতি বৈরিতার জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিল। এরপর যদি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ সকল যোগাযোগ নেটওয়ার্ক ধ্বংস করে দেওয়া যায় তবে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী বিচ্ছিন্ন ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় সেনাবাহিনী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একটি সর্বাত্মক যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে প্রস্তুতি শুরু করে। তৃতীয়ত ছিল ইন্দিরা গান্ধীর কৌশলগত উদ্যোগ। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে তার 'ভেটো' নিশ্চিত করতে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সামরিক সন্ধি করেন। মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সেরা বীর সেনানী খালেদ মোশাররফ লেখককে বলেছিলেন, শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশী জনগণের প্রায় এক বছরের অবর্ণনীয় দুঃখকষ্টের শেষে, যখন আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামের কাজ প্রায় শেষ করে ফেলেছি, তখন ভারতীয় সেনাবাহিনী আমাদের যুদ্ধে শামিল হয়।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের মাটি থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের ঘটনাও যথেষ্ট তাৎপর্য বহন করে। সাধারণভাবে এটাই উল্লেখ করা হয়ে থাকে যে, শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিত্বের কারণেই অনিচ্ছুক ও অনমনীয় ভারতীয় বাহিনীকে বাংলার মাটি থেকে সরে যেতে হয়। এখন অবশ্য এমনটাও জানা যাচ্ছে যে, ভারতীয় সৈন্য সরাতে ইন্দিরা গান্ধীর জন্য বাধ্যবাধকতা তৈরি হয়েছিল। কারণ বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা গোপনে ও পদ্ধতিগতভাবে ভারতীয় সেনা কর্মকর্তাদের হত্যা করতে শুরু করেছিল। আজ এটা বলতেই হবে, ১৯৭১ সালে ভারত কর্তৃক বাংলাদেশকে গ্রাসের পরিকল্পনা এদেশের অকুতোভয় দেশপ্রেমিক জনগণের আকাঙ্ক্ষার তোড়ে ভেসে যায়। ভেসে যায় শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিত্বের প্রখরতায়। শেখ মুজিবুর রহমানকে অবশ্য সেজন্য ২৫ বছর মেয়াদি 'শান্তি, সহযোগিতা ও মৈত্রী' চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য হতে হয়। এই চুক্তি স্বাক্ষর এবং ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার একই সময়ে ঘটে।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানের পরে এবং ১৯৯৬ সালের আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার আগ পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রতি ভারতের নীতিতে মোটামুটি ঔদাসীন্যই প্রতিফলিত হয়েছে। ভাবখানা হলো, বাংলাদেশ সুখে থাকলো কি দুঃখে থাকলো, তাতে ভারতের কিছু আসে যায় না। তবে ভারতীয় নীতি-নির্ধারকরা ওঁৎ পেতেই ছিলেন। সাবেক প্রেসিডেন্ট এরশাদের কাঁধে ভর দিয়ে শেখ হাসিনার দুর্বল ও অনভিজ্ঞ সরকার ক্ষমতায় আসতে না আসতে ভারত স্বার্থ হাসিলে তৎপর হয়। ভারত হাসিনার সরলমতি (Credulous) সরকারকে দিয়ে তাড়াহুড়ো করে ৩০ বছর মেয়াদি গঙ্গা চুক্তি সই করিয়ে নেয়। যে চুক্তিতে গ্যারান্টি ক্লজ নেই। নেই আরবিট্রেশন ক্লজ। এই চুক্তি কার্যত গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্যা পেতে বাংলাদেশের অধিকারকে ভারতীয় শাসকদের মর্জির উপর নির্ভরশীল করে তুলেছে। বাংলাদেশের উপর এরপর ভারত চাপিয়ে দেয় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি। অনেক ভাষ্যকার ও আইন বিশেষজ্ঞের মতে, এই চুক্তি ভবিষ্যতে চাকমাদের চূড়ান্তভাবে বিচ্ছিন্নতাবাদের পথে নিয়ে যাবে।

সর্বশেষ হাসিনার সরকার কয়েকটি রুপিয়া প্রাপ্তির মিষ্টি প্রলোভনে ভুলে কবুল করছে ট্রানজিট। গুজরালের সেই প্রকাশ্য আনন্দোচ্ছ্বাসে আজ আর বিস্ময়ের কিছু নেই। ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় আওয়ামী লীগের উত্থান মূল্যায়ন করতে গিয়ে গুজরাল বলেন, দুই দশক মার খাওয়ার পর আমরা বাংলাদেশে জিতেছি।

আন্তর্জাতিক রাজনীতি, যুদ্ধ ও রণ কৌশলের যে কোনো ছাত্র সহজেই এটা অনুধাবন করতে পারবে যে, বিদ্রোহ অধ্যুষিত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ৭টি রাজ্যে সৈন্য ও রসদ চলাচলের জন্যই ট্রানজিট ব্যবহৃত হবে। বাংলাদেশকে ভারতের অঙ্গরাজ্য বানানোর পাতা ফাঁদে ফেলার, চেষ্টা চলছে সর্বোপরি এই করিডর ভারতের সঙ্গে চীনের সম্ভাব্য যুদ্ধে দিল্লি তার সামরিক প্রয়োজন মেটাতে বাংলাদেশের অনুমতির তোয়াক্কায় বসে থাকবে না। এ প্রসঙ্গে ফ্রান্স আক্রমণে হিটলারের সেই ঐতিহাসিক ও চমকপ্রদ সিদ্ধান্তের

www.pathagar.com

কথা কারো ভুলে যাওয়া উচিত নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ফ্রান্সের পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্তকে রক্ষা করতে বিখ্যাত ম্যাজিনো লাইন (Maginot Line) তৈরি করা হয়। এটি ছিল একটি প্রতিরক্ষা দুর্গ। কিন্তু হিটলার ম্যাজিনো লাইন এড়িয়ে ফ্রান্সকে আক্রমণ করেন বেলজিয়ামের ভেতর দিয়ে। অথচ বেলজিয়ামের ভূখণ্ড ব্যবহারে জার্মানির কোনো চুক্তি বা আইনগত বৈধতা ছিল না।

এভাবেই বাংলাদেশকে ভারতের ধীরে ধীরে গিলে খাওয়ার দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে চলেছে। কিন্তু আমাদেরকে অবশ্যই ভারতীয় মন ভোলানো ও অলংকারবহুল কথামালার চমকে বিভ্রান্ত হলে চলবে না। আজ সময় এসেছে ভারতীয় নীলনকশার বিরুদ্ধে সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়ানোর।

ভাষান্তর : মিজানুর রহমান খান
দৈনিক মানবজমিন, ১ আগস্ট, ১৯৯৯

www.pathagar.com

৩১ দুই নেত্রীকে অতীত রাজনীতির চর্চা পরিহার করতে হবে।

প্রশ্ন ॥ বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনার অভিমত আমরা জানতে চাই।

উত্তর ॥ স্বাধীনতার পর থেকেই মোটামুটি একটা অস্থিতিশীলতার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ এগিয়ে চলছে। এ অস্থিতিশীলতার নানান কারণ রয়েছে। তবে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এরকম অস্থিতিশীল পরিস্থিতি কোনো নতুন ঘটনা নয়। বরং বলা যায় এমন পরিস্থিতিই স্বাভাবিক। তবে বর্তমান সময়ের উত্তেজনাকর পরিস্থিতি দেশের অর্থনীতি-রাজনীতি-নিরাপত্তা-স্বাধীনতা কোনো কিছুর জন্যই সুখকর নয়। দেশের উন্নয়ন ও জাতি গঠনের জন্য অবিলম্বে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা জরুরি।

প্র ॥ কি কারণে এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

উ ॥ বর্তমান পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে সেটা নানান দিক থেকে খুবই উদ্বেগজনক। এর মূল কারণ হিসেবে আমার কাছে মনে হয় জাতীয়তার সংকট তথা আত্ম-পরিচয়ের সংকট। কেউ বলছেন বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, ইসলামী কালচার, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, হিন্দু কালচার এভাবে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হচ্ছে। আমাদের এ সমস্যাগুলোর সমাধান করাটাই আমার কাছে ফার্স্ট প্রায়োরিটি মনে হয়। এক্ষেত্রে একটা জাতীয় ঐকমত্য গড়ে ওঠা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

প্র ॥ জাতীয়তাবাদ বিষয়টাকে আপনি এতো গুরুত্ব দিচ্ছেন কেন? জাতীয়তাবাদ প্রশ্ন তুলে আমরা কি নিজেদের বিভেদকেই আরো বড় করে তুলছি না?

উ ॥ একটি স্বতন্ত্র জাতি গঠনের প্রধান উপাদান হচ্ছে জাতীয়তাবাদ। আমাদের বাঙালি জাতীয়তাবাদ হচ্ছে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ। স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে এ জাতীয়তাবাদের অঙ্কুর সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই অঙ্কুরকে মহীরুহে পরিণত না করে বিকৃত করা হয়েছে। শুধু ভাষার ভিত্তিতে জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠে না। জাতীয়তাবাদের আরো অনেক উপাদান রয়েছে। ভাষা, ধর্ম, কৃষ্টি, ভৌগোলিক অবস্থান, স্বাধীনতার ইতিহাস ইত্যাদি অনেক বিষয়ের সমন্বয়ে জাতীয়তাবাদ পূর্ণাঙ্গ হয়। বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রধান সমস্যা হচ্ছে এটা আমাদের স্বাতন্ত্র্য তুলে ধরতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গের বাংলা ভাষাভাষী জনগণ এবং বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে স্পষ্ট কোনো বিভাজন করতে

www.pathagar.com

বাঙালি জাতীয়তাবাদ ব্যর্থ। কেননা বাঙালিরা পশ্চিমবঙ্গের নাকি বাংলাদেশের এ পরিচয়ের ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা তৈরি হয়। তাই বাঙালি জাতীয়তাবাদ বাংলাদেশের নাগরিকদের প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরতে পারে না বলে আমি মনে করি। আসলে দীর্ঘ ২৭ বছর ধরে এ নিয়ে অনেক আলোচনা-সমালোচনা চলছে। কিন্তু কোনো সমাধানে উপনীত হওয়া যায়নি। এর একটা সমাধান প্রয়োজন। বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। এদেশের মানুষের একটি স্বাধীন ও স্বকীয় সত্তা রয়েছে। এই স্বকীয় সত্তাই অন্য জাতির সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষের পার্থক্য চিহ্নিত করবে। এ আলাদা বৈশিষ্ট্য ধারণ করে এদেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে চলবে- এজন্য আমি জাতীয়তার প্রশ্নটির মীমাংসা খুঁজে বের করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করি।

প্র ॥ কিন্তু জাতীয়তাবাদ প্রশ্নটির মীমাংসা তো '৭১ সালেই হয়ে গেছে। বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনায় শাণিত হয়েই তো আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম।

উ ॥ স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশের ৪টি মূলনীতির মধ্যে জাতীয়তাবাদ বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু বাঙালি জাতীয়তাবাদ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারেনি। এজন্য এদেশের নেতা-নেত্রী, বুদ্ধিজীবীসহ সংশ্লিষ্ট সকল মহলই দায়ী। যা হোক, যেহেতু এ নিয়ে প্রশ্ন, সংশয়, এবং বিভেদ তৈরি হয়েছে, কাজেই এ প্রশ্নটির মীমাংসা আগে হওয়া উচিত। আমরা যদি বাঙালি না বলে বাংলাদেশী বলি তবে সেটাই আমাদের জাতীয়তাবাদকে স্পষ্ট করে বলে আমি মনে করি। আমাদের ভাষা, ধর্ম , কৃষ্টি ভৌগোলিক অবস্থান, স্বাধীনতার ইতিহাস ইত্যাদির সমন্বয়েই বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ। বাংলাদেশী পরিচয়ের মাধ্যমে আমরা অনন্য জাতি হিসেবে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত হতে পারি। পৃথিবীর অন্যান্য জাতির থেকে আমাদের অবস্থান স্বতন্ত্র। এটাই বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ। এটাই আমাদের পরিচয়। আমি এ জাতীয়তাবাদকেই বিশ্বাস করি।

প্র ॥ বাংলাদেশের মানুষের প্রকৃত জাতিসত্তার পরিচয় তুলে ধরতে কোন নেতা প্রধান ভূমিকা পালন করেছে বলে আপনি মনে করেন?

উ ॥ আমার মতে বাংলাদেশের মানুষের প্রকৃত জাতীয়তাবাদের পরিচয় তুলে ধরতে জিয়াউর রহমান প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

প্র ॥ বর্তমান ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কি?

উ ॥ আওয়ামী লীগ কোনো ক্ষেত্রেই সফল নয়। কোনো সমস্যারই তারা সমাধান দিতে পারেনি। বরং তারা বর্তমান অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। পানি চুক্তি, পার্বত্য চুক্তিসহ বিভিন্ন চুক্তির ক্ষেত্রে তারা বিরোধী দলের সঙ্গে কোনোরকম আলাপ-আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি। বিরোধী দলের প্রতি তারা সব সময়ই এক ধরনের উপেক্ষা এবং বৈরী মনোভাব পোষণ করে। আর এ বৈরিতা বিরোধী দলকেও আন্দোলন সংগ্রামে যেতে বাধ্য করে।

প্র ॥ বিরোধী দল কি তাদের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করছে?

উ ॥ বিরোধী দলও তাদের যথাযথ ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে ব্যর্থ। আসলে আমাদের

www.pathagar.com

দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থার কোনো সম্পর্ক নেই। কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। কারো প্রতি কারুর শ্রদ্ধা নেই। প্রধানমন্ত্রী কোনো কথা বললে বিরোধীরা মানে না। আবার বিরোধী নেত্রী কোনো কথা বললে প্রধানমন্ত্রী তার মধ্যে ষড়যন্ত্রের গন্ধ খোঁজেন।

প্র ॥ বর্তমান সংকট থেকে সুস্থ স্বাভাবিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে উত্তরণের উপায় কি বলে আপনি মনে করেন?

উ ॥ আমাদের বর্তমান সংকট থেকে বের হয়ে আসতে হলে সকল মহলকেই সহিষ্ণু হতে হবে। পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাস দূর করতে হবে। দেশের কল্যাণের জন্য সবাইকে আন্তরিক হয়ে কাজ করতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন সংলাপ বা আলোচনা। আলোচনার মধ্য দিয়েই সব সমস্যার সমাধান হতে পারে। এজন্য সরকার ও বিরোধী দল উভয় পক্ষকেই ছাড় দিতে হবে। রাজনীতিক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবীসহ সকল মহলকে এগিয়ে আসতে হবে। এখানে আরো একটি কথা বলা প্রয়োজন। আমাদের দুই নেত্রীকে অতীত রাজনীতির চর্চা পরিহার করতে হবে। শেখ হাসিনাকে অতীতের সব কিছু ভুলে গিয়ে নতুনভাবে এগিয়ে যেতে হবে। সামনের দিকে দৃষ্টি রেখে রাজনীতিকে এগিয়ে নেয়ার চেষ্টা করতে হবে। শেখ হাসিনাকে আমরা তাঁর পিতার চেয়ে বড় নেত্রী হিসেবে দেখতে চাই। খালেদা জিয়াকেও তাঁর স্বামীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ নেত্রী হিসেবে দেখতে চাই। উভয়কেই তাদের পিতা এবং স্বামীকে অতিক্রম করে যেতে হবে। এ মানসিকতা নিয়ে যদি দুই নেত্রী অগ্রসর হন তবেই আমাদের উন্নতি সম্ভব।

প্র ॥ বর্তমান রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য আপনার পথ নির্দেশ কি?

উ ॥ বর্তমান সমস্যা সমাধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অবিলম্বে নির্বাচন দেওয়া উচিত। তার আগে অবশ্য ভোটারদের জরুরি ভিত্তিতে আইডি কার্ড দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। যদিও কনসেপ্টচুয়ালি আমি তত্ত্বাবধায়ক সরকার মানি না এবং আমাকে যদি তত্ত্বাবধায়ক সরকারে কখনো ডাকা হয় আমি যাবো না। তারপরও যেহেতু এরকম একটা বিধি দেশে বলবৎ করা হয়েছে তাই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হওয়া উচিত। নির্বাচনের পর সংখ্যাগরিষ্ঠরা সরকার পরিচালনা করবে।

প্র ॥ তবে কি আপনি বর্তমান নির্বাচন কমিশন প্রধানের পদত্যাগ দাবির সঙ্গে একমত পোষণ করছেন?

উ ॥ আমার মনে হয় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সর্বমহলে গ্রহণযোগ্যতা নেই। যেহেতু কেউ কেউ তার পদত্যাগ দাবি করছে সুতরাং এ অবস্থায় স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তাঁর সরে দাঁড়ানো উচিত।

প্র ॥ কিন্তু এটা কি একটা খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে না? একটা ভালো লোককে এনে এ পদে বসানো হলো এবং কেউ তাকে চলে যেতে বললো- আর অমনি সেটা বাস্তবায়িত হলো- এটাতো একটা অসুস্থ প্রবণতা।

উ ॥ এমনটা আমি মনে করি না। আর তাছাড়া সম্মানের সঙ্গে চলে যাওয়ার মধ্যে কোনো কিন্তু বা লজ্জা নেই। বাংলাদেশের দু'একজন নির্বাচন কমিশনার ছাড়া তো সবাই এ পথেই বিদায় নিয়েছেন।

www.pathagar.com

প্র ॥ আপনি তাহলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কনসেপ্টটি .....

উ ॥ তত্ত্বধায়ক সরকার মানে হচ্ছে একজন পলিটিশিয়ান অপর পলিটিশিয়ানকে বিশ্বাস করে না; একজন অপরজনকে আস্থায় আনতে পারে না। ফলে তারা দেবতা এনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছে। দিস কনসেপ্ট ইটসেল্ফ ইজ এ ভেরি ব্যাড কনসেপ্ট (This concept itself is a very bad concept)। পলিটিশিয়ানরা নিজেরা যদি সৎ না হয়, তাহলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার দিয়ে কিছুই হবে না। 'হারি জিতি নাহি লাজ'- এ ধরনের স্পোর্টসম্যানশিপ স্পিরিট থাকতে হবে। জিততেই হবে-এ মনোভাব ত্যাগ করতে হবে।

প্র ॥ রাজনীতির বর্তমান ধারা কি এভাবেই চলবে বলে মনে করেন?

উ ॥ এ মুহূর্তে থেকেই পরিবর্তন প্রয়োজন। ইতিবাচক রাজনীতির ধারা বর্তমান প্রজন্ম থেকেই শুরু করতে হবে। আমি মনে করি এরশাদ ছাড়া আমাদের দেশের বেশিরভাগ নেতাই দেশপ্রেমিক। এরশাদ যে দেশপ্রেমিক এমন কোনো প্রমাণ আমি পাইনি। যা হোক, সবার দায়িত্বশীলতার মধ্য দিয়ে এ সংকটের অবসান ঘটবে- এটা আমার বিশ্বাস।

প্র ॥ কিন্তু, বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কে?

উ ॥ আসলে ঘন্টা বাঁধার কিছু নেই। শেখ হাসিনা যদি শক্ত হন তবে অধস্তনরা বিপথগামী হতে ভয় পাবেন। খালেদার ক্ষেত্রেও এটা সত্য। আমাদের বর্তমান নেতৃত্বকে দেশের বাস্তব পরিস্থিতি বুঝে পথ চলতে হবে। নিজেদের সমস্যা সমাধানের পথ নিজেদেরই বের করতে হবে।

দুই নেত্রী 'ইগো' সমস্যায় ভুগছেন

প্র ॥ আমাদের দুই নেত্রীর মধ্যে সমস্যাটা কি যা পরস্পরকে কাছে না টেনে দূরে ঠেলছে?

উ ॥ দুই নেত্রীর সমস্যা আসলে 'ইগো সমস্যা'। দু'জনে মুখে নানান কথা বললেও আসলেই তারা দেশের কল্যাণ চান। এ অবস্থায় উভয়ের পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং আস্থার জায়গাটাকে প্রসারিত করতে হবে। বড়দের দেখাদেখি ছোটরা সব সময়ই শেখে। হাসিনা-খালেদা যদি আন্তরিকতা নিয়ে এগিয়ে যান তবে ছোট-খাট নেতা পর্যায়ে কোনো সমস্যা হবে না। টপ লেভেল থেকেই এ কাজ শুরু করতে হবে।

প্র ॥ রাজনৈতিক নেতৃত্বের সততা ও দায়বদ্ধতার জায়গাটিকে প্রশ্ন করা যায় কি? আপনি কি মনে করেন?

উ ॥ ব্যক্তি যদি সৎ হয় তবেই কেবল দায়বদ্ধতা রক্ষা করা যেতে পারে। দেশের মধ্যে একটা সৎ রাজনৈতিক শ্রেণী গড়ে তুলতে না পারলে দেশের কোনো ক্ষেত্রেই

www.pathagar.com

কোনো উন্নতি আসবে না। এটা হাসিনা-খালেদাসহ সকলকেই বুঝতে হবে। রাজনীতিকরা যদি সৎ না হন তবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার কোনো ফলই ফলাতে পারবে না। রাজনৈতিক নেতৃত্ব যদি ঐকমত্যের ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে সিদ্ধান্ত নিতে না পারে তবে অবাধ নির্বাচনই শুধু মাঠে মারা যাবে তা নয়, কোনো কিছুই হবে না।

প্র ॥ 'সংসদই সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু'- এমনটি রাজনৈতিক বাগাড়ম্বরে পরিণত হয়নি কি? বর্তমান সংসদকে কিভাবে মূল্যায়ন করবেন?

উ ॥ বর্তমান স্পিকার একজন দলীয় ব্যক্তি ছাড়া কিছুই নয়। তিনি কারণে অকারণে বিরোধীদলীয় উপনেতার মাইক বন্ধ করে দেন। মনে হয় তিনি যেনো আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হবার ধান্দায় আছেন। তার আচরণ দেখে মনে হয় তিনি সংসদের স্পিকার নন, সরকারি দলের স্পিকার। অন্যান্য দেশে বিরোধীদলীয় সদস্যদেরই বেশি বেশি বলার সুযোগ দেয়া হয়ে থাকে। কিন্তু এদেশে এটা হয় না। তাই বিরোধীরা রাজপথে নামে, হরতাল করে, বোমা ফাটায়। যদিও এ ধারার রাজনীতি বন্ধের জন্য সকল মহলের আন্তরিক চেষ্টা চলানো দরকার।

দৈনিক মাতৃভূমি ১১ই মার্চ, ১৯৯৯

www.pathagar.com

৩২ ভারতের বিরুদ্ধে লেগে থাকা নয় থাকতে হবে সতর্ক

প্রশ্ন ॥ উপমহাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থাকে আপনি কিভাবে দেখছেন?

উত্তর ॥ বেশি ভালোভাবে দেখছি না। অবস্থা ক্রমেই চরম পর্যায়ের দিকে চলে যাচ্ছে। ভারত-পাকিস্তানের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া যে ভাবে চলছে তাতে উপমহাদেশেই পারমাণবিক যুদ্ধ বেধে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে এবং সেজন্য অভিজ্ঞ মহল শংকিত হয়ে পড়েছেন। তাছাড়া ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে যে সম্পর্ক বিরাজ করছে তাকে অধীনতামূলক সম্পর্ক বলে মনে হচ্ছে। তাই যে দিক থেকেই দেখি না কেন '৯৯ সাল একটি নিরাশার আবহ নিয়ে আসছে বলে মনে হয়। সবকিছুই আমাকে হতাশ করে। শতাব্দীটা নিরাপদে শেষ হবে বলে মনে হয় না। উপমহাদেশের দেশগুলো দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিয়েই ব্যস্ত থাকবে। উন্নয়নের গতি তেমন ত্বরান্বিত হবে না। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে এরা সম্ভবত ব্যর্থ হবে। একথা আমি বলছি ব্যথিত মনে, আমার বুঝ অনুসারে।

প্র ॥ এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ সরকারের কার্যক্রমকে আপনি কিভাবে দেখছেন?

উ ॥ বর্তমান সরকারের কার্যক্রমকে আমি আমার দেশের জন্য খুবই ক্ষতিকর হিসেবে দেখছি।

প্র ॥ কারণ?

উ ॥ বর্তমান সরকার তার কাজগুলো ভারতীয় স্বার্থের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে সম্পন্ন করে থাকে। আমাদের পররাষ্ট্রনীতিকে ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির সাবসিডিয়ারি বলা যায়। ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির সঙ্গে মিল রেখেই আমাদের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করা হয়। তাই আমাদের সার্বভৌমত্ব নিয়ে প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। বন্ধু দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে।

প্র ॥ বাংলাদেশ সরকার ইতিমধ্যে ভারতের সঙ্গে যে সব চুক্তি করেছে এবং ভবিষ্যতে করতে যাচ্ছে সে সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কি?

উ ॥ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মাধ্যমে এই সরকার জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দিয়েছে। পানি চুক্তি করে দেশের অনেক ক্ষতি করেছে এবং ভবিষ্যতেও তারা যা করবে তা হবে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিরোধী। দেশের স্বাধীনতাকে তারা বিপদগ্রস্ত করে তুলবে এবং

www.pathagar.com

তারা যে সব পরিকল্পনার কথা বলছে যেমন, গ্লোবালাইজেশন বা অন্যান্য বিষয় আমার মতে, তা বাংলাদেশের জন্য হবে আত্মহত্যার শামিল।

এরশাদকে বিশ্বাস করা যায় না

প্র ॥ তা হলে বিরোধী দলগুলো যে বলছে, এই সরকার জাতীয় স্বার্থবিরোধী সরকার। সবাই মিলে একে হঠানো দরকার তাকে কি আপনি যথার্থ মনে করেন?

উ ॥ অবশ্যই আমি বলতে চাই যে, তারা সরকারবিরোধী যে যুগপৎ আন্দোলনের ঘোষণা দিয়েছে তা যদি তাদের মনের কথা হয় তাহলে এটা হবে '৯৯ সালের সবচেয়ে বড় সংবাদ। আমি আরো বলতে চাই যে, বিরোধী দলগুলোর মধ্যে যে একটা সমঝোতা হয়েছে তা যদি তারা ধরে রাখে তা হলে আওয়ামী লীগ হবে '৫৪ সালের মুসলিম লীগ। তবে এক্ষেত্রে যে বাধাটি দেখা যাচ্ছে সে হলো এরশাদ। কারণ তার ওপর নির্ভর করা যায় না। তিনি পরীক্ষিত নন, কখন কোন দিকে মোড় নেন বলা যায় না। তবে তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, আওয়ামী লীগের সঙ্গে টিকে থাকলে তিনি কর্মীশূন্য হয়ে পড়বেন। তাই তিনি এমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করার সুযোগ পাবেন না যাতে ঐক্যে ফাটল ধরাতে পারে। তারপরও তার প্রতি আমার বিশ্বাস নেই।

বিরোধী দলগুলোর ঐক্যে আমি খুবই আনন্দিত। আমি মনে করি শত বাধা-বিপত্তির মুখেও এই ঐক্য বজায় রাখা জরুরি এবং তারা যে চার দফা দিয়েছে সে ক্ষেত্রে আমি মনে করি দফা হওয়া উচিত একটি এবং তা মধ্যবর্তী নির্বাচনের। মধ্যবর্তী নির্বাচন হওয়ার পরই অন্য সকল নির্বাচন হবে। কারণ আওয়ামী লীগকে দেশ ধ্বংস করার আর সময় দেয়া ঠিক না। তারা ইতিমধ্যেই দেশকে ধ্বংসের প্রায় শেষ সীমায় নিয়ে গেছে।

প্র ॥ একই কথা বলে এরশাদকে হঠানো হয়েছিল, খালেদা জিয়াকে অপসারণ করা হয়। কিন্তু তাতে ক্ষমতার হাত বদল ছাড়া জাতির কি কোন কল্যাণ হয়েছে?

উ ॥ দেখুন, দেশে একটা মেরুকরণ চলছে। এর ফলে বাঙালী জাতীয়তাবাদ এবং বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের পার্থক্য ও অবস্থান সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। একদিকে বাঙালী জাতীয়তাবাদ আর অন্যদিকে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ। অন্তরে যাই থাকুক না কেন, এরশাদ সাহেবও এখন বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের কথা বলেন, ইসলামের প্রতি আস্থার কথা বলেন। এমতাবস্থায় চিরদিনের জন্য বাঙালী জাতীয়তাবাদ শেষ করে দিয়ে স্থায়ীভাবে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার একটা সুযোগ এসেছে বলে আমার মনে হয়। তাই সবাইকে খুব সিরিয়াস হওয়া উচিত। তবে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের কথা বললেই নির্বাচনে জেতা যাবে না। নির্বাচনে জিততে হলে কৌশলি হতে হবে, দক্ষতার পরিচয় দিতে হবে এবং যুৎসই কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে, ভারতপন্থী রাজনীতি খতম করার সুযোগ এসেছে এবং এ সুযোগের সদ্ব্যবহার না করলে ইতিহাসের

www.pathagar.com

কাছে দায়বদ্ধ থাকতে হবে। তাই যে সুযোগ এসেছে তাকে আঁকড়ে ধরতে হবে। আশা করি এরশাদ বা অন্য কেউ পেছন থেকে আন্দোলনে ছুরিকাঘাত করবে না বা পিছুটান দেবে না। তবে অবশ্য এটাও সত্য যে, বিএনপি এখন যেভাবে চলছে তাতে বিএনপি এককভাবেই সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পাবে। এরপরে তার সঙ্গে অন্যান্য বিরোধী দল যোগ দেওয়ায় আওয়ামী লীগের পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে। তবে আওয়ামী লীগ ১৯৫৪ সালে যে ভুল করেছিল বিএনপি যাতে সে ভুল না করে সে দিকেও খেয়াল রাখতে হবে। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন না রাখায় নির্বাচনের পর তাদের অনেক নাকানি-চুবানি খেতে হয়েছিল। বিএনপিকে তা ভুললে চলবে না।

প্র ॥ বিএনপি'র ব্যাপারে আপনি কতটুকু আশাবাদী?

উ ॥ নির্বাচন যদি অবাধ ও নিরপেক্ষ হয় এবং বিএনপি যদি তার আন্দোলন যথাযথ ভাবে চালিয়ে যায় তবে সে এককভাবেও সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারবে বলে আমার ধারণা। তবে অন্যান্য বিরোধী দল তার সঙ্গে যোগ দেয়ায় এটা নিশ্চিত হয়েছে। অতএব এবার আওয়ামী লীগের পরাজয় অনিবার্য। আর যদি আওয়ামী লীগ নির্বাচনে দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে আবারো ক্ষমতায় আসে তাবে তা ৮/১০ দিনের বেশি স্থায়ী হবে না। আর যখন সব দল মিলে আওয়ামী লীগের বিপক্ষে গেছে তখন তারা নির্বাচনে কারচুপির চেষ্টা করবে বলে আমার মনে হয় না। আর করলেও তারা সফল হবে না।

প্র ॥ অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য কি কেবল নির্বাচন কমিশনই দায়ী?

উ ॥ নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হবার জন্য দু'পক্ষেরই দায়বদ্ধতা রয়েছে। কিন্তু এখন সুযোগ পেলে সবাই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন। কেউ নিয়মনীতি মেনে চলেন না। এক্ষেত্রে যারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন তাদের দায়বদ্ধতা অনেক বেশি। যে সব পার্টি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে সে সব দলের প্রধানের ঘোষণাই থাকা উচিত যে হার-জিত যাই হোক না কেন, কোনো প্রকারে ভোট কারচুপি করা যাবে না। এ নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেও সমঝোতা হওয়া প্রয়োজন।

এখন তারা শেখ হাসিনার
পতনের জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন

প্র ॥ কিন্তু প্রধানমন্ত্রী তো বলছেন যে তারা ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন?

উ ॥ এটা রাজনৈতিক স্লোগান। দেশে ভাত বা ভোটের কোনো অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় নি। দেশের ক'জন লোক পেট ভরে খেতে পারে। আর ভোটের অধিকার তো আমরা দেখছি। যে যেখানে পারে সে সেখানে ব্যালট বাক্স ছিনতাই করে।

www.pathagar.com

প্র ॥ কিছুদিন থেকে সরকার এক এক অভিযোগে এক একজনকে ধরে শারীরিক নির্যাতন চালায়। কিন্তু বিচারে তারা নিরপরাধ প্রমাণিত হয়। একে কি ভাবে দেখছেন?

উ ॥ এটা আওয়ামী লীগের ফ্যাসিস্ট চরিত্রের লক্ষণ। আপনারা তুলনা করে দেখুন, আওয়ামী লীগ দু'বছরে মানুষকে যত নির্যাতন করেছে সে তুলনায় বিএনপি'র পাঁচ বছরে কতজন মানুষ নির্যাতিত হয়েছে? বিএনপি কতজন ছাত্রকে গ্রেফতার করেছিল?

প্র ॥ কিন্তু আপনাদের মতো একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী তো এর বিরোধিতা করছেন?

উ ॥ আওয়ামী লীগের এসব বুদ্ধিজীবী শেখ মুজিবের পতনকে ত্বরান্বিত করেছিল। এখন আবার শেখ হাসিনার পতনের জন্য উঠে পড়ে লেগেছে।

প্র ॥ সরকারের জাতীয় স্বার্থবিরোধী কাজে তাদের সমর্থনকে কিভাবে দেখছেন?

উ ॥ এর সঙ্গে প্রাপ্তির যোগ আছে। তাদের ধারণা সরকারের পক্ষে থাকলে ভালো পদ পাওয়া যায় এবং পাচ্ছেনও তারা।

প্র ॥ এর ফলে যে দলীয়করণ হচ্ছে তার ফলাফল কি?

উ ॥ প্রথমত সরকারের বৈধতা নষ্ট হয়ে যায়। যোগ্য ব্যক্তি জায়গা পাবে সরকারের কাছে, এটা সবাই আশা করে। কিন্তু দলীয়করণের ফলে এ আশা পূরণ হয় না। অযোগ্য লোকেরা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে। যেমন : অধ্যাপক খালেককে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি করা হয়েছে। অথচ তিনি এ পদের জন্য মোটেই যোগ্য নন। ফলে সরকারের বৈধতাই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে এবং সরকার বুঝতে পারছে না যে, তাদের সমর্থনের নামে সরকারের গ্রহণযোগ্যতা নষ্ট হচ্ছে।

প্র ॥ আমাদের শিক্ষাঙ্গনে আওয়ামী লীগের শাসনের কি ধরনের প্রভাব পড়ছে?

উ ॥ নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। বিশেষ করে দলীয়করণের কারণে।

প্র ॥ আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে কিভাবে দেখছেন?

উ ॥ আমার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করার অনেক লোক আছেন আওয়ামী লীগের ব্লকে, যারা বলেন যে ভারতের তরফ থেকে আমাদের জন্য কোনো হুমকি নেই এবং এ বিষয়ে মত দিতে তারা কোনো রাখ-ঢাক করছেন না। কিন্তু আমার ধারণা ভিন্ন। ভারত আমাদের জন্য অবশ্যই একটা হুমকি। এটা মনে রেখেই আমাদেরকে নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এর অর্থ এই নয় যে, আমরা সব সময় ভারতের বিরুদ্ধে লেগেই থাকবো। তবে আমরা যাতে ভারতের দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ক্ষতির সম্মুখীন না হই সে জন্য সতর্ক থাকতে হবে।

প্র ॥ কিন্তু তার জন্য তো সামরিক খাতে ব্যয় বাড়ানোর দরকার। একদল লোক তো এর বিরোধিতা করছে।

উ ॥ সামরিক খাতের উন্নয়ন কেউ বন্ধ করতে পারবে না। তাই আমাদের সামরিক বাহিনীর বাজেট খালেদা জিয়াও কমাতে পারেন নি, শেখ হাসিনাও তা করেন নি। বরং যা শোনা যায় তাতে বলা হয় আর্মির ফাইলটাই আগে দেখা হয়। সামরিক বাহিনীর দাবি

www.pathagar.com

সবার আগে পূরণ করা হয়। অতএব যে যাই বলুক না কেন সামরিক বাহিনীর ব্যয় কমানো কঠিন ব্যাপার।

প্র ॥ দেশের নিরাপত্তার জন্য বর্তমান সামরিক বাহিনীকে কি যথেষ্ট মনে করেন?

উ ॥ আমি মূলত সিটিজেন আর্মির সমর্থক। অর্থাৎ দেশের প্রতিটি বয়স্ক লোকই সামরিক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হবে। এটাই একটি ছোট দেশের নিরাপত্তা।

সাপ্তাহিক বিক্রম, ২ মার্চ ৯৯

www.pathagar.com

৩৩ বাংলাদেশ রাজনীতির ভবিষ্যৎ

ষাটের দশকের গোড়ায় কানাডার কুইনস বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি-র ছাত্র থাকাকালে আমি এডওয়ার্ড শিলস (Edward Shils) লিখিত ৮০ পৃষ্ঠার একটি ছোট্ট গ্রন্থ 'নতুন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক উন্নয়নের' সঙ্গে পরিচিত হই। বিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় সমাজবিজ্ঞানী শিলস তার ওই বইটির উপসংহার টানেন এই বলে যে, "আধুনিকতার নগরে পৌছানোর কোনো সরল ও সোজা রাস্তা নেই। যে পথই বেছে নেয়া হোক না কেন তার কোনো একটি পাশে শেওলাযুক্ত জলা ও বর্জ্য থাকবেই। থাকবে অনেক মরচে পড়া ও ধ্বংসপ্রাপ্ত আকাঙ্ক্ষা এবং যারা শেষ পর্যন্ত সেই নগরে পৌছবে তারা অবাক বিস্ময়ে আবিষ্কার করবে সম্পূর্ণ এক অচেনা নগরের। কারণ দেখা যাবে যে তারা ও তাদের পূর্বসূরিরা যে গন্তব্যে পৌছতে চেয়েছিলেন তার সঙ্গে এই নগরীর কোনো মিল নেই। এ এক সম্পূর্ণ পৃথক জগৎ।" নিজের অনুন্নত সমাজের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে উদগ্রীব একজন আদর্শবাদী ও উদ্যমী তরুণ হিসেবে শিলসের ওইরূপ মূল্যায়ন আমাকে সেদিন বেদনাহত করে। ভেবেছিলাম শিলসের মতো একজন উঁচুদরের অধ্যাপকও বাগড়ম্বরের উর্ধ্বে নন। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশের ওপর গত চারদশক ধরে গবেষণা ও সমীক্ষা চালানোর পর আজ আমি উপলব্ধি করতে পারছি যে, অধ্যাপক এডওয়ার্ড শিলসের মন্তব্য কতই না অকাট্য ছিল। গত ৫০ বছরে আমরা সাবেক অবিভক্ত পাকিস্তানের বিভীষিকাময় ভাঙন দেখেছি। দেখেছি একটি রক্তস্নাত স্বাধীনতা যুদ্ধ- যে যুদ্ধে বাংলাদেশীরা রক্ত ও সম্পদ উভয় দিক থেকেই দিয়েছে অতি চরম মূল্য। দেখেছি ক্রমেই স্ফীত হয়ে ওঠা 'প্রত্যাশার বিপ্লব' আর সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ফুলে-ফেঁপে ওঠা 'হতাশার বিপ্লব'। আর তারপর দেখেছি পঁচাত্তরের বিয়োগান্তক অধ্যায় এবং অব্যবহিত পরবর্তী টানা দু'দশকের সামরিক শাসন। এমনকি আজো প্রত্যক্ষ করছি, 'বিজয়ীরাই সবটুকু শুষে নেবে'-র প্রেতাত্মা আমাদের বর্তমান নেতৃবৃন্দকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। ভয় হয়, যা কিনা বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ রাজনীতিকে আবারো ধ্বংসের ঘূর্ণাবর্তে নিক্ষেপ করতে পারে।

বাংলাদেশীদের একটি ভাগ্যবান জাতি হওয়ার কথা ছিল। কারণ অভিন্ন ভাষা ও সমগোত্রীয় না হওয়ার ফলে মধ্য বিশ শতকের দিকে স্বাধীনতা লাভকারী বিশ্বের বহু

www.pathagar.com

"নতুন জাতি" গভীরতর সংকটে নিপতিত হয়েছে। কিন্তু সে সমস্যা বাংলাদেশের না থাকা সত্ত্বেও তাদের মতো দ্বন্দ্ব-সংঘাত আজো এদেশের রাজনীতিকে কুরে কুরে খাচ্ছে। মনে হচ্ছে, আওয়ামী লীগের দ্বিতীয় প্রজন্মের নেতৃবৃন্দ আওয়ামী লীগের প্রথম প্রজন্মের নেতৃবৃন্দ যারা স্বাধীনতা অর্জন করতে পেরেছে কিন্তু দেশ শাসনে ব্যর্থ হয়েছে তাদের ভুল থেকে কোনো শিক্ষাই গ্রহণ করতে পারে নি। আওয়ামী লীগের বর্তমান শাসকরা স্বাধীনতা পরবর্তী শেখ মুজিব সরকারের মতোই একচেটিয়া দেশপ্রেমের জিগির তুলেছে এবং 'স্বাধীনতা যুদ্ধের শত্রু নির্মূলের' নামে গণতান্ত্রিক রাজনীতির 'রুলস অব গেম' লংঘন করে সকল আইনানুগ বিরোধী দলকে দমনের চেষ্টা করছে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ে শেখ মুজিবের অনন্যসাধারণ ভূমিকার কথা কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। কিন্তু তাই বলে সদ্যপ্রসূত বাংলাদেশ শাসনে মুজিব সেদিন যে কলা-কৌশল অবলম্বন করেছিলেন তা আওয়ামী লীগের বর্তমান নেতৃবৃন্দ অনুসরণ করুক তা কাম্য নয়। মুজিব তো কেবল তার নিজের ও পরিবারের জন্যই নয়, দেশের জন্যও বিপর্যয় ডেকে এনেছিলেন।

বাংলাদেশ রাজনীতির সমস্যা আকীর্ণ স্থানগুলো সকল চক্ষুষ্মানের কাছেই পরিষ্কার। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের যে কোনো উপায়ে নির্বাচনে জয়লাভের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করা উচিৎ। দেশের রাজনৈতিক উন্নয়নে এখন সবার আগে উচিত যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন।

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সম্পূর্ণরূপে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন কেবল তখনই সম্ভব যখন প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলো (বিশেষত তাদের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ) বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিকভাবে এবং বাস্তবেও অবাধ নির্বাচনে সংকল্পবদ্ধ থাকে। অবাধ নির্বাচনই কেবল ভবিষ্যৎ সরকারকে বৈধতা দিতে পারে এবং শুধু একটি বৈধ সরকারই প্রশাসনিক ও গোষ্ঠীগত সমতা অর্জন সংক্রান্ত সমস্যাবলীর ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন বয়ে আনতে পারে।

দুর্ভাগ্যবশত: "বাংলাদেশের রাজনৈতিক কৌমার্য্য হরণ করে নিয়েছেন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি শেখ মুজিব স্বয়ং।" ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ অনুষ্ঠিত প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কয়েকটি আসনে কারচুপিতে মুজিবের সম্পৃক্ততার অভিযোগ উঠলে লন্ডনের দি গার্ডিয়ান পত্রিকা এই মন্তব্য করে। বাস্তবিক বাংলাদেশের সরকারগুলোর বৈধতার সংকট সেই থেকেই তার নেতিবাচক ফলাফল নিয়ে অনুগামী হয়ে চলেছে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতিষ্ঠা নির্দিষ্ট একটা মাত্রায় সহায়ক বটে। কিন্তু অবাধ নির্বাচন তখনই সম্ভব হতে পারে যখন দেশের 'মহাবিভক্ত' দুই পক্ষ কঠোরভাবে গণতান্ত্রিক রাজনীতির 'রুলস অব গেম' মেনে চলবে। পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনগুলো কতটা অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যাবে তার উপরই নির্ভর করছে বাংলাদেশ রাজনীতির ভাবষ্যৎ। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যদি পরবর্তী নির্বাচনগুলোর ক্ষেত্রে তাদের কথা ও কাজে সততা প্রদর্শনে ব্যর্থ হন তবে বাংলাদেশের সর্বক্ষেত্রে যে অবক্ষয় চলছে তা নতুন শতাব্দীতেও অব্যাহত থাকবে। স্বাধীনতা লাভের প্রায় দুই দশক পরেও কিন্তু

www.pathagar.com

লাতিন আমেরিকার দেশগুলো এখনো পর্যন্ত সত্যিকারের কোনো টেকসই গণতান্ত্রিক পদ্ধতি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়নি।

উন্নয়নশীল দেশের অল্পসংখ্যক ক্ষমতাসীন এলিট স্বতঃপ্রণোদিতভাবে অবাধ নির্বাচনে নিজেদেরকে ব্যাপৃত রেখেছেন। সুতরাং শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিবাদের অর্থনৈতিক ফলাফল সম্পর্কে কল্পনাবিলাসী 'আইভরি-টাওয়ার' পণ্ডিতদের মিষ্টি মিষ্টি উপদেশ সত্ত্বেও বর্তমান শাসন ব্যবস্থার প্রতি শাসনতান্ত্রিক বিরোধিতা একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহতই থাকবে। যদি বর্তমান সরকার তার অনুসৃত নীতিতেই অনমনীয় থাকে তবে বাংলাদেশকে একটি ফ্রাঙ্কো টাইপের স্বৈরতন্ত্রের হাতে দীর্ঘকাল জিম্মি হতে হবে। যা কেবল নাগরিকদের জন্য 'কবরের শান্তি' নিশ্চিত করবে।

চিরায়ত রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদগণ সামাজিক শক্তিসমূহের ভূমিকার অতিরিক্ত মূল্যায়নজনিত সমস্যায় ভোগেন। নতুন রাষ্ট্রের সকল প্রকার উন্নয়নে বুদ্ধিদীপ্ত নেতৃত্ব ও সৃজনশীল সুশীল সমাজ এখন মূল কারণ হিসেবে সার্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করেছে। অন্যথায় 'সুশাসনের' সার্বজনীন ওকালতি কোনো তাত্ত্বিক ভিত্তি লাভ করে না। একজন নেহরু অথবা ম্যান্ডেলা একটি জাতি ও রাষ্ট্র গঠনে অসামান্য ভূমিকা রাখতে পারেন। বাংলাদেশীদের দিক থেকে এটা কি আশা করা অসঙ্গত হবে যে, আমাদের জাতির নেতৃবৃন্দ শুধু ক্ষমতাকেন্দ্রিক হীন রাজনীতিতে নিজেদেরকে আবদ্ধ রাখার পরিবর্তে রাষ্ট্রনায়োকোচিত মর্যাদার আসনে উন্নীত হবেন?

দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট, ১ জানুয়ারি ২০০০
ভাষান্তর : মিজানুর রহমান খান

www.pathagar.com

৩৪ জননিরাপত্তা আইন : বিরোধী দল দমনের হাতিয়ার

সরকার জননিরাপত্তা আইন প্রণয়নে যেসব যুক্তি দেখিয়েছে তাতে বাংলাদেশের সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কে জ্ঞান আছে এমন যে কোনো ব্যক্তির কাছেই এসব যুক্তি গ্রাহ্য নয়। যেসব অপরাধের কথা বলা হয়েছে, সেগুলো সাধারণত সরকার সমর্থিত এবং সরকার দ্বারা আশ্রিত ব্যক্তিদের দ্বারা সংঘটিত হয়। সরকার যেহেতু তাদের মদদ দেয়, সে জন্যই আমাদের বিচার ব্যবস্থায় তাদের শাস্তি হয় না। অর্থাৎ সন্ত্রাসীরা বর্তমান রাষ্ট্রশক্তির দ্বারা পালিত বলে তারা আইনের উর্ধ্বে কাজ করার সাহস পায়। সুতরাং এসব অপরাধ দূর করতে হলে সরকারকে প্রথমে নিজেকে সংশোধন করতে হবে এবং সরকারি মহল কর্তৃক সকল প্রকার রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বন্ধ করতে হবে। বিগত সাড়ে ৩ বছরে সরকারের যেসব আচরণ আমরা দেখেছি তাতে মনে হয়, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চালানো তাদের দেশ শাসনের একটা বিশেষ পন্থা। সুতরাং আমার মনে হয়, এই আইন করার ফলে সরকার পক্ষের সন্ত্রাসীরা সন্ত্রাস করতেই থাকবে এবং সরকার পুলিশ বাহিনীকে ব্যবহার করে সরকারের সমালোচক এবং সাধারণ জনগণকে হয়রানি করে দেশে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করবে। অর্থাৎ বিরোধী দলকে নির্মূল করতে এটি সরকারের একটি সর্বাত্মক একনায়কতান্ত্রিক ব্যবস্থা। আওয়ামী লীগ সরকারের ফ্যাসিস্ট চরিত্রের নগ্নবহিঃপ্রকাশ আছে এই জননিরাপত্তা আইন পাসের উদ্যোগে। এই আইন সংবিধান ও জনগণের মৌলিক অধিকার বিরোধী এবং শেখ মুজিব আমলের বিশেষ ক্ষমতা আইনের মতোই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ওপর চরম আঘাত স্বরূপ। তাই এই আইনকে শান্তিপূর্ণভাবে এবং সর্বতোভাবে প্রতিহত করা সকল দেশপ্রেমিক নাগরিকের কর্তব্য। এই আইন পাশ্চাত্য জগতের Rule of law বা আইনের শাসনের ধারণা বা concept-এর চরম পরিপন্থী।

আসামিদের আপিলের সুযোগ না দেওয়া একটা বেআইনি শাসকগোষ্ঠীই চিন্তা

www.pathagar.com

করতে পারে। সুতরাং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের দিক থেকে এই সরকারের ক্ষমতায় থাকার কোনো অধিকার নেই। এই ক্ষমতার বলে সরকার ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করে দেশকে চরম অরাজকতার মধ্যে নিয়ে যাবে। বর্তমানে সারাদেশে সরকারবিরোধী আন্দোলনের যে অগ্নিকুণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে সরকার নিজেই তাতে পেট্রোল ঢেলে দিল এই আইনের মাধ্যমে। সুতরাং আমার মত হচ্ছে সরকার যে প্রক্রিয়ায় ক্ষমতা আকড়ে থাকার চেষ্টা করছে, তা থেকে বিরত থাকুন এবং অবিলম্বে একটা কেয়ারটেকার সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে নতুন নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের নতুন ম্যান্ডেট গ্রহণের চেষ্টা করুন। সেটাই দেশের প্রকৃত কল্যাণ বয়ে আনবে।

দৈনিক ইনকিলাব, ১ ফেব্রুয়ারি ২০০০

www.pathagar.com

৩৫ তৃতীয় বিশ্বের গ্যাস আহরণে বহুজাতিক কোম্পানির ভূমিকা

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরপরই ঔপনিবেশিক রাজনৈতিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রায় একশ'টি নতুন রাষ্ট্র রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৫০-৯৮ পর্যন্ত সারা ঠাণ্ডা-যুদ্ধের সময় মার্কসপন্থী চিন্তাবিদরা এই তত্ত্ব প্রচার করেন যে, ঔপনিবেশিক শাসনের রাজনৈতিক অবসান হলেও তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর ওপর পাশ্চাত্যের ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর অর্থনৈতিক শোষণ অব্যাহত থাকে। তারা অত্যন্ত প্রভাবশালী একটা নতুন তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন যা Dependency theory নামে পরিচিত। এই তত্ত্বের প্রথম প্রবর্তক হলেন আন্দ্রে গুন্ডার ফ্রাঙ্ক (Andre Gunder Frank)। এই তত্ত্বের মূল কথা হলো : স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পরও একটি বহুজাতিক এবং জাতীয় পুঁজির কোয়ালিশন পরোক্ষভাবে এবং বিবিধভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলোর সম্পদকে উন্নতশীল দেশের দিকে 'রি-ডিরেক্ট' করে। Dependency তাত্ত্বিকদের মতে, তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশ থেকে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলোতে এই সম্পদ স্থানান্তর ঘটে বিশেষত বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর মধ্য দিয়ে। এর অবশ্য কতকগুলো Objective কারণ রয়েছে। যেমন প্রযুক্তির অভাব, পুঁজির অভাব, দক্ষ জনশক্তির অভাব উন্নয়নশীল দেশকে বাধ্য করে বহুজাতীয় কোম্পানির সাহায্য নিতে। তাদের ভূগর্ভস্থ সম্পদ উত্তোলন ও কার্যকরী করার জন্য। প্রাকৃতিক সম্পদের উত্তোলন ও বাজারজাত করার উপযোগী করে গড়ে তুলতে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর সাহায্য নিতে বাধ্য হয়। বহুজাতিক কোম্পানিগুলো প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর উন্নয়নশীল দেশের এই দুর্বলতাকে ব্যবহার করে। এজন্য তারা উন্নয়নশীল দেশগুলোর ওপর অসম উৎপাদন ব্যয় ও মুনাফা বাগানোর অসম চুক্তি চাপিয়ে দেয়। উন্নয়নগামী দেশগুলোর প্রাকৃতিক সম্পদের Absorption Capacity কম থাকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো পরামর্শ দিয়ে থাকে যে, তোমরা আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ উত্তোলন করতে দাও এবং যেহেতু তোমরা এই প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করতে পারবে না, সেগুলো রফতানি করে তারপর পুঁজি গঠন করে তোমাদের দেশের শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করো। আপাতদৃষ্টিতে কথাটি যৌক্তিক মনে হলেও বাস্তবে দেখা যায় যে, উৎপাদন ব্যয় শেষ পর্যন্ত এত বেশি হয়ে যায় যে, উদ্বৃত্ত যা রফতানি করা হয়, তা বৈদেশিক মুদ্রায় উৎপাদন ব্যয়ের জোগান

www.pathagar.com

দিতেই নিঃশেষিত হয়। অনেকেই বলেন, এই পদ্ধতিতেই তেলসমৃদ্ধ নাইজেরিয়া উন্নত দেশে পরিণত না হয়ে আরও অনুন্নয়নের চক্রে নিপতিত হয়েছে।

বাংলাদেশের এই ভূখণ্ডে ব্রিটিশ আমলে ১৯১০ সাল থেকে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানের কাজ শুরু হয়। ওই সময় থেকে মধ্য ত্রিশ দশক পর্যন্ত ৬টি অনুসন্ধান কূপ খনন করা হয়। কিন্তু তেল বা গ্যাসের কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ১৯৫১ থেকে '৭১ সালের মধ্যে ২২টি অনুসন্ধান কূপ খনন করা হয় যার সঙ্গে ৮টি গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছিল। বাংলাদেশে ১৯৯৮ পর্যন্ত মোট ২৯টি অনুসন্ধান কূপ খনন করা হয় যার ফলে ১৩টি গ্যাস ক্ষেত্র এবং একটি ক্ষুদ্র তেল ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়। থেমে থেমে গত ৭ দশকের তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানের প্রক্রিয়ায় মাত্র ৫৭টি অনুসন্ধান কূপ খননের এই হারকে খুবই নগণ্য মনে করা হয়। তবে সুখের বিষয়, বাংলাদেশের সাফল্যের হার (২.৭:১) যা পৃথিবীর যে কোনো সাফল্য হার থেকে অনেক বেশি (পৃথিবীর গড় সাফল্য ১০:১)।

এই সাফল্যের কারণেও বিশ্বের বড় বড় তেল অনুসন্ধানী কোম্পানিগুলো বাংলাদেশের ওপর নজর তীক্ষ্ণ করেছে। কিছুদিন আগে কানাডা প্রস্তাব দিয়েছে যে, বাংলাদেশের পরিত্যক্ত গ্যাস ক্ষেত্রগুলোতে তারা নতুন করে খনন কার্য চালাতে চায়। এ প্রসঙ্গে আরেকটি কথা বলতে হয় তা হলো, বাংলাদেশের গ্যাস ও তেল অনুসন্ধানের প্রয়াস কিন্তু মোটেই কণ্টকমুক্ত নয়। এ অবস্থাটিকে ডাঙায় বাঘ, জলে কুমির বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না। কারণ ৫৬ হাজার বর্গমাইলের এই ভূখণ্ডের তিন দিক দিয়ে বেষ্টন করে আছে ভারত ও মায়ানমার। অন্যদিকে সমুদ্রের জলরাশি। কিন্তু সেখানেও সমুদ্রসীমা নিয়ে বিরোধ আছে মায়ানমার ও ভারতের সঙ্গে। স্মরণ করা যেতে পারে যে, ১৯৭৪ সালের এপ্রিলে বাংলাদেশ সমুদ্রসীমা নিয়ে ভারতের সঙ্গে সমঝোতার প্রস্তাব দিয়ে কোনো সাড়া পায়নি এবং সে পরিপ্রেক্ষিতেই বাংলাদেশ একতরফাভাবে টেরিটরিয়াল ওয়াটার জোন অ্যাক্ট প্রণয়ন করে এবং ৭টি বিদেশী (৪টি আমেরিকান ও ৩টি অন্যান্য) কোম্পানিকে তেল অনুসন্ধানে আহ্বান জানায়। কিন্তু সেই প্রচেষ্টা ভারতীয় নৌবাহিনী শক্তি প্রয়োগ করে বন্ধ করে দেয়। সমুদ্রসীমা নিয়ে সেই অচলাবস্থার অবসান আজো হয়নি। জে এন দীক্ষিত সম্প্রতি লিখেছেন, বঙ্গোপসাগরে তেল পাওয়া গেলে বাংলাদেশকে তার ভাগ দেয়া হবে– এরকম সমঝোতার ভিত্তিতে ভারতের উচিত বাংলাদেশের সঙ্গে সমুদ্রসীমা ইস্যুর নিষ্পত্তি করা। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে খবর পাওয়া যাচ্ছে, দু'দেশের আন্তর্জাতিক স্থল সীমান্ত রেখার কাছাকাছি ভারত একের পর এক গ্যাস ও তেল ক্ষেত্র আবিষ্কার করে চলেছে। বাংলাদেশ সালদা নদী গ্যাস কূপ খনন প্রকল্প কিন্তু ভারতের বহু পরে চালু করে। ওই কূপের বিপরীতে ভারত বহু আগেই গ্যাস উত্তোলন করেছিল। পরে আমাদের দেশের ভূতাত্ত্বিক জরিপে উদঘাটিত হয় যে, ভারতে গ্যাস কূপের স্ট্রাকচার বাংলাদেশ ভূখণ্ডেও বিস্তৃত।

www.pathagar.com

ভূগর্ভস্থ তরল সম্পদ নিয়ে বাংলাদেশ নানান দিক থেকে বহুজাতিক কোম্পানি ছাড়াও প্রতিবেশী দেশগুলোর শ্যেন দৃষ্টিতে রয়েছে। মায়ানমার অধুনা বলতে শুরু করছে যে, তারা বাংলাদেশের ভূখণ্ড দিয়ে পাইপ লাইনের মাধ্যমে ভারতে গ্যাস রফতানিতে আগ্রহী। আর ভারত তো বাংলাদেশের গ্যাস পেতে সব সময়ই প্রস্তুত। বহুজাতিক কোম্পানিগুলো একমাত্র সুবিধাজনক বাজার হিসেবে ভারতকেই বেছে নেওয়ায় বাংলাদেশের ওপর চাপ আরও বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে। ১৯৭৭-৭৮ সালে গ্যাস উত্তোলনের একটি বড় উদ্যোগ হাতে নেয়া হয়েছিল।

তখনই প্রশ্ন ওঠে, যদি সত্যিই প্রচুর পরিমাণে গ্যাস পাওয়া যায়, তাহলে সেটাকে রফতানি করে বাংলাদেশ কি সত্যিই রাতারাতি ধনী দেশে পরিণত হতে পারবে? তখনকার দিনের কয়েকজন আমলা এবং গ্যাস বিশেষজ্ঞ জিয়াউর রহমানকে গ্যাস উত্তোলনের প্রচেষ্টা নতুন করে শুরু করে গ্যাস রফতানির চিন্তা-ভাবনা করার পরামর্শ দেন। যতদূর জানি, তখনকার রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান গ্যাস উত্তোলন এবং রফতানির পক্ষে প্রথম দিকে রাজি হলেও শেষে মত বদলান। তিনি মনে করেন, সব গ্যাস উত্তোলন করে বিক্রি করলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ওপর একটা অবিচার করা হবে। জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর জেনারেল এরশাদের শাসনামলে গ্যাস নিয়ে তেমন কোনো সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোগ দেখা যায়নি। তার কারণ আমাদের মনে হয়, জেনারেল এরশাদ নিজে ক্ষমতায় থাকার জন্য এত বেশি পলিটিক্স করতে থাকেন, দেশের সত্যিকার দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে ভাবার সময় তার ছিল না। তদুপরি গ্যাস উত্তোলন করতে গিয়ে যদি ভারতের সঙ্গে কোনো বিরোধ বাধে, এই ভয়ে তিনি সেদিকে পা বাড়ানোর ঝুঁকি নিতেই প্রস্তুত ছিলেন না। এরশাদের পতনের পর বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম সংস্থা ও বাপেক্স বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশ সমুদ্রসীমার মধ্যে গ্যাস উত্তোলনের প্রক্রিয়া শুরু করে। ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশের জ্বালানি নীতি ঘোষণা এবং আমেরিকার হিউস্টনে প্রথম বিডিং রাউন্ড অনুষ্ঠানের পরপরই বিশ্বব্যাপী প্রচার চলে যে, বাংলাদেশ গ্যাসের ওপর ভাসছে। সে প্রচারণার ফলে 'তলাবিহীন ঝুড়ি' বাংলাদেশের ওপর বহুজাতিক কোম্পানিগুলো শকুনের মতো দৌড়ে আসে। আসে ব্রিটিশ কোম্পানি কেয়ার্ন, ডাচ কোম্পানি শেল, আমেরিকান কোম্পানি অক্সিডেন্টাল, টেক্সাকো, শেভরন, আয়ারল্যাণ্ডের টাল্লো ইত্যাদি।

বাপেক্স ও পেট্রোবাংলার মতে, বর্তমানে আমাদের উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের মজুদ ১০ ট্রিলিয়ন কিউবিক ফিট, বর্তমান ও ভবিষ্যতে দেশে গ্যাস ব্যবহারের হার এবং দেশের চাহিদার অভিক্ষেপণ বিবেচনা করে বিশেষজ্ঞরা ধারণা করছেন যে, দেশের অবশিষ্ট মজুদ ২০১৫ সাল নাগাদ নিঃশেষ হয়ে যাবে। ১৯৯৯ সালের ৩০ জুন সরকারের পক্ষেও

www.pathagar.com

সংসদকে একই তথ্য দেয়া হয়। সুতরাং বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞগণ যথার্থই বলেন যে, বহুজাতিক কোম্পানি কর্তৃক গ্যাস উত্তোলন না করে নিজেদের প্রযুক্তি ও বিশেষজ্ঞ ক্ষমতা ধীরে ধীরে বাড়িয়ে এ দেশের এনার্জি সেক্টরকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু বহুজাতিক কোম্পানির বিশেষজ্ঞগণ তবুও বলতে থাকেন, বাংলাদেশের গ্যাসের মজুদ প্রায় ৩০ ট্রিলিয়ন কিউবিক ফিট। এমনকি কোনো প্রকার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ছাড়াই বাংলাদেশে ১০০ ট্রিলিয়ন গ্যাসের মজুদ আছে মর্মেও অতিরঞ্জিত চিত্র আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে তুলে ধরেন। তারা যুক্তি দেখান, ভবিষ্যতে প্রযুক্তিগত কারণে গ্যাসের মূল্য হ্রাস পাবে এবং তাড়াতাড়ি গ্যাস উত্তোলন করে প্রয়োজনে ভারতে সরবরাহ করে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম ধনী দেশে পরিণত করা যেতে পারে। বাংলাদেশ সরকারের ওপর পশ্চিমী দেশসমূহের চাপ প্রবল থেকে প্রবলতর হতে থাকে। এই সরকারকে বোঝাবার জন্য আনা হয় কয়েকজন সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে। শুধু তাই নয়, আরো আসেন জ্বালানি মন্ত্রী বিল রিচার্ডসন, যিনি ক্লিনটনের অন্যতম বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা। এমনকি এডিনবরায় কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলন কালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার যৌথভাবে কেয়ার্ন কোম্পানির দফতর উদ্বোধন করেন। ক্লিনটন বাংলাদেশে আসবেন কিনা- এ প্রশ্নের উত্তরে একজন মার্কিন কূটনীতিক বলেন, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কোথাও ভ্যাকেশনে যান না। তেল সম্পর্কে সিরিয়াস আলোচনা হলেই যেতে পারেন। বিদায়ী ব্রিটিশ হাইকমিশনার ডেভিড সি ওয়াকার ও মার্কিন রাষ্ট্রদূত জন সি হোলজম্যান গ্যাস উত্তোলন ও তা রফতানি করার জন্য প্রকাশ্যে যুক্তি দিতে থাকেন। বৈদেশিক দূতাবাসের বিভিন্ন পার্টিতেও পাশ্চাত্য কূটনীতিকরা বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী, সরকারি কর্মকর্তা, রাজনীতিবিদদের কাছে গ্যাস রফতানির উপকারিতা সম্পর্কে অনেক পরামর্শ দেন। ১৯৯৯ সালের ২২ মার্চে সিরডাপ মিলনায়তনে বাংলাদেশে গ্যাস শিল্পের সম্ভাবনা শীর্ষক একটি নিবন্ধ উপস্থাপন করেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত জন সি হোলজম্যান। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহযোগী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ল অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল এফেয়ার্স বিলিয়া আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে হোলজম্যান বলেন, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ গ্যাস শিল্পের স্বার্থে বাংলাদেশের গ্যাস যে কোনো বিবেচনায় ভারতে রফতানি করা উচিত। তার মতে, গ্যাস রফতানি করা ঠিক হবে কি হবে না তা কেবলই রাজনৈতিকভাবে বিতর্কিত ইস্যু। তিনি ব্যঙ্গ করে বলেন যে, যা কিনা সংবাদপত্রগুলো হেডলাইন তৈরি করতে পছন্দ

www.pathagar.com

করে। ১৯৯৯ সালের মার্চে মার্কিন সংবাদ সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস গ্যাস বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও বিরোধীদলীয় নেত্রী খালেদা জিয়ার সাক্ষাৎকার প্রচার করে। এতে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের জনগণই হলো অগ্রাধিকার। তাদের হক তাদেরই পাওয়া উচিত। তা নিশ্চিত করেই কেবল আমরা গ্যাস রফতানির কথা চিন্তা করতে পারি।' খালেদা জিয়া বলেন, 'আমরা আমাদের সম্পদ বিক্রি করে ভিক্ষুকের জাতিতে পরিণত হতে পারি না।' এই মন্তব্য সম্পর্কে হোলজম্যানের মূল্যায়ন হল, তিনি কিছুতেই রফতানির ক্ষেত্রে একে শেষ কথা বলে মানতে রাজি নন। তবে মজার বিষয় হলো, হোলজম্যান তার নিবন্ধে স্বীকার করেন যে, গ্যাস ভোগের প্রবৃদ্ধি যদি বছরে ১০ শতাংশও ধরা হয় তবে আগামী ১৭ বছরে অর্থাৎ ২০১৫ সাল নাগাদই আবিষ্কৃত গ্যাসের মজুদ শেষ হয়ে যাবে। উপরন্তু তিনি স্বীকার করেন যে, বাংলাদেশের গ্যাসের মজুদ সম্পর্কে নির্দিষ্ট তথ্য জানা যায় না। কিন্তু পরিহাস হলো, এরপরও তিনি জবরদস্তি রফতানির জন্য সুপারিশ করেন। তবে তিনি ধন্যবাদ পেতে পারেন এজন্য যে, বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর ব্যবসায়িক স্বার্থের কথা তিনি গোপন রাখেননি। বলেছেন, মাত্র গত কয়েক বছরে তারা এদেশে প্রায় ৬০০ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছেন। আর বাংলাদেশের মতো দেশে তাদের বিনিয়োকৃত অর্থ তারা বড়জোর ৪/৫ বছরের মধ্যে এবং তা বৈদেশিক মুদ্রায় ফেরত পেতে আগ্রহী। নইলে তাদের পোষায় না।

আমরা এ বিষয়ে কোনো বিশেষজ্ঞ নই। বাংলাদেশের গ্যাস বিশেষজ্ঞদের সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ পড়ে এবং বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে আমরা যা বুঝতে পারি তাতে মনে হয়, আমাদের গ্যাসের মজুদ যাই হোক না কেন, ধীরে ধীরে আমাদের প্রযুক্তি উন্নত করে আমাদের বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে তা উত্তোলন করা উচিত এবং এমন ব্যবস্থা নেওয়া উচিত যাতে বাংলাদেশে গ্যাস আরো ব্যাপকভাবে ব্যবহারের অবকাঠামো তৈরি হয় এবং সেই চাহিদা অনুযায়ী ধীরে ধীরে বাংলাদেশকে বিদ্যুতায়িত করা এবং গ্যাসভিত্তিক শিল্প স্থাপন করা সম্ভব হয়। এ ক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগকে আমরা স্বাগত জানাই। কিন্তু বিদেশী কোম্পানিগুলোর বাড়াবাড়িতে আমাদের মনে প্রশ্ন উঠেছে- Multinational কোম্পানিগুলো কি engine of growth in developing countries- নাকি এই কোম্পানিগুলো শুধু উন্নত দেশগুলো কর্তৃক তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে শোষণের হাতিয়ার। আমরা অত্যন্ত খুশি, বাংলাদেশের দু'নেত্রী শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া মাত্র একটি বিষয়েই একমত, বাংলাদেশের গ্যাস তারা

www.pathagar.com

রফতানি করবেন না। অতি সামান্য মনে হলেও গ্যাস নিয়ে এই দু'নেত্রীর মতৈক্য আমাদের মনে বাংলাদেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশার জোয়ার আনে। বাংলাদেশ কি সত্যিই নিজেকে বৈদেশিক চাপ থেকে রক্ষা করতে পারবে। Dependency তত্ত্বই যদি সত্যি হয়, তাহলে গ্লোবালাইজেশনের effect উন্নয়নশীল দেশগুলোর ওপর কতটা সহায়ক হয় তাতে সন্দেহ জাগে। তবে বাংলাদেশে গ্যাস বিতর্ক কিভাবে শেষ হয়, তাতেই হয় তো এ প্রশ্নের একটা উত্তর পাওয়া যাবে।

সহ লেখক : মিজানুর রহমান খান
নিবন্ধ দৈনিক যুগান্তর ৩ ফেব্রুয়ারি, ২০০০

www.pathagar.com

৩৬ বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক : কিছু ভাবনা

বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্কে স্থিতিবস্থা বিরাজ করছে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের শাসনামলে দুদেশের মন্ত্রী ও কর্মকর্তাদের আসা-যাওয়ার মধ্য দিয়ে 'সফর কূটনীতির' যেটুকু চোখে পড়ত এখন সেটুকুও যেন নিঃশেষিত। জেনারেল পারভেজ মোশাররফের নেতৃত্বে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারকে উৎখাতের পর বাংলাদেশ সঙ্গতভাবেই উষ্মা উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। জেনারেল পারভেজ ক্ষমতায় আসার পর ঢাকা-ইসলামাবাদ সম্পর্ক শীতল থেকে আচমকা বরফ কঠিন হয়ে পড়ে। সার্ক শীর্ষ সম্মেলনও অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত হয়ে আছে। সামরিক শাসনের কারণে কমনওয়েলথ থেকে বহিষ্কৃত পাকিস্তানকে সার্ক কাঠামোতেও 'একঘরে' করে রাখার ভারতীয় কূটনীতি সাফল্যের মুখ দেখেছে। প্রস্তাবিত সার্ক শীর্ষ সম্মেলন স্থগিত হয়ে যাওয়ার ফলে আপাতত সার্কের সার্বিক কার্যক্রমের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। সাপটা থেকে সাফটায় উত্তরণের পথও ক্রমেই দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। গত বছরের মাঝামাঝি পোখরানে ও চাগাইতে দুই চির প্রতিদ্বন্দ্বী দেশের পাল্টাপাল্টি পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের পর থেকে কার্যত দক্ষিণ এশিয়ায় অবাধ বাণিজ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রক্রিয়া পাকাপাকিভাবে শিকেয় উঠেছে। পেশাদার কূটনীতিকরা এখন নিশ্চিত করছেন যে, সার্কের ভেতরের রুটিন কার্যক্রমেও ভাটা পড়েছে। এই অবস্থাটা বাংলাদেশের জন্য অনুকূল নয়। সামরিক শাসন বা অন্য কোনো বিবেচনায় হোক, থেমে থেমে এই সত্যটি বড় হয়ে ওঠে যে, কোনো কারণে যদি এ অঞ্চলে পাকিস্তান নির্জীব ও শক্তিহীন হয়ে পড়ে তবে তার ষোল আনা লাভ ভারতের দিকেই যায়। পোখরানে বোমা বিস্ফোরণের জবাবে পাকিস্তান চাগাইতে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দাবি করে যে, এর মাধ্যমে তারা দক্ষিণ এশিয়ায় 'শক্তির ভারসাম্য' প্রতিষ্ঠা করেছে। পশ্চিমী বিশেষজ্ঞরা এই দাবিকে উড়িয়ে দেননি বা সার্ক পরিবারের অন্য সদস্যরাও সেকথার প্রতিবাদ জানায়নি। এটা হয়ত অনস্বীকার্য যে, একাত্তরে পাকিস্তানের দখলদার বাহিনীর নৃশংস হত্যাযজ্ঞ ও নির্যাতনের বিভীষিকা আমরা আমাদের স্মৃতি ও মন থেকে ক্ষণকালের জন্যও আড়াল করে ভূ-রাজনৈতিক দিক থেকে পাকিস্তানের আদৌ কি গুরুত্ব আছে তা তলিয়ে দেখতে চাই না। কিন্তু তিন দিক থেকে বৃহৎ রাষ্ট্র ভারত ও কিয়দংশ সামরিক জান্তা শাসিত

www.pathagar.com

মায়ানমার বেষ্টিত বাংলাদেশ সত্যিই তার ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান উপেক্ষা করে চলতে পারে না। একাত্তরের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের ভূমিকার জন্য আমাদের অকৃতজ্ঞ হওয়ার কোনো দরকার নেই। তাদের প্রতি যথোচিত কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থেকেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত ওআইসি শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। মুজিবের এই সফর আজও বাংলাদেশের স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক বলেই গণ্য হয়।

ভারতের প্রাজ্ঞ নীতি নির্ধারকরা অবশ্য মুক্তিযুদ্ধের ক্ষত শুকাতে না শুকাতেই মুজিবের এমনতর পাকিস্তান নীতিতে বিস্মিত হননি। স্বাধীনতার পরপরই তৎকালীন কংগ্রেসের ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঢাকা সফরে এসেছিলেন ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি শঙ্কর দয়াল শর্মা। বাংলাদেশে ভারতের প্রথম কূটনৈতিক মিশন প্রধান জে এন দীক্ষিত 'আউটলুক' পত্রিকায় লেখা এক নিবন্ধে এই তথ্য প্রকাশ করেন যে, শঙ্কর দয়াল শর্মা ঢাকায় সেদিন তাকে বলেছিলেন যে, বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের ভবিষ্যৎ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক উন্নয়নের যে কোনো বিবেচনায় এটা মনে রাখতে হবে যে, মুজিব পাকিস্তান আন্দোলনের একজন নেতা ছিলেন এবং তিনি নিজেকে একজন মুসলিম নেতা হিসেবেই মনে করতেন। এর পরে দীক্ষিতের সাম্প্রতিক গ্রন্থ 'লিবারেশন অ্যান্ড বিয়ন্ড' বইতেও আমরা লক্ষ্য করি তিনি মুজিবকে একই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মূল্যায়ন করেছেন। তার ভাষায়, অনেকেরই জানা নেই যে, উপমহাদেশের অন্যতম বৃহৎ মুসলিম দেশের প্রধান হতে মুজিবের 'ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা' ছিল। তিনি মনেপ্রাণে ওআইসির সদস্য হতে চেয়েছিলেন। ১৯৭৩ সালের বহু জনসভায় বিদেশনীতি নির্ধারণী বক্তৃতায় তিনি বলেছেন, অভিন্ন ভাষা এবং সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ও বঙ্গোপসাগর সন্নিহিত রাষ্ট্র বাংলাদেশের স্ট্র্যাটেজিক অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এদেশ একদিকে উপমহাদেশ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে সেতুবন্ধ রচনা করেছে। অন্যদিকে, পশ্চিম এশিয়ার মুসলিম দেশ ও উপসাগর এবং ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার মতো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইসলামী দেশগুলোর মধ্যে সেতুবন্ধ স্থাপনেও সে সম্ভাবনাময়। দীক্ষিত দাবি করেছেন, মুজিবের এই সুনির্দিষ্ট আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন ভুট্টো। ৭৪ সালের এপ্রিলে লাহোরে অনুষ্ঠেয় ওআইসি শীর্ষ সম্মেলনকে সামনে রেখে এবং বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার বিনিময়ে মুজিবের কাছ থেকে ভুট্টো আত্মসমর্পণকারী ৯৩,০০০ পাকিস্তানি সৈন্যের নিঃশর্ত প্রত্যাবাসন, ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীর বিচার না করা এবং পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ঘোষণা আদায় করেছিলেন। অবশ্য মি. দীক্ষিত যেভাবে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না করার দায় পুরোপুরি মুজিবের কাঁধে চাপিয়েছেন তা ওই সময়ের সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশী কূটনীতিকরা মানতে রাজি নন। জানা যায়, ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশের তৎকালীন পররাষ্ট্র সচিব এনায়েত

www.pathagar.com

করিমের দিল্লি সফরের সময় ইন্দিরা গান্ধীর মুখ্য সচিব পিএন হাকসার বলেছিলেন, একটি পেশাদার আর্মি আরেকটি পেশাদার আর্মির বিচার চাইতে পারে না- এই যুক্তিতে ভারতের সশস্ত্র বাহিনী পাকিস্তানি আর্মির বিচার চায় না।

যা হোক, আমরা লক্ষ্য করি যে, ঢাকা-ইসলামাবাদ সম্পর্কের গত ২৯ বছর নানা চড়াই-উৎরাইয়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয়েছে। বেনজির ভুট্টো একবার খাজা খয়েরউদ্দিনকে ঢাকায় এক গোপন মিশনে পাঠিয়েছিলেন। খয়েরউদ্দিনের বর্ণনা অনুযায়ী, ওই মিশনের উদ্দেশ্য ছিল পিণ্ডির প্রতি বাংলাদেশের জনগণের মনোভাব যাচাই। কিন্তু তিনি যেসব সুপারিশ পেশ করেছিলেন বেনজির সরকার তা বাস্তবায়ন করেন নি। দু'দেশের সম্পর্ক কখনই আসলে সমান্তরালভাবে বেশিদূর এগুতে পারেনি। সম্পদ বণ্টন ও আটকেপড়া পাকিস্তানিদের প্রত্যাবাসন ইস্যু দৃশ্যত দু'দেশের সম্পর্ক উন্নয়নের বাধা হিসেবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। বাংলাদেশ পাকিস্তানের কাছে সোনা ও বৈদেশিক মুদ্রার অংশ হিসেবে ১ কোটি ১০ লাখ মার্কিন ডলার ও অন্যান্য সম্পদের হিস্যা বাবদ বাংলাদেশ সর্বমোট ৪ হাজার মিলিয়ন মার্কিন ডলার দাবি করেছিল। দু'দেশের আনুষ্ঠানিক দ্বিপক্ষীয় আলোচনায় এ ইস্যুটি সবসময় ওঠে। ১৯৭৪ সালে ঢাকায় মুজিব-ভুট্টো আলোচনার পর বিষয়টি খতিয়ে দেখতে পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ে কমিটিও গঠিত হয়। কিন্তু সেই কমিটি কখনও বৈঠকে বসেছে বলে জানা যায় না। এ বিষয়টি সবচেয়ে উপেক্ষিত হয় জেনারেল এরশাদের সময়। যদিও সামরিক জান্তা জিয়াউল হকের সঙ্গে এরশাদের দহরম মহরম তুঙ্গে ছিল। আনিসুল ইসলাম মাহমুদ পররাষ্ট্রমন্ত্রী থাকাকালে ঢাকায় এসেছিলেন তৎকালীন পাকিস্তানি পররাষ্ট্রমন্ত্রী। এই দলের সঙ্গে আসা পাক পররাষ্ট্র দফতরের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ভুলক্রমে তার কাগজপত্র ফেলে যান। কৌতূহলী দু-একজন কর্মকর্তা লক্ষ্য করেন যে, পাক পররাষ্ট্রমন্ত্রীর জন্য তৈরি ব্রিফিং-এ লেখা আছে, সম্পদ বণ্টনের বিষয়টি বাংলাদেশ তুলতে পারে বটে তবে তারা এ ব্যাপারে খুব বেশি সিরিয়াস নয়। আসলে বাস্তবে এ বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে ঢাকা কখনও যথেষ্ট উদগ্রীব হয়েছে বলেও প্রমাণ পাওয়া যায় না। আমাদের মনে হয় এদেশে পাকিস্তানি বিনিয়োগ আকর্ষনের পথে এই ইস্যুটি একটি বিরাট বাধা। এর নিষ্পত্তি না ঘটানো হলে বাংলাদেশে বড় বিনিয়োগে পাকিস্তানিরা আগ্রহী হলেও শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে যাবে। এখানে বাংলাদশেরও একটা 'স্টেক' আছে। এককালের দোর্দণ্ড প্রতাপশালী আদমজী ও বাওয়ানীর মতো কলকারখানা যদি যাদের জিনিস তাদের হাতে

www.pathagar.com

ফিরিয়ে দেওয়া হয় তবে তারা ভালোভাবে চালাতে পারবে বলে ধরে নেওয়ার সঙ্গত কারণ আছে। তবে সবার আগে একাত্তরের ঘটনাবলীর জন্য বাংলাদেশের কাছে ক্ষমা প্রার্থনার যে দাবি পাকিস্তানের সুশীল সমাজ থেকে ধীরে ধীরে জোরালো হচ্ছে তা বিবেচনায় নিতে হবে পাকিস্তানকেই।

ভারতের প্রতি বাংলাদেশ কতখানি ঝুকে পড়েছে সেই নিয়ে হিসেব-নিকেষের আগে ইসলামাবাদের নিজের গরজেই উচিত বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া। এটা লক্ষণীয় যে, বাংলাদেশ স্থায়ীভাবে কাশ্মির প্রশ্নে একটা নিরপেক্ষ অবস্থান বজায় রেখে আসছে। ঢাকার মাঠের ক্রিকেট খেলায় পাকিস্তানের প্রতি বাংলাদেশের জনগণের ব্যাপক সমর্থন দেখে অভিভূত সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ যখন দেশে ফিরে একাত্তরের ট্র্যাজেডির জন্য অভিযুক্তদের বিচারের অঙ্গীকার করেন তখন আমরা বাংলাদেশের জনগণকে উৎফুল্ল হতে দেখি। কিন্তু তবুও পাকিস্তান ক্ষমা প্রার্থনা করা থেকে বিরত থাকে। ভুট্টো ১৯৭৪ সালের ২৮ জুন ঢাকায় বলেন, 'একাত্তরের নির্লজ্জ নির্যাতন এবং অবর্ণনীয় বিভীষিকার জন্যে পাকিস্তানের জনগণ অনুতপ্ত। পাকিস্তানের জনগণ ভুল স্বীকার করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে। ক্ষমতালোভী একনায়ক ও পাপীদের জন্যে আমাদের দায়ী করবেন না। তওবার সময় অতিক্রান্ত হয়নি।' তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন '৭৪ সালের ১১ এপ্রিল বলেন, '.... ক্ষমা চাওয়া হয়েছে। ক্ষমা দেওয়া হয়েছে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী সমগ্র বাঙালি জাতির কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। আমরা সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলাম, প্রতিহিংসা নয়।' আবার মুজিব '৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে কুলদীপ নায়ারকে বলেছেন, 'আমি ভুট্টোর আন্তরিকতায় অভিভূত হয়েছি। পাকিস্তানের জনগণের ভালোবাসা ও মমত্ববোধ দেখে মুগ্ধ হয়েছি। আমার পরিচিত পোশাক দেখে পাকিস্তানি বালক-বালিকাগণ তুমুল হর্ষধ্বনি করে ওঠে।'

কোনো সন্দেহ নেই, এই কথোপকথনের ধারাবাহিকতা রক্ষা হয় নি। বর্তমান সরকারের আমলেই প্রয়াত পররাষ্ট্র সচিব মোস্তাফিজুর রহমান পাকিস্তানকে একাত্তরের জন্য ক্ষমা চাইতে বলেছিলেন। কিন্তু পাকিস্তান ক্ষমা প্রার্থনা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। যেন ভুট্টোর উক্তি পাকিস্তান আজ ভুলে গেছে। বেনজিরকেও আমরা তাই করতে দেখি। তিনি তার এক নির্বাচনী ইশতেহারে এই বলে ব্যাঙ্গ করেন যে, মুজিব ঢাকার রাজপথ সোনায় মোড়ানোর কথা বলেছিলেন কিন্তু তার জনগণ আজ ফুটপাতে

www.pathagar.com

ঘুমায়। ১৯৯৭ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখন পাকিস্তান সফর করেন তখন অবশ্য প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বেনজিরই তাকে আন্তরিক স্বাগত জানান।

আসলে নওয়াজ শরিফ একাত্তরের ঘাতকদের বিচারের কথা তুলে যে রাষ্ট্রনায়কোচিত প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছিলেন পাকিস্তান আর্মির তা পছন্দ হয়নি। পাকিস্তানে যতদিন সত্যিকারের গণতন্ত্র না আসবে ততদিন একাত্তরের জেনারেলদের বিচারের কথা হয়ত পরিহাসের মতোই শোনাবে। তবে বাংলাদেশকেও বিবেচনায় রাখতে হবে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী পামার স্টোনের সেই বিখ্যাত উক্তি : *"It is a narrow policy to suppose that this country or that is to be marked out as the eternal ally or the perpetual enemies. Our interests are eternal and perpetual, and these interests it is our duty to follow."*

সহলেখক : মিজানুর রহমান খান
নিবন্ধ দৈনিক যুগান্তর ৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০০

www.pathagar.com

৩৭ স্মৃতিসৌধে না গিয়ে ক্লিনটন কোনো ভুল করেন নি

প্রশ্ন ॥ প্রায় চার বছর হলো শেখ হাসিনার সরকার রাষ্ট্র পরিচালনা করছে। এর মধ্যে রাজনীতিতে নানাবিধ ঘটনা ঘটেছে। মূল বিরোধী দল সংসদে নেই। এ রকম পরিস্থিতিতে আপনার মূল্যায়ন কি?

উত্তর ॥ সব মিলিয়ে আমি বলবো খারাপ না, মোটামুটি ভালো। এখন পর্যন্ত, গণতান্ত্রিক সরকার টিকে আছে। একবারে ব্রেকডাউন হয়নি। হ্যাঁ, অনেক সমস্যা হয়েছে। শেখ হাসিনার নেওয়া কিছু কিছু সিদ্ধান্ত তো রীতিমতো জাতিকে বিভক্ত করেছে। এখানে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি এবং গঙ্গা চুক্তির কথা আমি বলবো। এগুলো সাহসী সিদ্ধান্ত। কিন্তু অনেকেই মনে করেন এসব জাতিকে কার্যত বিভক্ত করেছে। বেগম জিয়া ও তার অনুসারীরা সংসদে নেই সত্য, কিন্তু আমার মতে খালেদা জিয়ার কার্যকলাপ অবশ্য-অবশ্যই শেখ হাসিনার চেয়ে অনেক অনেক ভালো। তবে মূল্যায়ন প্রশ্নে বলবো, ভূল-ত্রুটি সব মিলিয়েও আমরা নির্বাচিত সরকারের অধীনে আছি। এখানে অন্যরা হস্তক্ষেপ করার সুযোগ পাননি। অর্থাৎ বেসামরিক ব্যক্তিরাই দেশ চালাচ্ছেন। এটি আমাদের জন্যে এক ধরনের বড় বা তাৎপর্যপূর্ণ অর্জন।

প্র ॥ আপনি বললেন বিরোধীদলীয় নেত্রী খালেদা জিয়ার ভূমিকা শেখ হাসিনার চেয়ে ভালো- আপনার এই মন্তব্যের যৌক্তিকতা জানতে চাচ্ছি।

উ ॥ তুলনামূলকভাবে ভালো বলছি এই কারণে খালেদা জিয়া যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখন একটা তুচ্ছ কারণে শেখ হাসিনা সংসদ বয়কট ও পরে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু খালেদা জিয়া সংসদ বয়কট করলেও পদত্যাগ করেন নি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে ভাষায়, যেভাবে কথা বলেছেন বা বলেন তা তো একদমই ঠিক নয়। আমি বলবো তাঁর জিহ্বাটা সংযত হওয়া উচিত। তাঁর প্রতি আমি পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেই একথা বলছি। এসব বিবেচনায় খালেদা জিয়া যথেষ্ট সংযত, কথাবার্তায় তিনি যথেষ্ট সতর্ক ও চিন্তাশীল।

প্র ॥ ঠিক আছে, কিন্তু খালেদা জিয়া যে কারণ দেখিয়ে সংসদ বয়কট করেছেন সেটাকে কি আপনি যৌক্তিক মনে করেন?

উ ॥ অবশ্যই যৌক্তিক মনে করি। যৌক্তিক মনে না করার কোনো কারণ নেই এবং

www.pathagar.com

এর জন্য আমি এককভাবে দায়ী করবো মাননীয় স্পিকারকে। স্পিকার তো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাইরে কোনো সিদ্ধান্তই দিতে পারেন না। সবসময় শেখ হাসিনার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকেন এবং তার ইশারা মতো কাজ করেন। আমি তো বলবো গত বছরে যদি কোনো ব্যক্তি তার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে ফেল করে থাকেন তো তিনি হলেন মাননীয় স্পিকার। সংসদে স্পিকারের যে ভূমিকা থাকার কথা ছিল তা তিনি মোটেও রাখতে পারেন নি। তিনি যা রেখেছেন তা সরকারি মুখপাত্রের ভূমিকা বৈ অন্যকিছু নয়। খুব সম্ভবত আগামী দিনের কোনো প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যেই তিনি এমনতরো ভূমিকায় অবতীর্ণ। হয়তো বা তার আরো অনেক ধরনের আশা আছে। সে যা হোক স্পিকার উদ্যোগ নিলে, স্পিকার নিরপেক্ষ ভূমিকায় থাকলে অনেক সমস্যার যেমন সমাধান হতো তেমনি তাঁর ভূমিকারও সবাই প্রশংসা করতো।

প্র ॥ কিন্তু এওতো সত্য, যে সব ইস্যুকে কেন্দ্র করে এবং যে প্রক্রিয়ায় খালেদা জিয়া সংসদ বয়কট করেছেন তা নিয়ে খোদ বিএনপিতেও মতবিরোধ রয়েছে।

উ ॥ এ মতপার্থক্য পার্টি অভ্যন্তরে থাকতেই হবে। আমি নিজেও চাই খালেদা জিয়া সংসদে থাকুক। তিনি এবং তার দলের লোকজন সংসদে দাঁড়িয়ে মানুষের কথা বলুক। কিন্তু সংসদে দাঁড়িয়ে ক্ষমতাসীন দলের প্রধান ব্যক্তি যে ভাষায় কথা বলেন এবং অন্যরাও যে ভাষা ব্যবহার করেন তাতে করে আমি নিজেও বিরোধীদলীয় নেতা হলে সংসদে যেতাম না।

খালেদা যা করেছেন
হাসিনাও তা করছেন

প্র ॥ খালেদার শাসনামলে শেখ হাসিনা যেভাবে সংসদ বয়কট করেন ঠিক সেই একই ফর্মুলায় হাসিনার আমলে খালেদা সংসদ বয়কট করছেন। আপনার পর্যবেক্ষণ কি?

উ ॥ সহজ ভাষায় বলবো এটি আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিরই প্রতিচ্ছবি। দু'দলেই রাজনৈতিক সংস্কৃতি-কালচার তো আসলে একই রকম। রেহমান সোবহান সাহেব ক'দিন আগে যে মন্তব্য করেছেন এটাই আমাদের বলতে হচ্ছে। ওনার ভাষায়- দিজ গভর্নমেন্ট ইজ দি মিরর ইমেজ অব খালেদা গভর্নমেন্ট। খালেদা যা করেছেন, হাসিনাও তাই করেছেন। তারপরেও বলবো- খালেদা ওয়াজ এ লিটল বেটার।

প্র ॥ কিন্তু এই যে অনুশীলন এতে করে কি আমরা আমাদের রাজনৈতিক মান ক্রমেই হারিয়ে ফেলছি না।

উ ॥ না হারাচ্ছি না। খালেদা জিয়া যা করেছেন সেটা তো প্রতিবাদ। তিনি চেয়েছেন এই প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে যেনো স্পিকার নিজেকে শুদ্ধ করেন, ক্ষমতাসীন দল যেনো নিজেদের শুদ্ধ করেন। আর খালেদা জিয়া তো এখন মাঠে আছেন। তিনি গণসংযোগের মধ্য দিয়ে জনগণকে সংগঠিত করছেন। আমি তো মনে করি, দিস ইজ অলসো পলিটিক্যাল এডুকেশন। দেয়ার এডুকেটিং দ্য পিপল। তবে এখানে সরকারকে একটু ধন্যবাদ দিতে হবে যে, তারা এখনো পাবলিক মিটিংগুলো করতে দিচ্ছে, পাবলিক মিটিং

www.pathagar.com

ভেঙে দিচ্ছে না। খালেদার মিটিং-এ এখন পর্যন্ত কোনো আক্রমণ হয় নি। কিন্তু ইচ্ছে করলে তো সরকার তা পারে। তবে মিছিল বের করলে আওয়ামী লীগ যে উল্টো মিছিল করে সেটা সমীচীন নয়। গণতান্ত্রিক রীতি-নীতির মধ্যে এগুলো পড়ে না।

প্র ॥ এই সরকারের আমলে আপনি আইনের শাসনকে কোন দৃষ্টিতে দেখছেন?

উ ॥ আইনের শাসনটা এ সরকারের আমলে অনেকটা ক্ষুণ্ন হয়েছে। জননিরাপত্তা আইন নামে যা করা হয়েছে তা তো আইনের শাসনের বিরুদ্ধে। এই আইন কোনোভাবেই থাকা উচিত নয়। যে দেশে বিশেষ আইন রয়েছে সেখানে আবার নতুন করে জননিরাপত্তা আইনের দরকারটা কি? বিশেষ আইনও তো কালো আইন। ওই আইনটি তুলে দিলেও আমি ব্যক্তিগতভাবে দারুণ খুশি হতাম। বিরোধী দলগুলোর নেতা-কর্মীদেরকে হয়রানি করতেই যে এ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। আসলে এই আইনের কোনো প্রয়োজনই ছিল না। এই যে আজ আমি ইন্টারভিউ দিচ্ছি, এমনও হতে পারে এই কারণে কাল আমাকে গ্রেফতার করা হবে।

প্র ॥ পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি?

উ ॥ পার্বত্য শান্তিচুক্তির ব্যাপারে তো খোদ সন্তু লারমাই বলছেন ইমপ্লিমেন্টেড হচ্ছে না। আসলেই ইমপ্লিমেন্ট হলে তো আর পার্বত্য চট্টগ্রাম আমাদের থাকে না।

প্র ॥ কিন্তু আমরা তো একটা বিষয় দেখলাম, আগে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় যে রক্তপাত হতো তা এখন বন্ধ- এটা কি হাসিনা সরকারের বিরাট সাফল্য নয়?

উ ॥ হ্যাঁ, মূল ঘটনার নেপথ্যে তো ভারত থাকতো। তারাই অস্ত্র দিত, উসকে দিত। এখন তারা অস্ত্র দিচ্ছে না। আমার তো ধারণা হাসিনা সরকার যতোদিন আছে ততোদিন ওরা অস্ত্রশস্ত্র আর দেবে না। তবে সরকার কখনো পরিবর্তন হলে ভারত কি করে সেটা দেখার বিষয়।

প্র ॥ তাহলে কি আপনি মনে করছেন আগামীতে কোনো নতুন সরকার এলে পার্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থা সেই আগের মতোই হবে?

উ ॥ হ্যাঁ, এটা তো আমি সব সময়ই মনে করি। এ বিষয়টি নিয়ে আমরা আতঙ্কিত। আমি ব্যক্তিগতভাবেও ভীষণ সংশয়ের মধ্যে আছি।

প্র ॥ আমাদের রাজনীতির একটি দৃষ্টিকটু বিষয় হলো দলবদল। আগামী নির্বাচনের সময় হয়তো এই সংস্কৃতির প্রাবল্য আরো বেশি চোখে পড়বে- আপনার মন্তব্য কি?

উ ॥ এ প্রসঙ্গে আমি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দুটো তত্ত্বের কথা বলবো। একটা হলো বার্কের তত্ত্ব। আমি যখন নির্বাচিত হলাম তখন আমি আমার বিবেকের কাছে দায়ী। কোনো রাজনৈতিক দলের কাছে দায়ী নই। আমি আমার জ্ঞান বুদ্ধি অনুযায়ী আমার কাজ করবো। আরেকটি তত্ত্ব হলো- তুমি অবশ্যই পার্টির সীমারেখার মধ্যে থাকবে। এই জন্যেই তো আর্টিকল-৭০ করা হয়েছিল। শেখ মুজিবুর রহমান নিজেই এটা করেছিলেন। সেই আর্টিকল এখনো আছে তবে তা এখন আরো শক্তপোক্ত। অর্থাৎ পার্টির বিরুদ্ধে বলা যাবে না, পার্টি ত্যাগ করলে পদও চলে যাবে। এর প্রধান কারণ ছিল ১৯৫৪ সালে আওয়ামী লীগ এবং কৃষক শ্রমিক পার্টি যে যুক্তফ্রন্ট করেছিল তা ভেঙে

www.pathagar.com

যায় এবং এতে করে ফ্লোর ক্রসিং হতে থাকে। শেখ মুজিবুর রহমান সেই ধারা বন্ধ করার জন্যই এটি করেছিলেন। কিন্তু আমার দুঃখটা হলো- শেখ হাসিনা নিজ হাতে সেই আইনটা ভঙ্গ করেছেন। দেখুন, হাসিবুর রহমান স্বপন ও আলাউদ্দিনকে কি প্রক্রিয়ায় তারা আওয়ামী লীগে নেয়। আমি তো মনে করি এটি সংবিধান বহির্ভূত কাজ এবং সংবিধানের বিরুদ্ধে কাজ। এতে করে সংবিধানের স্পিরিটও নষ্ট করা হয়েছে। এই বিষয়টি তো পাকিস্তান ও ভারতের সংবিধানেও রয়েছে। ভারতের সংবিধানে অবশ্য একটু অন্যভাবে আছে। ভারতে বিষয়টি এরকম যে, তুমি একা যেতে পারবে না, তবে একাধিক অনুসারী নিয়ে যেতে পারবে। আসলে আর্টিকেল-৭০ তো করা হয়েছে রাজনীতির স্থায়িত্ব বাড়ানোর জন্যে। আবারো বলতে বাধ্য হচ্ছি শেখ হাসিনা এটি ইচ্ছে করেই ভায়োলেট করছেন। তিনি মন্ত্রিত্বের লোভ দেখিয়ে তার দলে বিরোধী দলের দু'জন এমপিকে জায়গা দেন এবং আর্টিকল ৭০-এর স্পিরিটটা ধ্বংস করেন। বার্কের সেই তত্ত্ব তো এখন অকার্যকর যে আমার যা খুশি তাই করবো। বাংলাদেশের মতো দেশে তো আর সেটি সম্ভব নয়। বার্কের তত্ত্ব তো আসলে ডেভেলপড্ কান্ট্রির জন্য, ডেভেলপিং কান্ট্রির জন্য নয়। আমাদের এখানে তো নানারকম সমস্যা। আমরা গরিব দেশ। এরপর যারা ক্ষমতায় যায় তাদের প্রলোভন থাকে। সুতরাং আর্টিকল-৭০ এর প্রয়োগ থাকা উচিত এবং ওই স্পিরিটটা কোনো মতেই নষ্ট করা ঠিক হবে না। অবশ্য এটাও সত্য, আমাদের দুই প্রধান দলের অনেক পার্লামেন্ট মেম্বরই আবার এ বিষয়টি পছন্দ করেন না।

প্র ॥ বর্তমান সরকারের পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে আপনার পর্যবেক্ষণ কি?

উ ॥ আমি অবশ্য কখনই বলি না যে, এই রাষ্ট্র ভারতের তাবেদার। তবে এই রাষ্ট্র যে পলিসি বর্তমানে অনুসরণ করছে তাতে করে ভারতই বেশি করে লাভবান হচ্ছে। কিন্তু হাসিনা সরকারের যে পররাষ্ট্রনীতি তা তিনি ইচ্ছে করে না অনিচ্ছায় অনুসরণ করছেন তা বলতে পারবো না। আবারও বলছি সব কিছুতেই লাভবান হচ্ছে ভারত, বাংলাদেশ নয়। যদি পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির কথাই বলি তাহলে সেই কথাই বলতে হয় এটি করা হয়েছে ভারতের চাপে। এটা আমরা শুনেছি। চুক্তিটা ড্রাফটেডও হয়েছে ভারতে। সম্প্রতি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাসিম সাহেব যে মন্তব্য করেছেন, তাতে তিনি বলেছেন, সন্তু লারমাকে ভারত বাধ্য করেছে। এটিই যদি সত্যি হয়, তাহলে তার অর্থ দাঁড়ালো, ভারত আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ন্ত্রণ করছে। এটি তো অবশ্য অবশ্যই আমাদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের বিপক্ষে।

প্র ॥ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের সফরকে আওয়ামী লীগ বিরাট সাফল্য বলে চিহ্নিত করেছে- আপনি কি মনে করছেন?

উ ॥ আমি তো মনে করি গ্রামীণ ব্যাংকের মুহাম্মদ ইউনূসের কারণে বাংলাদেশের প্রতি ক্লিনটনের একটা সফটকর্নার রয়েছে। ইউনুসের গ্রামীণ ব্যাংককে ক্লিনটন পছন্দ করেন। যদিও গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রম আমার পছন্দ নয়। ক্লিনটন যখন গভর্নর ছিলেন তখন আরিজোনাতে এরকম একটা প্রজেক্ট করেছিলেন। দুঃস্থদের মাঝে ঋণ

www.pathagar.com

দিয়েছিলেন। ইউনূসের কাজ কর্ম দেখার জন্যই তিনি এসেছিলেন। সুতরাং ক্লিনটনের সফরকে বর্তমান সরকারের সাফল্য বলে প্রচারের কোনো মানে হয় না। আমি তো বলবো শেখ হাসিনার নয়, এটি ক্লিনটনের সাফল্য। কেননা তাঁর মতো একজন ব্যস্ত মানুষ হাজারো ব্যস্ততার মাঝেও বাংলাদেশে এসেছেন।

প্র ॥ কিন্তু তিনি তো স্মৃতিসৌধে গেলেন না?

আসলে স্মৃতিসৌধে যাওয়াটা তো ডেভেলপিং কান্ট্রির নিয়ম। আমেরিকায় গিয়ে কি কেউ স্মৃতিসৌধে যায়? বড়জোর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যারা নিহত হয়েছে তাদের স্মৃতিসৌধে যায়। জাতীয় স্মৃতিসৌধে যাওয়া, গান্ধী ঘাটে যাওয়া আমাদের এখানকার নিয়ম। আমেরিকায় কেউ গেলে কি কেনেডির কবরে যায়? আব্রাহাম লিংকনের কবরে যায়? আমার মতে, তিনি কোনো ভুল করেননি ওয়েস্টার্ন প্রটোকল অনুযায়ী। আর জাতীয় স্মৃতিসৌধকে ঘিরে আমাদের যে আবেগ-অনুভূতি জড়িত ক্লিনটনের তা নেই তো।

প্র ॥ কিন্তু বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় তো ক্লিনটনের স্মৃতিসৌধে না যাওয়ার বিষয়টির সমালোচনা করেছেন।

উ ॥ আমেরিকান প্রটোকল অনুযায়ী ক্লিনটন কোনো ভুল করেননি। এই তো ক'দিন পর তিনি রাশিয়া যাচ্ছেন। আমার তো মনে হয় না রাশিয়ার কোনো স্মৃতিসৌধে তিনি যাবেন। আমরা আমাদের পক্ষ থেকে ক্লিনটনের ভুল ধরতে পারি তার সমালোচনা করতে পারি, কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল প্রটোকল অনুযায়ী হি ইজ রাইট।

প্র ॥ একটু পুরনো বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। গত বছরের আগে সোফা চুক্তি নিয়ে যখন কম-বেশি সবাইকে সোচ্চার হতে দেখা গেলো তখন আপনি এই চুক্তির পক্ষে মত প্রকাশ করেন কারণটা কি?

উ ॥ প্রধানতম কারণ ছিল ভারত। আমি তখন জাপান থেকে ফিরে এলাম। প্রসঙ্গটা এ কারণেই বলছি যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু তারপরেও জাপানকে যে নিউক্লিয়ার আমব্রেলা দিয়েছে আমেরিকা তাতে করে তাদের ওপর রাশিয়া, চায়না কেউ আর আক্রমণ করতে সাহস পায় নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সেই ধ্বংসস্তূপ থেকে সুপার পাওয়ারে পরিণত হয়েছে জাপান। ভারতের বিপক্ষে আমাদের যদি ওই রকম কোনো আমব্রেলা থাকে তাহলে কি জাপানের মতো হতে পারবো না? শুধু আমেরিকা বলে কথা না, যদি ওরকম আমব্রেলা আমাদেরকে চায়নাও দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় তাহলে অবশ্যই আমি তা স্বাগত জানাবো। আমি বলতে চাচ্ছি, এটা আমাদের প্রয়োজন। আমরা ভারতকে বিশ্বাস করি না। আমরা ভয় পাই। ভারত তো যে কোনো সময় আমাদেরকে দখল করে নিতে পারে। তখন কে আমাদের সাহায্য করবে? আমাদের তো কুয়েতের মতো আর তেল নেই। আমেরিকা তো আর কুয়েতের জন্য নয়, আসে তেলের জন্যে। আসলে আমাদের প্রকৃত বন্ধু দরকার, যারা আমাদেরকে সাহায্য করবে, রক্ষা করবে। ওই যে দেখুন ট্রানজিট করিডরের বিষয়টি। ভারত আমাদের ভূখণ্ড ব্যবহার করবে এটা কি করে হয়?

www.pathagar.com

প্র ॥ কিন্তু সরকারের ভাষ্য মতে, ট্রানজিট দিলে আমরাই লাভবান হবো।

উ ॥ না, না, এটা তো রীতিমতো রাষ্ট্রবিরোধী কাজ। এখানে কোনো লাভ নেই। দু'পয়সা টোলের জন্য তো আর স্বাধীনতা বিকিয়ে দিতে পারি না।

প্র ॥ ভারত কি আমাদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের হুমকি স্বরূপ?

উ ॥ তা তো অবশ্যই। তারা তো অনেক কিছু আমাদের ওপর রীতিমতো চাপিয়ে দিচ্ছে। গঙ্গা চুক্তি, পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি-এতো সব চাপিয়ে দেওয়া চুক্তি। আমি হলে আমার নিরাপত্তার জন্য আমেরিকা, চীনের সঙ্গে চুক্তি করতাম। এ জন্যই সোফাকে সমর্থন জানিয়েছিলাম। আর এ জন্যই কেউ কেউ আমাকে সিআইএর দালাল বলেছিল। এও বলেছিল আমি নাকি টাকা খেয়েছি।

প্র ॥ রাজনৈতিক দল ও নেতাদের মান কি আরো উন্নত হওয়ার দরকার ছিল না?

উ ॥ হচ্ছে তো। এই যে বিএনপি এখন নির্বিবাদে মিটিং সভা করছে। শেখ হাসিনা তো আর মিটিং-সভা ভেঙে দিচ্ছে না। তবে হ্যাঁ, নেতাদের আরো সহনশীল হওয়া প্রয়োজন। অবশ্য অনেক পার্লামেন্ট সদস্যের যে জানাশোনার যোগ্যতা তাতে করে তাদের কাছ থেকে খুব বেশি ভালো কিছু আশা করা ঠিক নয়। তবে এটা ঠিক আমি মনে করি, আগামীতে খালেদা, হাসিনা যেই আসুক- তারা শাসক হিসেবে ভালো করবে। আর পার্লামেন্টে গণ্ডগোল, চিৎকার-চেঁচামেচি শুধু আমাদের দেশে নয়, সব দেশেই হয়। এইতো কয়েকমাস আগে খোদ ভারতের কি লোকসভাতেও গণ্ডগোল হয়ে গেলো।

প্র ॥ সারাদেশে এনজিওদের কার্যক্রম নিয়ে আপনার মূল্যায়ন কি?

উ ॥ এনজিও 'অ্যাজ এজেন্ট অব ডেভেলপমেন্ট' এই যে থিওরি, এই থিওরিটা আমি পছন্দ করি না। আমার ব্যক্তিগত মতামত এরা ক্রমেই পরনির্ভরশীলতা বাড়াচ্ছে। এনজিওরা যা করছে, উচিত ছিল গভর্নমেন্টেরই তা শক্তিশালীভাবে করা। আর গভর্নমেন্টের এখন গুড গভর্নেন্সটা করা প্রয়োজন। এনজিওরা গুড গভর্নেন্স -এর কথা বলছে কিন্তু তারাই তো বিশ তলা বাড়ি বানাচ্ছে। গ্রামীণ ব্যাংক চব্বিশ পারসেন্ট সুদ নেয়। এ তো সেই কাবুলিওয়ালারই প্রতিচ্ছবি।

প্র ॥ রাজনৈতিক দলগুলোর ব্যর্থতার সুযোগেই কি এনজিওরা তাদের সার্বিক তৎপরতা বাড়াতে পেরেছে?

উ ॥ হ্যাঁ। আসলে এনজিওরা যা করছে সেই শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সচেতনতা এ সব তো সরকারেরই করার কথা। এ তো সরকারেরই কাজ। কিন্তু এনজিওদের দায়বদ্ধতা কোথায়? তারা তো ডোনারদের কাছে দায়বদ্ধ। এই যে এনজিওরা কাজ করছে এতে বাংলাদেশের দরিদ্রতা কতটুকু কমছে?

আজকের কাগজ ২৪ এপ্রিল, ২০০০

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ঃ শাহিদ রহমান

www.pathagar.com

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক তালুকদার মনিরুজ্জামান তাঁর ঋজু, স্বচ্ছ ও সাহসী বক্তব্যের জন্য সুপরিচিত। বাংলাদেশ নিশ্চিতভাবেই এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। সমাজ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের কাছ থেকে এসময় দিক নির্দেশনা ও সুচিন্তিত মতামত প্রবলভাবে প্রত্যাশিত। অধ্যাপক তালুকদার মনিরুজ্জামান সময়ের সেই চাহিদা পূরণে সচেষ্ট হয়েছেন। ১৯৯২ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনীতি ও সংকট তাঁর লেখায় জীবন্ত ও মূর্ত। জাতীয় জীবনের প্রায় প্রতিটি বিতর্কিত বিষয় সম্পর্কে তাঁর দ্রোহ-সঞ্জাত দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে। বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর নিবন্ধ ও সাক্ষাৎকারের সংকলন এটি। বই আকারে প্রকাশের প্রয়োজনে ক্ষেত্র বিশেষে পুনর্বিন্যাস ও পরিমার্জন করা হয়েছে।

রাজনীতির ক্লাসে ৩৫ বছর, অব্যাহত অধ্যয়ন, গবেষণা, আর বর্ণাঢ্য অভিজ্ঞতার অন্তরঙ্গ মিশেলে সমকালকে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন নির্মোহে। এতে মৌলিকত্ব ও পাণ্ডিত্য বিস্ফুরিত হলেও তার ঘেরটোপে তাঁর রাষ্ট্রচিন্তার সাবলীল প্রকাশ বিঘ্নিত হয়নি। কবি নন বলেই কবিতা লেখেননি। কিন্তু পাঠক হয়তো নিশ্চিতই আঁচ পাবেন একজন রাজনৈতিক কবির প্রজ্ঞা, উত্তাপ আর সহজাত আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত স্ফূরণ। ভবিষ্যতে বাংলাদেশকে নিয়ে তাঁর যে স্বপ্ন, শব্দ দিয়ে তিনি তা বিনির্মাণে প্রয়াস পেয়েছেন।

তাঁর বক্তব্য ও ভাবনা প্রক্রিয়ার সঙ্গে ভিন্নমত, বিরুদ্ধ মত প্রকাশের অবকাশ থাকতে পারে। গণতন্ত্রের সংজ্ঞা অনুযায়ী সে থাকাটাই স্বাভাবিক।

এ বইয়ের পৃষ্ঠা বিন্যাস হয়েছে সদ্য প্রয়াত শ্রদ্ধাভাজন শিল্পী কালাম মাহমুদের পরিকল্পনায়। প্রচ্ছদের খসড়া করেছিলেন, শেষ না করেই চলে গেলেন। তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি।

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা
www.pathagar.com